অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ

গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ

শংকর মোকাশী 'পুণেকর'
অনুবাদ
নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ভূমিকা

কন্নড় ভাষায় উপন্যাস সাহিত্যের প্রচার ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই শুরু হয়েছিল এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় কিন্তু এ ভাষায় উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়েছে ঠিক কোন সময়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কোন কোন সমালোচকের মতে 1823 খৃষ্টাব্দে লিখিত কেম্পুনারায়ণের 'মুদ্রামঞ্জুষ' কন্নড় ভাষার প্রথম উপন্যাস। এই গদ্য-রচনাটির বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা উপন্যাসের মত বটে কিন্তু আগামী দিনের উপন্যাসের রূপ-রেখা কেমন হবে সে সম্বন্ধে কেম্পুনারায়ণের ধারণা ছিল না। তবে গদ্যভাষাকে ঘসে মেজে সংস্কার করে ভাবী যুগের উপন্যাসের ভিত্তি প্রস্তুত করার কাজটা ইনি করে গেছেন বলা যেতে পারে। 'রামাশ্বমেধে'র লেখক পুট্টন্না (1870-1901) চমৎকার গদ্যভাষায় 'গোদাবরী' উপন্যাস মাত্র অর্ধেক লিখেছিলেন। বেঙ্কটাচার্যের রচনা অতি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন পুট্টন্না এবং তাঁর লেখা থেকেই পেয়েছিলেন উপন্যাস রচনার প্রেরণা। বি বেঙ্কটাচার্য (1845-1914) বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য বাঙালী লেখকের উপন্যাস অনুবাদ করে কন্নড় ভাষার পাঠকদের উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস এবং রাজসিংহ, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস কন্নড় ভাষায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। তখনকার বাংলা উপন্যাসে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকত, সেই রচনাশৈলী অনুসরণ করায় কন্নড় ভাষায়ও সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যায়। এ সম্পর্কে শিবরাম কারন্তের উক্তি উল্লেখযোগ্য। ইনি বলেছেন বাংলা উপন্যাসের কন্নড় অনুবাদ পাঠ করেই রচনাশৈলীর প্রতি আমরা আগ্রহশীল হয়েছি।

মহীশূরের বেঙ্কটাচার্য বাংলা উপন্যাসের কন্নড় অনুবাদ করেন। তেমনি উত্তর কর্ণাটকের বি টি গলগনাথ (1869-1942), মারাঠি লেখকদের, বিশেষ করে হরিনারায়ণ আপ্তের উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন কন্নড় ভাষায়। এঁর অনূদিত রাণা রাজসিংহ, লক্ষ্মীবাঈ, ভগবতী কাত্যায়ণী ইত্যাদির ভাষা, বেঙ্কটাচার্যের কন্নড় ভাষা অপেক্ষা সহজ ও সরল হয়েছে। মারাঠি ভাষায় অতটা সংস্কৃত বাহুল্য নেই এটাও তার একটা কারণ হতে পারে। উত্তর কর্ণাটকের প্রচলিত রচনাশৈলীকেই কার্যোপযোগী করে তুলেছেন গলগনাথ। এই অঞ্চলের আরো কয়েকজন ঔপন্যাসিক গলগনাথের রচনাশৈলীর অনুকরণ করে লিখেছেন। এর থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে গলগনাথের ভাষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। মহারাষ্ট্র ও উত্তর কর্ণাটক ভৌগোলিক দিক থেকে খুব কাছাকাছি, তাছাড়া প্রসিদ্ধ বীরদের রোমাঞ্চকর বীরত্ব কাহিনী, লোক জাগরণের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি সরল সহজ ভাষায় বর্ণনা করায় এই অনুবাদক উত্তর কর্ণাটকে জনপ্রিয় হন।

বেঙ্কটাচার্য এবং গলগনাথের সময়টাকে অনুবাদের যুগ বলা যেতে পারে। এই দুই অনুবাদক উপন্যাস-সাহিত্যকে সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। পাঠকসমাজ সাহিত্যের এই ধারাটির অনুরাগী হয়ে উঠেছে। দেশের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জাগরণের ক্ষেত্রেও এই সব সাহিত্যকৃতির অবদান যথেষ্ট। কন্নড় ভাষায় উপন্যাসের আবির্ভাব লগ্নটি অশুবাদকেরাই আলোকিত করে তুলেছেন বলা চলে। এরপর গলগনাথই 'মাধব করুণ বিলাস' এবং 'কুমুদিনী' নামে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ওপর আধারিত দুটি মৌলিক উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসগুলিতে দেশপ্রেম, ধর্ম-ভাবনা এবং দৈবভক্তি খুব স্পষ্ট। কন্নড় দেশের বিগত গৌরব এবং ঐশ্বর্যের পরিচয়ও এতে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে অস্পৃশ্যতা নিবারণ জাতীয় বর্তমান কালের সমস্যাগুলির সামঞ্জস্য ঘটানোর কাজে গলগনাথ বিশেষ সফল হতে পারেন নি।

গলগনাথের মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগেই অবশ্য দক্ষিণ কর্ণাটকেও মৌলিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল। গুলবাড়ী বেঙ্কটরায়ের লেখা 'ইন্দিরা বাঈ' (1899) কন্নড় ভাষার প্রথম সামাজিক উপন্যাস। খুব সম্ভবত মৌলিক উপন্যাস হিসাবেও এটিই প্রথম। যাই হোক এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ঊনিশ শতকের শেষের দিকে কন্নড় ভাষায় উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ কর্ণাটকে উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রগতির কর্ণধার ছিলেন 'বাগ্দেবী'র (1905) লেখক বোলার বাবুরাও এবং 'রোহিনী'র (1907) লেখক গুলবাড়ী অন্নাজীরায়। প্রশাসনের দিক থেকে যদিও সমগ্র কন্নড়ভাষী অঞ্চলটি ছড়ানো রয়েছে মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং পুরাতন মহীশূরের মধ্যে, তবু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হবার আগেই এ ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অনূদিত এবং মৌলিক উপন্যাস লেখা শুরু হয়ে যায়।

1915 সালে প্রকাশিত 'মাঁডিদ্দুণ্ণী মহারায়' কন্নড় উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি উল্লেখনীয় সংযোজন। এর লেখক এম, এস, পুট্টণ্ণা প্রাচীন মহীশূরের পরি-শীলিত রচনাশৈলীর প্রয়োগ করেছেন। তিনিই প্রথম যতদূর সম্ভব কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। উন্নত ধরনের উপন্যাস রচনার জন্য পৌরাণিক আদর্শের প্রয়োজন আছে, এই ছিল তাঁর মত, কিন্তু তবু তিনি উপন্যাসের কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছেন জনজীবন থেকেই। এ স্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'রামায়ণ দর্শনে'র কবি কে কে বি পুট্টপ্পাও তাঁর উপন্যাসের উপকরণ খুঁজেছেন জনজীবনের মধ্যে।

পুট্টণ্ণার দুটি বৃহদাকার উপন্যাসের নাম 'কানুরু সুকম্মা হেগ্গডতী' এবং 'মলেয়লল্লি মদুমগলু'। এ দুটির প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় তিন দশকের। পুট্টণ্ণার শৈশব ও যৌবন কেটেছে মলেনাডের কোলে। সেই অভিজ্ঞতা এই দুটি উপন্যাসে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সৌন্দর্যের উপাসক পুট্টণ্ণার রচনায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটাই যে তাঁর হাতে কন্নড় উপন্যাস কাব্যময়তার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী মাস্তী বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গারের মতে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পরিণত অনুভূতি নিয়ে চরিত্রচিত্রণ করতে পারলে তবেই উপন্যাস রচনা সম্ভব। মাস্তী এখনও প্রচুর লিখে চলেছেন। কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত 'সুবন্না' তাঁর একটি সুন্দর সাহিত্য-কৃতি। এরপর মলেনাড়ের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন 'চেন্নবসব নায়ক'। কোডগের ইতিহাসকে মূল কাহিনী হিসাবে নিয়ে রচিত এঁর আর একটি উপন্যাস 'চিক্কবীর রাজেন্দ্র'। কর্ণাটকের সংস্কৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ইতিহাস মাস্তীর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কন্নড় ভাষার প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক শিবরাম কারন্ত মনে করেন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতাই সাহিত্য নির্মাণের আধার হওয়া উচিত। কারন্তের উপন্যাসের প্রধান গুণ বাস্তবধর্মিতা ও অনাড়ম্বর রচনাভঙ্গি। এমন কি সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসেও দেখা যায় লেখকের সৃজনধর্মী মন সর্বদা সচেতন, বক্তব্য বিষয় তাঁর অনুভূতির রসে সিক্ত হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কারন্তের সমাজ চিত্রণের মধ্যেও পাওয়া যায় মনন-শীলতার পরিচয়। সামঞ্জস্যের সাধনা তাঁর রচনার আর এক বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যরচনার জন্য তিনি কোন বাঁধাধরা পথনির্দেশ করেন নি। কারন্তের অনুগামীও কেউ নেই। দক্ষিণ কর্ণাটকের জনজীবন, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, জলমাটি, গাছ গাছালি পশু পাখী এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস। পুট্টপ্পার উপন্যাসের মত বর্ণনা কোথাও স্বতন্ত্রভাবে না থেকে কারন্তের উপন্যাসে সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে থাকে। 'সরসম্মন সমাধি', 'চোমন দুডি', 'মরলিমণ্ণিগে', 'বেট্টদজীব' প্রভৃতি সফল উপন্যাস কারন্তের রচনাশক্তির বৈচিত্র্যের প্রমাণ। 'অলিদমেলে'তে নতুন টেকনিক প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ধরনের নতুনত্বের পরীক্ষামূলক ব্যবহার কারন্তের একটি গুণ বলে ধরে নিলেও এটা ঔপন্যাসিক কারন্তের সাধনার বৈশিষ্ট্য বলাটা ঠিক হবে না।

যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে নতুন টেকনিক প্রয়োগে কন্নড় সাহিত্যকে নতুন রূপ দিতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা সবাই নতুন যুগের লেখক। পূর্ব যুগের সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে যে সব প্রগতিশীল লেখক কন্নড় সাহিত্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সম্বন্ধে দু'চার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এম এস পুট্টণ্ণার সময় পর্যন্ত কন্নড় ভাষায় উপন্যাসের পূর্বযুগ বলা যেতে পারে। কে বি পুট্টপ্পা, মাস্তী, কারন্ত প্রভৃতির আগমনের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে 1930 সালের পর থেকে কন্নড় উপন্যাস সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। এর পরবর্তী প্রগতিশীল লেখকবর্গের হাতে উপন্যাসের ক্রমবিকাশের সঠিক মূল্যায়ন এখনও করা কঠিন।

'সন্ধ্যারাগ', 'নটসার্বভৌম' ইত্যাদির লেখক এ এন কৃষ্ণরাও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে দিলেন যা আগে কখনও দেখা যায়নি। যাঁরা সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস পড়েন, এবং যাঁরা পড়েন শুধু মনোরঞ্জনের জন্য, এই দুই শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যাই বেড়ে গেল প্রচুর। কৃষ্ণরাও এবং আরো কোন কোন লেখক

শিল্পীদের জগৎ, বেশ্যাজীবন, পুঁজীবাদের বিষাক্ত পরিণাম ইত্যাদি নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। এতদিন সাহিত্যের আসরে কোন অপবিত্র, গ্লানিজনক ভাবনার প্রবেশ নিষেধ ছিল, এ বেড়া ভেঙে সাহিত্যের আসরে সবারই অবারিতদ্বার অধিকার এনে দিতে গেলে যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী তার তীব্রতাও অন্তত কিছুটা কম হল এই প্রগতিশীল লেখকদের লেখনীর গুণে। এঁদের লেখা জনপ্রিয় হল খুবই, কারণ সহজ ভাষায়, হাল্কা চালে লেখেন এঁরা। এঁদের রচনায় উত্তেজনা আর কৌতূহলের খোরাক থাকে তাই জন-সাধারণের কাছে খুব রুচিকর। কিন্তু এইসব কারণেই কৃষ্ণরাও, সুব্বারাও, বসবরাও, কট্টীমণী নিরঞ্জন, কৃষ্ণমূর্তি পুরাণিক প্রভৃতির উপন্যাস, রম্যরচনার স্তরের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি।

1960 সালের কাছাকাছি প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে রামবাহাদুরের 'গ্রামায়ণ' একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি। এক গ্রামে নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্যায় অবিচারের পাল্লা ক্রমাগতই ভারী হতে থাকে, অবশেষে যেন তারই পরিণাম স্বরূপ প্রকৃতির কোপে সারা গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। এই বিষাদঘন কাহিনী শক্তিশালী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসটিতে। ইঙ্গিতময় বর্ণনা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ ও কাহিনীর সঙ্গে চিরন্তন মানবিক আবেদনের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে চমৎকার ভাবে।

এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে নব্য লেখক সম্প্রদায়কে নতুন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষায় উৎসাহিত করেছিলেন কন্নড়ের বিখ্যাত কবি গোপালকৃষ্ণ অডিগ। কিন্তু দীর্ঘদিন কোন বিশেষ প্রভাবের ছায়ায় থাকা নব্য সমাজের স্বভাববিরুদ্ধ। ইউ আর অনন্তমূর্তি, পী লঙ্কেশ, তেজস্বী, গিরি প্রভৃতি বেশ অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেন। এঁরা সবাই ছোট গল্পের ক্ষেত্র থেকেই উপন্যাসের এলাকায় প্রবেশ করেছেন মাস্তীর মত। নব্য লেখকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক অনন্তমূর্তির 'সংস্কার' উপন্যাসটি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার এক মননশীল বিশ্লেষণ। এঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভারতীপুর' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ কে রামানুজনের 'হলদিমীনু' শারীর অপ্রকাশিত ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তর্মুখী ভাবনা এবং টেকনিকের বিশেষত্বে এটি কন্নড় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পী লঙ্কেশের 'বিরুকু', তেজস্বীর 'স্বরূপ', গিরির 'গতিস্থিতি', যশবন্ত চিত্তালের 'মুরুদারিগলু' এবং শান্তিনাথের 'মুক্তি' উপন্যাসে এই নব্য লেখকগোষ্ঠীর প্রতিভার স্বাক্ষর খুব স্পষ্ট। এই নতুন সাহিত্যে সামাজিক জীবন ও পরিবেশ এবং মানব মনের গভীর অনুভূতির উপলব্ধি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কাব্যময় ভাষায় বিধৃত হয়েছে। নারীপুরুষ, ব্যক্তি, সমাজ আর সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখনই মানুষ নিজের মন আর বহির্জগতের মাঝখানে ব্যবধানের বিরাট গহ্বরটাকে চিনতে পারে, সেই নৈরাশ্য আর বেদনার উপলব্ধি আছে এই উপন্যাস-গুলিতে। প্রাক্ নব্যযুগের উপন্যাসে জীবনের অন্তর্লীন গূঢ় অর্থ এবং চিরন্তন সত্যের কথা বলা হয়েছিল আর এ যুগের উপন্যাসে বলা হচ্ছে নৈরাশ্য, বেদনা এবং জীবনের নিরর্থকতার কথা। নব্য সাহিত্যে জীবনের প্রতি হতাশা এবং অনাস্থার ভাবটি এসেছে

সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের অস্তিত্ববাদ এবং অসমঞ্জস ঐতিহ্যবোধ থেকে আর বিশেষ ভাবে কাফ্‌কা ও কাম্যুর প্রভাবে। এই নব্যসাহিত্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিগ্ধ তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও ভাবধারা আজকাল আমাদের জীবনে বড় বেশী প্রভাব ফেলেছে। মোটের ওপর এই কথাই বলা চলে যে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত কন্নড় উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে মনে হয় কন্নড় সাহিত্যের প্রতিভাশালী লেখকরা অধিকাংশই আধুনিক যুগের মানুষ।

কন্নড় উপন্যাস সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি আলাদা আলাদা শীর্ষক দেওয়া সম্ভব নয়। এতক্ষণ যে সব লেখকদের কথা বলা হল এঁরা ছাড়াও আরো কিছু লেখক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন। এঁদের নাম দেবড়ু, গোকাক, শ্রীরঙ্গ, ভৈরপ্পা, কে বি আয়ার, ইনামদার, মির্জি অন্নারাও, আর শ্রী মুগলি, বীরকেশরী, সীতারাম শাস্ত্রী, কোরটী শ্রীনিবাসরাও, চতুরঙ্গ, ব্যাসরায় বল্লাল, এস অনন্তনারায়ণ, রামমূর্তি, ত্রিবেণী, এম কে ইন্দিরা প্রভৃতি। কন্নড় ভাষার উপন্যাস সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এই সাহিত্যের যথোচিত মূল্যায়ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কন্নড় এবং ইংরাজী ভাষার লেখক হিসাবে শ্রীশঙ্কর মোকাশীর শুধু আঞ্চলিক স্তরে নয়, রাষ্ট্রীয় স্তরেও যথেষ্ট সুনাম আছে। 'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ' ছাড়াও 'মায়ের তিন মুখ' নামে একটি কাব্যসঙ্কলন এবং 'ব্রেন্দের কাব্যমীমাংসা' নামে একটি সমালোচনা গ্রন্থ ইনি লিখেছেন। এছাড়া সমালোচনাত্মক রচনাও এঁর অনেক আছে। তিনি নব্য লেখকদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। এঁর মতে সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য রসগ্রহণ, মূল্যায়ন নয়। সুতরাং নবীন কন্নড় সাহিত্যের আলোচনায় শল্যচিকিৎসার প্রবৃত্তি পরিহার করে রসপিপাসুর উৎসাহ নিয়ে বিচার করতে হবে।

কন্নড় ভাষায় মোকাশীর লেখা উপন্যাস একটিই মাত্র—এই 'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ'। কিন্তু এটিই ঐ সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এতে ঐতিহ্যগত নীতিবোধ, গৃহবন্ধনের মধ্যে নিহিত মানবিক মূল্যবোধ, নিজ পরিবেশের বাইরের এবং ভেতরের ঘটনাবলী হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর শেষে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি চরিত্রই নিজের নিজের দোষগুণ বুঝতে পেরেছে এবং নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করেছে। মানব-স্বভাবের দুর্বলতা বোঝেন মোকাশী। ঐতিহ্যগত তত্ত্ব, যুক্তি, বিচার এবং শিল্পবোধ সমন্বিত দৃষ্টি নিয়ে জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল টানাপোড়েনকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করেছেন বলেই এ উপন্যাস কন্নড় সাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

মোকাশীর মতে বিনাশকারী প্রবৃত্তিসমূহ সমাজ দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে, উপন্যাসের পরিবেশ সৃষ্টির সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। 'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ'তেও ঐ তত্ত্বই মুখ্যত প্রমাণ করা হয়েছে। তাই উপন্যাসে ট্র্যাজিডির ছায়া পড়লেও মোটের ওপর এটিকে মিলনান্তক উপন্যাসই বলতে হবে। ঐ তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েই যে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ সেখানে জীবন-অভিজ্ঞতার মন্থনে উত্থিত বিষ পরিপাক করে নেবার

জন্য অতিরিক্ত কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিগত দুই স্তরেই সে শক্তি সঞ্চিত থাকে ঐতিহ্যরূপে। এ উপন্যাসের সাফল্যের আর একটি কারণ, কোন বিশেষ মতবাদ এই রচনাকে পক্ষপাতদুষ্ট করেনি।

এইভাবে দেখলে 'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ' একটি পারিবারিক উপন্যাস। প্রধানতঃ ধারবাড় শহরের গঙ্গব্বা, রাঘপ্পা এবং দেসাঈ এই তিনটি মানুষের পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলী নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে লেখক নিজের সীমানার ভেতরে এবং বাইরে দুদিকেই দেখেছেন সচেতন দৃষ্টিতে। ফলে উপন্যাসের ঘটনাক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। বসন্তর গ্রামে যাওয়া এবং অচ্যুতের বোম্বাই বাসের বর্ণনায় লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি ধারবাড় শহর থেকে পাঠককে নিয়ে গেছেন দূরের বৃহৎ নগরে এবং গ্রামীন জীবনের পটভূমিকায়। তবে এটাও ঠিক যে ধারবাড় বা গ্রাম অথবা বোম্বাই শহর কোন স্থানকেই এ উপন্যাসে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলার জন্য যেটুকু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনিবার্য, তা এতে আছে। তবে ধারবাড় এবং বোম্বাইয়ের সম্পর্ক একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়। কিন্তু তিনটি গৃহের দুঃখ-কষ্ট ও সম্পর্কের জালে গাঁথা কাহিনীতে ধারবাড়ের নাগরিক জীবনধারা বিশেষ কোন ছায়া ফেলে না। দেসাঈ বুঝতে পারেন বসন্তর কারসাজিতে গ্রামের সহজ সরল জীবনে অশান্তির ছোঁয়াচ লাগছে। বোম্বাইতে অচ্যুত সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছে, ধারবাড়ে শান্তা স্বদেশী মিছিলে অংশ নিয়েছে এই সব ঘটনা ও তার পরিণাম যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, যুগের হাওয়ায় গতানুগতিক জীবনধারার স্বাভাবিক পরিবর্তন এ উপন্যাসে স্বীকৃত হয়েছে। যে স্বাধীনতা রত্নার জীবনে ছিল অকল্পনীয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের আবহাওয়ায় সে স্বাধীনতা শান্তার কাছে সহজলভ্য। এক যুগের মানুষের সঙ্গে পরবর্তী যুগের মানুষের মানসিকতার যে প্রভেদ দেখা দেয় সেই পরিবর্তনজাত সমস্যাও আলোচিত হয়েছে। ("...প্রত্যেক যুগেরই আছে কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা। পুরান যুগের স্ত্রীলোক এই নতুন যুগের কথা বুঝতেই পারে না— ভবিষ্যতে যা হতে চাও সেইদিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে...") নিরন্তর পরিবর্তনশীল জীবনধারার বর্ণনায় ঐতিহ্যগত সমস্যা মোকাশীকে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হতে দেয়নি। শান্তার মায়ের বিবাহ এবং শান্তার বিবাহ দুই ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি যে অনেকটা একই রকম দাঁড়িয়েছে এ বিষয়ের উল্লেখে ঐ কথাই আরো স্পষ্ট হয়েছে। যুগের হাওয়া এবং ঐতিহ্য নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনার পর এইভাবে ঘটনার পুনরাবর্তনের মধ্যে ভাগ্যের একটা সূক্ষ্ম রসিকতারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জীবন সম্বন্ধে কতখানি বিতৃষ্ণ হওয়া সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ উপন্যাসে। জীবনে বিতৃষ্ণা এসে যাওয়ায় গঙ্গব্বা মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় নেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু তার কর্তব্য তখনও শেষ হয়নি। কিট্টীর বিবাহ ও সংসার পাতার সময় পর্যন্ত মায়ের আশ্রয় তার প্রয়োজন। কথাটা মনে পড়তেই সে ছেলের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মা গঙ্গার আহ্বান অগ্রাহ্য করে সে সংসারের দিকে

মুখ ফেরায়। ট্রেনের জানলা দিয়ে গঙ্গাজল পথে ফেলে দেবার মত পাপও করে ফেলে বিনা দ্বিধায়। এই কাজটি গঙ্গব্বার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কর্তব্য করতে গঙ্গব্বা কখনও পশ্চাৎপদ নয় কিন্তু তার চরিত্র একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়। ভাই তার প্রতি অন্যায় করেছিল এ কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অতীত স্মৃতি সমস্তক্ষণ তার মনকে শোকাচ্ছন্ন এবং কঠোর করে রেখেছে। তার মুখের ব্যঙ্গবাণ বড় তীক্ষ্ণ। রাঘপ্পা ও চম্পার শোচনীয় মৃত্যুর পরই গঙ্গব্বার চরিত্রে মানবিকতার স্বাভাবিক বিকাশ দেখা যায়। তার আগে পর্যন্ত গঙ্গব্বার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, প্রেম, চিন্তাভাবনার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিট্টী।

জীবনসংগ্রামে লড়াই করে জয়ী হবার মত ব্যক্তিত্ব কিট্টীর নেই। তার স্বভাবে পরনির্ভরতাই প্রাধান্য পেয়েছে। কৈশোর অতিক্রম করতে পারে না সে কোনদিনই, ব্যক্তিত্বের অভাবে সে একান্ত দুর্বল। অথচ সেই এই উপন্যাসের ধীরোদাত্ত নায়ক। মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে মোকাশীর তাই কোন চরিত্রকেই তিনি নিখুঁত করে গড়েন নি। মানুষের দুর্বলতার কাহিনীই উপন্যাসে স্বাভাবিকতা আনে। গঙ্গব্বা ও রাঘপ্পার সংঘর্ষের মধ্যে তাই মানবচরিত্রের অহঙ্কার, ধাপ্পাবাজি, অজ্ঞতা আর দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে। নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতিবশে তাল ঠুকে লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন গঙ্গব্বার মত আর একটি মানুষ—তিনি হলেন দেসাঈজী। অন্যের বিবাদের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, একথা বহুবার ভেবেও শেষ পর্যন্ত গঙ্গব্বার কষ্ট দেখে তিনি রাঘপ্পাকে শিক্ষা দিতে যুদ্ধে নেমেছেন। এরই পরিণামে দেখা যাচ্ছে রাঘপ্পার জালে জড়িয়ে পড়ে, কিট্টী বিবাহ করছে রত্নাকে এবং বসন্ত ক্ষেপে উঠছে শান্তার জন্য। অবশেষে বহু অশান্তির পর সবাই একত্র মিলিত হচ্ছে। এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নেমেছেন যে তিনজন তাঁদের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং ব্যক্তিত্ব দৃঢ়তাপূর্ণ, তবে রাঘপ্পার চরিত্র গঙ্গব্বা এবং দেসাঈয়ের চেয়ে অনেক বেশী জটিল। তার অভিজ্ঞতাও বেশী। নিজের লাভের জন্য সে সব কিছুই করতে পারে। প্রয়োজন পড়লে সে নিজেই বাড়ির গহনা চুরি করে তারপর চোর ধরার অভিনয় করতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু একেবারে পাষণ্ড খল-নায়কও সে নয়। তার মেয়ের বিবাহের দিনে তারই মর্যাদা রক্ষার জন্য মহবুবজান নিজের স্বাস্থ্য বিপন্ন করে অর্থ সংগ্রহ করেছে, এই ত্যাগ দেখে সমস্ত হৃদয় ব্যথায় মুচড়ে উঠেছে রাঘপ্পার। যে মানুষ জীবনে কখনও হার স্বীকার করবে না বলে পণ করেছিল, ঐ মুহূর্তটি থেকে সেই নিজের পরাজয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছে। সেই সময় থেকেই তার মধ্যে মনুষ্যত্ব ও নীতিবোধের জাগরণের সূত্রপাত। ক্রমশ সত্য আর অসত্য নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করেছে সে। অবশেষে জীবনে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। রাঘপ্পার চরিত্র গঙ্গব্বা এবং দেসাঈজীর চরিত্র থেকে এইখানেই আলাদা। সৎ এবং অসৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিবেক বোধ তাঁদের দুজনকে জীবনের পথে, বাঁচার সাধনায় এগিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনাবলীর বিকাশে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার না করলেও জর্জ এই উপন্যাসের আর একটি মুখ্য চরিত্র। স্বাভাবিক নৈতিক চেতনা তার মধ্যে দৃঢ়মূল। যে কোন পরিস্থিতিতে সে নির্লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু সময় অনুকূল হলে সেও ঘুষ নিয়ে থাকে। জর্জের স্বভাবে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই। কিট্টী সর্বদাই অসহায় পরাবলম্বী, তাই জর্জের নির্লিপ্ত স্বভাব তাকে বিশেষ অবলম্বন দিতে পারে না। শুধু তাই নয়, জর্জের এই অনাসক্তি উপন্যাসের চলমান ঘটনা-স্রোতকে বিচার করে দেখার পক্ষে খুবই অনুকূল। সমস্ত পরিস্থিতি বুঝেও কোনরকম আকর্ষণ অনুভব না করে তীরে দাঁড়িয়ে শুধু বহমান নদীর মত ঘটনার স্রোতকে দেখে যাবার স্বাভাবিক শক্তি তার মধ্যে আছে। রূঢ় বাস্তবের অবতারণা করে উপন্যাসের পরিপাটি রূপকে এলোমেলো করে দেবার মত সাহস মোকাশীর লেখনীতে বিশেষ দেখা যায় না।

'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ' উপন্যাসের প্রথম দুই অধ্যায় পড়লে মনে হয় প্রতীক ও সাঙ্কেতিকতার প্রয়োগ এতে যথেষ্ট রয়েছে। জীবনের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুর আহ্বানের প্রতীক হয়েছেন যেন মা গঙ্গা, সেই অনুভূতি গঙ্গব্বার অন্তরের গভীরে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এর পর অনেকদূর পর্যন্ত এ প্রতীক বা রূপক অদৃশ্য। নানা ঘটনা এবং নানাবিধ চরিত্রের প্রতি তখন পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু শাশুড়ী বধূর কলহের মধ্যে থেকে যে বিষ উদগত হয়েছে, মনে হয় যেন তা ঝরে পড়েছে গুপ্তগামিনী সর্বতাপহরা ঐ নদীর বুকেই। অবশেষে গঙ্গব্বার অনুভূতির সঞ্চয়ও একদিন রিক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন মা গঙ্গা স্বয়ং এসেছেন গঙ্গব্বার ঘরে। এতক্ষণে জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে গঙ্গব্বা এবং মা গঙ্গার মধ্যে সব বিরোধ যেন লুপ্ত হয়ে যায়। মা গঙ্গার রূপকের মধ্যে যে দৈবশক্তির প্রকাশ তা আরো প্রাধান্য পেয়েছে শালগ্রাম শিলায়। শালগ্রাম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ফলে গঙ্গব্বা কিছুদিনের জন্য শান্তি পায়, সংসারেও শান্তি ফিরে আসে। গঙ্গানদীর মতই গর্জনশীল বেগবতী ব্যক্তিত্ব গঙ্গব্বার, কিন্তু তার মধ্যেও যে একটা অনাসক্ত নির্লিপ্ত দিক আছে তা বোঝা যায় এই সময়। এই মৌন গাম্ভীর্য গঙ্গব্বার আর এক রূপ। ঘটনাস্রোতে ভেসে না গিয়ে তটভূমির সুদৃঢ় আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে, অনাসক্ত দৃষ্টিতে সব কিছু দেখার জন্যই একদিকে যেমন নির্লিপ্ত দৈবশক্তির প্রতীক শালগ্রাম, অন্যদিকে তেমনি জর্জের চরিত্রের অবতারণা। কিন্তু গঙ্গানদী এবং শালগ্রাম শিলার সাঙ্কেতিক প্রয়োগ উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত একভাবে হয়নি। গুপ্তাস্ত্র, শল্য, কেল্লা, নেতৃত্ব ইত্যাদি কথার সাঙ্কেতিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে কাহিনী চিত্তাকর্ষক হলেও শেষ পর্যন্ত সে আকর্ষণ সম্পূর্ণ বজায় থাকে নি।

এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের বর্ণনায় কিছু পুরাতন টেক্‌নিক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, অধ্যায়গুলির একটি করে শীর্ষক দেওয়া হয়েছে, সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে আবার মাঝে মাঝে ডিকেন্সের রীতিতে নাটকীয় হাস্য-রসেরও অবতারণা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী উপন্যাসের ঢঙে কাহিনীর

ক্রমবিকাশের জন্য চরিত্রগুলিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাও দেখা যায়। কিন্তু শেষের দিকে কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন সূত্রগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টায় চরিত্রের প্রয়োগ ঠিক সুসমঞ্জস নয়। মোকাশীর মতে সাধারণ টেকনিকের সাহায্যেই উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত। চিরাচরিত নিয়মকানুনের বাঁধাধরা ফ্রেমের মধ্যে থেকেও যে মানবমনকে সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায় এবং কখনও কখনও সাহিত্যের ঐতিহ্যগত সীমানা লংঘন করেও সাহিত্য রচনা সম্ভব, এ কথার সফল উদাহরণ "গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ"।

বি দামোদর রাও

গঙ্গবাকে সবাই চেনে। চল্লিশ পার হতেই সে স্বামী হারিয়েছে, কিন্তু তবু প্রাণটা যে কোন রকমে টিঁকিয়ে রেখেছে সে কেবল একমাত্র ছেলে কিট্টীর (কৃষ্ণ) মুখ চেয়ে। দারিদ্র্য তো আগে থেকেই ছিল, তার ওপর সংসারের রোজগারের মানুষটি চলে যাওয়ায় এখন ভগবানই ভরসা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। কিট্টীর বয়স এখন আঠারো। এই আট বছর ধরে কত কষ্টে যে দিন কেটেছে, কিন্তু সব কিছু সে মুখ বুজে সহ্য করেছে শুধু ঐ কিট্টীর মুখ চেয়ে। নিজে আধপেটা খেয়ে ওকে পেটভরে খাইয়েছে। পরের বাড়ি রান্না করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। যাক, এতদিনে কিট্টী ম্যাট্রিক পাশ করেছে আর তহসিলদারের আপিসে তার একটা চাকরীও জুটে গেছে। নিজের চেষ্টা সার্থক হতে দেখে গঙ্গবার আজ পরম তৃপ্তি। কিন্তু আশার কি শেষ আছে? এখন তার আশা কিট্টীর জন্য একটি ফুটফুটে সুন্দরী বউ ঘরে এনে তবেই সে চোখ বুজবে। ওরা নিজেদের ঘরসংসার বুঝে সুঝে চালাতে শিখবে তবে তো তার ছুটি।

এমনি সময়ে একদিন শোনা গেল প্রতিবেশী দেসাঈ সাহেবের স্ত্রী কাশী যাচ্ছেন। গঙ্গবা এমন সুযোগ হাতছাড়া করল না। কিট্টীকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই বিশ্বনাথের চরণে নিজের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করার আশা বুকে নিয়ে গঙ্গবা একলাই তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

কাশী পৌঁছে সে গঙ্গাস্নান করল। বিশ্বেশ্বর ঘুণ্ডারাজ, কালভৈরব, বিন্দুমাধব সব দেবতার মন্দিরে মন্দিরে দর্শন করে বেড়াল, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে গিয়ে করল দীপার্পণ। পঞ্চারতি, গোপুরারতি, কপুরারতি ইত্যাদি সব আরতি করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করল। সব জায়গাতে পরম ভক্তিভরে দুটি চোখ বুজে দণ্ডবৎ হয়ে প্রার্থনা জানাল গঙ্গবা 'আমার কৃষ্ণর বিয়ে হোক, তার ঘরসংসার ভরে উঠুক, আর আমার কিছুই চাইনা ঠাকুর'। কিট্টী ঐশ্বর্যবান হোক, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠুক জীবনে সুখী হোক এই ছিল তার একমাত্র কামনা। বাৎসল্যরসে মনটি ছিল তার কানায় কানায় ভরা। বিশ্বেশ্বরের সমুখে যখন গোপুর আরতি হচ্ছিল সেই আরতিকে সাক্ষী রেখে সমস্ত হৃদয় নিংড়ানো আকুল প্রার্থনা জানাল গঙ্গবা।

কাশী থেকে গ্রামে ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। সবাই গোছগাছ শুরু করেছে। গঙ্গবাও গুছিয়ে বেঁধে নিল নিজের ছোটখাট পুঁটলিটি। কদিন আগে অন্যদের দেখাদেখি সেও একটি ঢাকনা দেওয়া তামার ঘড়া কিনে এনেছে। সবাইকার মত সেও সেই ঘড়াতে গঙ্গাজল ভরে মুখটি মোম দিয়ে বন্ধ করে নিয়েছে। ঘড়ার মুখে ধরবার সুবিধার জন্য একটি দড়িও বাঁধা হয়ে গেছে। ঘড়াটা বড় বেশী ভারী,

তোলাই মুস্কিল। কিন্তু তাই বলে কাশী থেকে গঙ্গাজল না নিয়ে তো আর ফেরা যায় না ? মরণকালে কিট্টী তার মাথার কাছে বসে মুখে যদি গঙ্গাজল না দেয় তাহলে তার সদগতি হবে কি করে ?

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাখানেক আগেই সবাই এসে একটি কামরা দখল করে বসে পড়ল। কিছু লোক ঢুলতে শুরু করল আবার কেউ কেউ একেবারে মাঝখানে অন্যদের আড়ালে বসেছিল বলে গাড়ি যে কখন চলতে শুরু করল সেটা খুব অল্প লোকই টের পেল।

গঙ্গবা নিজের পুঁটলিটি সামলে একটা জানলায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। গত চার পাঁচদিনের পরিশ্রমের ফলে ক্লান্তিতে আর গাড়ির দোলানীতে তারও চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে।

প্রায় ঘণ্টা দুই তিন ও ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ গাড়ির সিটির শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। কামরার সবকটা জানলা বন্ধ শুধু গঙ্গবার পাশের জানলাটি খোলা। ঠাণ্ডায় হাতের শিরাগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে, সারা শরীরে কাঁপুনি ধরেছে। গঙ্গবা বাইরে চেয়ে দেখল গাড়ি ডান দিকে মোড় নিচ্ছে, মাথার ওপর ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া ছেয়ে রয়েছে, তারও ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিধার জ্যোৎস্নায় ভরা, দু' একটি তারার ঝিকিমিকি, দূরে দূরে টিলা আর মন্দিরের গোপুরের আকৃতিবিশিষ্ট গাছের ছায়াময় অবয়ব। এই সবের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গঙ্গবা জানলা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তখনি আর ঘুম এল না, কত কথা মনে পড়তে লাগল। দেখে আসা মন্দির, মূর্তিগুলি, গঙ্গা—সব একে একে যেন ভেসে উঠতে লাগল চোখের উপর। সে একেবারে তন্ময় হয়ে গেল, সমস্ত কাশীযাত্রার ব্যাপারটা যেন মনে হতে লাগল স্বপ্নের মত। বিশ্বনাথ দর্শনের সেই অনুভূতি মনে পড়তে সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, নিজেকে ধন্য মনে হতে লাগল গঙ্গবার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের মনে সব ধর্মচিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে বাৎসল্য আর প্রেম। তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিট্টীকে, 'ধারবাড়ে সে হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে রয়েছে, আহা, ঘুমের ঘোরে হয়ত 'মা' 'মা' করে ডাকছে। বেচারীকে এতদিন নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়েছে, কত কষ্টই না হয়েছে বাছার। এইবার ওর নাকে একটি দড়ি পরাতে পারলেই আমার কাজ শেষ, তাহলেই আমি শান্তিতে মরতে পারি'।

ভাবনার স্রোত মনের মধ্যে এগিয়ে চলল। মৃত্যুর ভয়াল রূপ স্মরণ করে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল, মৃত্যুই তো মানবমনের সব কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার পথ রোধ করে দেওয়াল তুলে দেয়। গঙ্গবা ভাবল : বউয়ের মুখ দেখার পরই মরে যাওয়াটা কি আমার পক্ষে ঠিক হবে ? কিট্টীর বিয়েটা দিলেই কি কর্তব্য শেষ ? তার জীবনের সার্থকতা তো আসবে আরও পরে। কিছুদিন কাটলে পর তবেই না কিট্টীর ঘরসংসার দেখবার মত হবে, সেইটি দেখার জন্যই আমাকে আরও কিছুকাল বাঁচতে হবে। দশজনে কিট্টীর সুখ্যাতি করবে সেটা আমায় নিজের কানে শুনতে হবে তো ! তাছাড়া ওর খোকাখুকুদের

তাদের ঠাকুমার হাতে খেতে পাওয়া দরকার, তাদের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, এ সব না করে কি আমি মরতে পারি ? যেমন করে হোক আমাকে বাঁচতেই হবে। বেঁচে থাকার বাসনা ওর মনে যেন নতুন উৎসাহের জোয়ার এনে দিল।

কামরার মৃদু আলোয় গঙ্গাজলের ঘড়া চকমক করছিল সেদিকে তাকিয়ে ওর মনে যেন হঠাৎ বেদনার তীর বিঁধে গেল। ঘড়ার ভেতর গঙ্গাজলের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ যেন ওর কাছে যমরাজের কাছে পৌঁছে যাবার আওয়াজ বলে মনে হতে লাগল। কিসের জন্য এ গঙ্গাজল ? মরণকালে মুখে দেবার জন্যই না ? না, না, সে এখন মরতে পারবে না, সে বাঁচবে। তাকে বাঁচতেই হবে। কাশীর বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে সে।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে গঙ্গাজলের ঘড়া চকমক করছে আর তার মধ্যে গঙ্গাজলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন খবর দিয়ে যাচ্ছে পরলোকের। গঙ্গব্বা কেমন অস্থির হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধক্ ধক্ শব্দ অনুভব করতে লাগল, জোরে জোরে। একদিকে বাঁচবার বাসনা অন্যদিকে মৃত্যুর আহ্বান এই দোটানার মধ্যে পড়ে যেন দিশাহারা বোধ করতে লাগল। মনের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে, অবশেষে জয় হল জীবনতৃষ্ণার। সে জানলা খুলে ধীরে ধীরে তুলে নিল গঙ্গাজলের ঘড়া। নখ দিয়ে খুঁটে তুলে ফেলল মোমের আস্তরণ, ঢাকনা খুলে 'জয় গঙ্গামাঈ' বলে গঙ্গাজল নিয়ে ছোঁয়াল নিজের দুই চোখে, তারপর জানলার ওপাশে উপুড় করে দিল ঘড়া। মা গঙ্গা ঝরঝরিয়ে বয়ে চলে গেলেন। শেষ বিন্দুটি পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঘড়া উপুড় করে ধরে বসে রইল সে। কামরার মধ্যে সবাই নিদ্রামগ্ন। ঢাকনা আবার বন্ধ করে ঘড়ার মুখে মোম লাগিয়ে ঘড়াটি নিচে রাখার শব্দে ঘুমের ঘোরেই কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "কে" ?

নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলে গঙ্গব্বা জবাব দিল, "কিছু নয়"।

2. পুরানো আত্মীয়

কাশী থেকে ফিরে গঙ্গব্বা অনেক প্রশংসা শুনল। সেও পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে নিজের তীর্থযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিল খুব সরস করে। কিন্তু মা গঙ্গাকে ট্রেনের জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়ার কাহিনীটা অনেকের কানেই ভাল ঠেকল না। প্রতিবেশিনী কাশীর মা তো বলেই ফেলল, "এ কাজটা তুই ভাল করিস নি গঙ্গব্বা। মা গঙ্গা ঘরে আসছিলেন, তাঁকে কিনা তুই বাইরে বার করে দিলি ? তোকে আবার ফিরে যেতে হবে তাঁর দর্শন করতে।" যাকগে যা হবার তা হয়ে গেছে, হয়ত আবার কোনদিন কাশী যাওয়ার সুযোগ ঘটে যাবে, এই ভেবে গঙ্গব্বা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল।

নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু গঙ্গব্বা কাউকেই ভাল করে বলেনি, সে ব্যাপারটা শুধু একটু উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছিল।

এক জায়গায় খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে মা গঙ্গা নিচে নামছেন। যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে কয়েক হাজার ফুট উঁচু পথ দিয়ে। মালবাহী কুলীরা বার বার যাত্রীদের সাবধান করে দিচ্ছে, নিচের গভীর খাদের দিকে কেউ যেন না তাকায়, তাহলেই মাথা ঘুরে উঠবে। তার ফলে কেউ কেউ নিচে পড়েও যেতে পারে। কিন্তু গঙ্গব্বা সেদিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে নি। গভীর অন্ধকার খাদের মধ্যে বহু নিচে মা গঙ্গার শুভ্র ধারা ঝিকমিক করে বয়ে চলেছে, মনে হ'ল যেন সেই জলধারা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল গঙ্গব্বা, দ্বিতীয়বার আর সেদিকে ফিরে তাকায়নি, এগিয়ে গিয়েছিল সামনের পথে। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। ঘটনাটা হয়ত এমন কিছুই নয়, কিন্তু সেই দৃশ্য, সেই গভীর অনুভূতি, ভয়, আশা সব কিছু মিলিয়ে গঙ্গব্বার মনে একটা বিচিত্র স্বপ্নের মত ছাপ রেখে গিয়েছিল। সেই স্বপ্ন যেন ওর জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে গেল। সে অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা দেওয়া ওর সাধ্যের অতীত। কিন্তু তাকে একেবারে লুকিয়ে রাখাও ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জীবনের চাকা ঘুরে চলেছিল মন্থরগতিতে। কিট্টীর জীবনে মাকে ছেড়ে থাকার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিট্টী অবশ্য কিছু দুধের বালক নয়, কিন্তু তবু একলা থাকতে ওর কিছুটা খারাপই লাগছিল। একে তো মা কাছে নেই, নিজে রান্না করে খেতে ইচ্ছাই করে না, তার ওপর আপিসের নানা রকম তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনে একটু সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই সে অভাবটাও বড় বেশী করেই বোধ হচ্ছিল। কিট্টীর অসুবিধে কম নয়। একে তো নতুন চাকরী, তার ওপর কেউ ওকে উপদেশ দিয়েছিল, আয়কর বিভাগে কখনও কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। সেই জন্য কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে নিজে যেটুকু বুঝত সেই ভাবেই কাজ করে যেত সে। ফলে হজম করতে হত ওপরওয়ালার তিরস্কার এবং সহকর্মীদের হাসি টিট্‌কিরি। যে তহসিলদার ওর চাকরীটা করে দিয়েছিলেন তিনি প্রথম প্রথম যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে ওর ভুলচুক শুধরে দেবার চেষ্টা করতেন কিন্তু দু মাস কেটে যাবার পরও কিট্টী ঠিকমত কাজ শিখতে পারল না, এদিকে নিজের অসুবিধার কথাও সে মুখ ফুটে বলবে না কারোকেই। কিট্টীর উল্টোপাল্টা কাগজপত্র তহসিলদারের কাছে পৌঁছতে লাগল, এতদিনেও সে কিছুই শেখেনি দেখে তিনি খুব বিরক্ত হয়ে একদিন শুনিয়ে দিলেন, "তোমাকে চাকরী দেওয়াই আমার ভুল হয়েছিল"। এরপর কিট্টী ওঁর কাছ থেকে আরোই দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করত। অবশেষে জোশী রামরায় নামে একটি কেরানীর সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব হওয়ায় তার পরামর্শমত কিছু কিছু কাজ শিখতে লাগল, কিন্তু তবুও কাজে যথেষ্ট ভুল থেকেই যেত। রামরায়ের পরামর্শ অনুযায়ী একবার কিট্টী একটা খসড়া তৈরী করে তহসিলদারের কাছে পাঠিয়ে খুব বকুনি খেল। রামরায়কে

ডেকে খসড়াটা আবার তৈরী করতে বলা হল। এই রকম সব বিচিত্র পরিস্থিতিতে মা'ই ছিল কিট্টীর একমাত্র পরামর্শদাতৃ। হাসির কথাই হোক বা রাগের কথাই হোক মায়ের কাছে মন খুলে সব কিছু বলতে না পারলে কিট্টীর মন শান্ত হতো না।

আপিসে কিট্টীর যে অধিকার খাটে না বাড়িতে সে অধিকার সে খাটিয়ে নিত অনায়াসেই। নিরক্ষর মা অজ্ঞতাবশত কিছু ভুল বললে বা সেকেলে ধাঁচের কোন উপদেশ দিতে গেলে কিট্টী তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এক ধরনের তৃপ্তি লাভ করত। মায়ের সঙ্গে ছোটখাট ঝগড়া তো তার দৈনিক বরাদ্দ ছিল, কাজেই মা কাশী যাওয়ার ফলে কিট্টীর যেন বেশ কিছুটা শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। দেড়মাস একলা থাকতে হয়েছিল কিট্টীকে।

গঙ্গব্বা ফেরার পরে কিছুদিন কিট্টীর বেশ আনন্দেই কাটল। মায়ের অনুপস্থিতিতে আপিসে কি কি ঘটেছে সব গল্পই শোনান হয়ে গেল। মাও জলভরা চোখে কিট্টী ছাড়া কাশীর দিনগুলি কি ভাবে কেটেছে শোনাল ছেলেকে। শুনতে শুনতে কিট্টীর অবশ্য একটু লজ্জা করতে লাগল কিন্তু তবু সে খুশী হয়েই সব কথা শুনল। মা যখন গভীর দুঃখ আর অনুতাপের সঙ্গে পথে গঙ্গাজল ফেলে দেওয়ার কাহিনী শোনাল তখন কিট্টী উৎসাহভরে মাকে সান্ত্বনা দিল, "তুমি কিছু ভেব না মা, আর একবার না হয় কাশী ঘুরে এসো"।

আবার আগের মতই কাটতে লাগল দিন। মাঝে মাঝে কোনদিন একটু আধটু ঝগড়া হলে জীবনযাত্রায় লাগত সামান্য বৈচিত্র্যের ছোঁয়া।

কিট্টীর ছিল দুই আপন মামা, একজনের নাম বেঙ্কটরায়, অন্যজনের নাম রাঘপ্পা। কিট্টী কেবল তাদের নামই শুনেছিল, হয়ত খুব ছোটবেলায় দেখেও থাকবে, তার কিছুই মনে ছিল না। কিন্তু গঙ্গব্বা যখন কাশী যায় সেই সময় একদিন এক মামা কোথা থেকে এসে উদয় হলেন। রাঘপ্পা কোন কাজে তাদের আপিসে এসেছিল, সেই সময়েই সে কিট্টীকে খুঁজে বার করে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কে কিট্টী ছিল ঋশ্যশৃঙ্গ মুনীর মতই অনভিজ্ঞ। তাই জরীর পাগড়ীধারী গমের মত ফরসা রঙ উঁচুদরের আপন মামার প্রতি কিট্টী বিশেষ কোন আসক্তি অনুভব করেনি। রাঘপ্পা গঙ্গব্বার স্বাস্থ্য, তার কাজকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার পর নিজের সম্বন্ধেও খবর দিয়েছিল, বলেছিল মাস ছয় আগে সে আবার ধারবাড়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছে। কোন এক 'লেন বাজারে'র ঠিকানা দিয়ে কিট্টীকে সে তার বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণও করেছিল। কথায় কথায় জানিয়েছিল এতদিন সে ছিল তাদের বিন্দ্‌গোল গ্রামে, সম্প্রতি বড় মেয়ে মুল্‌কী পরীক্ষায় পাশ করেছে তাই এবার তাকে দু ক্লাস ইংরাজী পড়ানোর ইচ্ছাতেই ধারবাড়ে সংসার তুলে আনা। কিট্টী অন্যমনস্কভাবে এ সব কথা শুনে গিয়েছিল এবং বেশীক্ষণ যেতে না যেতেই ভুলেও গিয়েছিল। গঙ্গব্বা ফিরে আসার দু মাস পরে রাঘপ্পা একদিন এসে হাজির হল তার বাড়িতে।

3. হঠাৎ দেখা

গঙ্গব্বা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি এমনভাবে তার ছোট ভাইয়ের দেখা পাবে। কিট্টী তো আপিসে রাঘপ্পার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল। গঙ্গব্বার কাছে সেই ব্যাপারের কোন আলোচনাই করেনি সে। আগে শোনা থাকলে গঙ্গব্বা, রাঘপ্পার সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য তবু কিছুটা প্রস্তুত থাকত। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দশ বছর পরে কোথা থেকে রাঘু এসে হাজির আজ গঙ্গব্বার ঘরে। গঙ্গব্বাকে নিজের মনের ভাব প্রকাশের অবকাশমাত্র না দিয়ে সে উঠানে পাতা খাটের উপর বসে পড়ে তার এই দশ বছরের সুখ দুঃখের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করে দিল। এদিকে গঙ্গব্বা তো প্রথমটায় বুঝতেই পারছিল না কি নিয়ে কথা বলবে! ভাইয়ের সম্বন্ধে তার মনে জমা ছিল যথেষ্ট ভয় আর ঘৃণা। আগে থেকে জানা থাকলে সেও তার জিভে শান দিয়ে রাখত। এখন তো এই দশ বছরে জিভের ধার পড়ে গেছে। তাছাড়া এই দশটা বছর ভাইয়ের জীবনে কেমন কেটেছে সেটাও জানতে ইচ্ছা করছিল খুবই, কাজেই তার সব কথাই ও মন দিয়ে শুনল। দিনটা রবিবার হওয়ায় কিট্টীও ছিল বাড়িতে, এই অপ্রত্যাশিত অতিথির কথাবার্তা সেও কিছুটা অন্যমনস্কভাবে শুনে যাচ্ছিল।

এতগুলো বছর রাঘপ্পা গ্রামেই কাটিয়েছে। দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম দিয়েই ওর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে, আজও সে সারেনি। মাঝে মাঝে বুকে খুব যন্ত্রণা হয়, বছরে তিন চার মাস সে বিছানাতেই পড়ে থাকে। বিন্দ্গোলে সে কিছুদিন একটা গোশালা করে ভাল জাতের গরু পুষেছিল, কিছুদিন সেই ব্যবসায় চালায়, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ থাকছিল না, এদিকে সংসার তো কোনরকমে চালাতেই হবে। বয়সও কিছু কম হল না। শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারেই তিতিবিরক্ত হয়ে, ক্ষেত খামারে ভাগচাষের বন্দোবস্ত করে সে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সপরিবারে ধারবাড়ে চলে এসেছে। লেন বাজারে বাড়ি নিয়ে মোটামুটি সুখেই আছে। কিন্তু পুরানো দিনের কথা মনে পড়লে বড় কষ্ট হয়, কত আত্মীয়স্বজন ছিল, সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, সবই পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার সব একসঙ্গে মিলিত হলে......ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গব্বা সব কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল আর অপেক্ষা করছিল কতক্ষণে রাঘপ্পার বক্তৃতা শেষ হয়। তার কথাবার্তা ধীরে ধীরে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের পথে মোড় নিচ্ছিল। আত্মীয়স্বজন, গৃহবিবাদ, স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদি ভূমিকার পর কিট্টীর বুদ্ধিসুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা করে তারপর রাঘপ্পা ওর দিকে ফিরে পাশার আসল দানটি ফেলল, "কিট্টণা, আমাদের রত্নাকে কিন্তু আমরা তোমার জন্যই রেখে দিয়েছি। তার জন্য আর আমি অন্য বর খুঁজবো না ......কি, ঠিক বলিনি গঙ্গব্বা" ?

রাঘপ্পা এ বাড়িতে এসেছে অতিথিরূপে, ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে নয়। গঙ্গব্বা হাসিমুখে ঠাট্টার সুরে জবাব দিল, "কিট্টী কি তোমার হাতের বাইরে নাকি ভাই" ?

কিট্টী চাকরী পাবার পর থেকে এই ধরনের গোলমেলে প্রসঙ্গ উঠলেই কিট্টীর একটিই বাঁধাধরা উত্তর ছিল, তার এখন বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। কিন্তু রাঘপ্পাও সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, সে জোঁকের মত লেগে থাকতে জানে।

—"আরে এখন না করো তো দু বছর বাদেই—আমি তো জানি রত্না তোমার জন্যই। সত্যি কথা বলতে কি, ও যেন তোমার জন্যই আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে। একবার তোমার মা বলেছিল, "আমার কিট্টীর বউ তোর বাড়ি থেকেই আনতে হবে"। আর তার ঠিক তিনমাস পরেই জন্মাল রত্না। তোমার মাকেই জিজ্ঞাসা করো না কথাটা ঠিক কি না"।

গঙ্গব্বা ওর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ বাবা কিট্টী, রাঘু আমার কথাতেই বিয়ে করেছিল, আমার কথাতেই বাচ্চারও জন্ম দিয়েছে। আমি না বললে ও একটি কাজও করত না"। রাঘপ্পা তাড়াতাড়ি গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে অন্য দিকে কথাবার্তার মোড় ফেরাল। ওর মনে হল পুরানো কথা গঙ্গব্বা আজও ভুলতে পারেনি এবং তাকে ক্ষমাও করেনি।

"কিট্টণা, রত্না আমার দেখতে কিছু খারাপ নয়। রং বেশ ফর্সা—তবে অবশ্য তুমি যদি সিনেমাওয়ালীদের মত রূপ চাও তাহলে আলাদা কথা। ঘরের কাজকর্ম সবই করতে পারে। তোমার মামীকে দিয়ে তো আজকাল কোন কাজই হয় না, রত্নাই সারা সংসার সামলায়। গঙ্গব্বা, তুমি দেখো, রত্না তোমায় গদীর উপর বসিয়ে রেখে সারা সংসার চালিয়ে নেবে"।

"আমার আবার গদীর কি দরকার? শুধু বিছানাই আমার ভাল", ঠাট্টার সুরে জবাব দিল গঙ্গব্বা। রাঘপ্পা বুঝল। কথার জোরেই সে দুনিয়া জয় করে, কিন্তু আজ গঙ্গব্বার সামনে কথা বলতে গিয়ে তার সেই বাক্‌শক্তি যেন বেশ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল বার বার। গঙ্গব্বা কথার মধ্যে দিয়ে হুল ফোটাতে পারে এটা রাঘপ্পা জানত, আর এটাও সে অনুভব করতে পারছিল যে গত দশ বছরে যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে সেটা তার অনুকূলে নয়। কাজেই রাঘপ্পা এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যেন বোনের কথাগুলো তার কানেই যায় নি। কিট্টীর দিকে ফিরে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সে নিজের গুপ্ত অস্ত্রগুলি একে একে প্রয়োগ করতে শুরু করল।

"কিট্টণা, আমার আর তোমার মায়ের তো এখন পেন্‌সন নেবার সময়। তোমাদের এখন নতুন রক্ত, তোমরা এগিয়ে চলবে আর আমাদের পুরানো মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে এটাই আসল দরকার। তোমার তহসিলদার আমার অনেককালের বন্ধু। কালই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, দেখামাত্রই চিনতে পারল, বাড়িতে আসতে বলল। আমিও আমার বাড়ি আসার জন্য নিমন্ত্রণ করলাম। সে আসতে রাজীও হয়েছে। তোমার আর কোন ব্যাপারেই ভয় পাবার দরকার নেই"।

এতক্ষণ কিট্টী এমনভাবে বসেছিল যেন এসব কথাবার্তার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু রাঘপ্পার শেষের কথাটা শুনেই সে একেবারে গলে গেল।

যেদিন থেকে চাকরীতে ঢুকেছে সেদিন থেকেই সিপাহী থেকে আরম্ভ করে তহসিলদার পর্যন্ত প্রত্যেকে নিজের নিজের পদমর্যাদা অনুসারে তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে আসছে। আপিসে ওর কাজকর্মে প্রায়ই ভুল হতো এবং তহসিলদার ওকে বকাবকি করতেন। ফলে লজ্জিত হয়ে সে আরও বেশী ভুল করে বসত। তার আনাড়ীপনা সর্বদাই পুরানো কেরানীদের হাসির খোরাক জোগাত। মনে মনে কিট্টী স্বপ্ন দেখত কোন একদিন সেও পুরানো কেরানী হয়ে যাবে আর তার মত আনাড়ীদের ভুল ধরে তাদের বকাবকি করবে। কখনো কখনো মা বেচারা তার সেই স্বপ্নের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়াতেন। কিট্টীর মুখ এখন জয়ের আনন্দে ভরে উঠল। রাঘপ্পা বুঝল এখন বিয়ের কথা আলোচনা করে বিশেষ ফল হবে না, তাই সে তহসিলদার প্রসঙ্গই চালিয়ে যেতে লাগল। তহসিলদার আর রাঘপ্পা না কি একই স্কুলে পড়ত, একসঙ্গে ফুটবল খেলত। তহসিলদার ম্যাট্রিক পাশ করে সরকারী চাকরীতে ঢুকে যায়, আর ও নিজেতো চতুর্থ শ্রেণীর পরই স্কুলের দরজায় নমস্কার ঠুকে চলে এসেছে, এই রকম সব নানা কথা বেশ নুন ঝাল সহযোগে পরিবেশন করার পর সে বলল, "আচ্ছা! অনেক দেরী হয়ে গেল, এবার তাহলে যাওয়া যাক"। কিট্টী এতক্ষণ ধরে চোখ বড় বড় করে হাসি-হাসি মুখে কথা শুনছিল, এবার মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "মা, একটু চা করো অন্তত"।

আধঘণ্টা আগে যদি কিট্টী একথা বলত তাহলে হয়ত গঙ্গব্বা চা করে দিত, কিন্তু রাঘপ্পার কথার ধরন এবং কিট্টীর শোনার ভঙ্গী দেখেই বুদ্ধিমতী গঙ্গব্বার বুঝতে দেরী হয়নি যে এই ধরনের আলাপ আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। সে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে জবাব দিল, "রাঘু চা খায় না বাছা"।

কিট্টী ভাবতেও পারেনি মা এতখানি কঠোর হবে এবং তার কথাও অগ্রাহ্য করবে। সে চাকরী করে, তার অতিথি, তার উপর তহসিলদারের বন্ধু, সেই মানুষকে কিনা এমন অপমান! রাঘপ্পা হাসতে হাসতে বলল, "বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার শক্তিও কমে গেছে গঙ্গব্বা। তুমি আগে আমায় যেমনটি দেখেছ তার থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন সর্বদা চা আর তামাক ছাড়া চলেই না। তবে চা আমি খেয়ে এসেছি, এখন আর দরকার নেই। তোমার আর কিট্টণার সঙ্গে দেখা হল চায়ের চেয়ে সেইটাই তো বড় কথা। গঙ্গব্বাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়, সে বলে বসল, "কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আর কিছু বাকি নেই তো ? থাকলে সেটাও বলে যা"। রাঘপ্পা জোর করে আত্মসম্বরণ করল, মুখে বলল, "তাহলে আজ আসি। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ি একবার এসো, গরীবদের একেবারে ভুলে থেকো না ভাই"। সে বাইরে বেরিয়ে এল। নিজের মায়ের অসভ্য ব্যবহারের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ভেবে না পেয়ে কিট্টী শুধু বলল, "চা খেয়ে গেলেই ভাল হত"। মামাকে বিদায় দেবার জন্য কিট্টীও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

দরজা পার হয়ে রাঘপ্পা একবার রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকাল গঙ্গব্বার দিকে। কিট্টী অবশ্য দেখতে পেল না, কিন্তু সে দৃষ্টি গঙ্গব্বার চোখ এড়াল না। এতদিন

পর ভাইকে দেখে মনে যেটুকু বা মমতার উদ্রেক হয়েছিল ঐ দৃষ্টি দেখেই তা উড়ে গেল নিঃশেষে। গঙ্গম্বার মন আবার হয়ে উঠল প্রস্তর-কঠিন।

4. কিট্টীর ক্রোধ

'রাঘপ্পা মামা' এই সম্বোধনের মিষ্টত্ব নিজের কানেই এমন মধুর ঠেকছিল যে মনে মনে তারই রস উপভোগ করতে করতে কিট্টী পথ থেকে বাড়ি ফিরল। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই তার মনে পড়ল মায়ের ত্রুটির জন্য একটু রাগ দেখানো কর্তব্য। সুতরাং সে দুঃখিত গম্ভীর মুখে জোরে জোরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল। বাইরের রোদের থেকে হঠাৎ অন্ধকার ঘরে ঢুকে প্রথমটা ভাল করে কিছু দেখতেই পেল না, কোন রকমে আধছেঁড়া আরাম কেদারাটিতে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল. ফলে আধছেঁড়া চেয়ারের সবটাই গেল ছিঁড়ে। চেয়ারের ফুটো থেকে যতক্ষণে নিজেকে টেনে বার করল ততক্ষণে ওর খুব হাসি পেয়ে গেছে। কিন্তু হাসা চলবে না তাই মুখ হাঁড়ি করে মাদুরের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখে চশমা লাগিয়ে গঙ্গম্বা রান্নাঘরে বসে ভক্তিবিজয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল। কিট্টীর হুটোপাটি শুনে সে পড়া বন্ধ করে এদিকেই কান খাড়া রেখেছিল। কিছুক্ষণ দুজনেই একেবারে চুপচাপ। গঙ্গম্বা বুঝেছে কিট্টী চটে আছে, এখন একটা কথা বললেই ফেটে পড়বে। কিন্তু তবু চুপ করে থাকা সম্ভব হ'ল না, রান্নাঘর থেকে সে ডাক দিল, "কিট্টী, ভেতরে আয়"।

"কেন ?"

"ভেতরে আয়, তবে তো বলব"।

"ওখান থেকেই বল, শুনতে পাচ্ছি"।

"ঠিক আছে, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ঐ রাঘপ্পার বাড়ির সম্বন্ধ আমার পছন্দ নয়"।

"হুঁ"।

"তুই ওর ফাঁদে পড়িস নি তো" ?

"হুঁ"।

গঙ্গম্বার মনে হল এখন আর কথা বলা ঠিক হবে না। কিট্টী তার হাতের বাইরে নয় এটা সে জানে. কিন্তু ওকে বোঝবার পক্ষে এটা উপযুক্ত সময় নয়। কিট্টীর কিন্তু তার নিজের মামা বা মামার মেয়ে সম্বন্ধে কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না, মামা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছে সে কথাও সে ভাবছিল না. তার দুঃখ হয়েছিল এই জন্য যে, নিজের বাড়িতেই তার নিজের কথা খাটে না। সে নিজে একজন সরকারী চাকুরে, তার তহসিলদারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে এমন মামাকে কিনা চা না খাইয়ে বিদায় দিতে হল! বাড়িতে নিজের মা'ই যদি তার মান না রাখে তাহলে আপিসের

সিপাহীরা আর কি দোষ করল ? তার মাথার মধ্যে এইসব কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল, সে আশা করছিল মা এই সময় দু চারটে কথা বাড়ালেই সে একটু মিঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মিনিট পনেরো কেটে যাবার পরও গঙ্গব্বার তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিক পরে মার মুখ থেকে গুনগুন স্বর শোনা গেল, অর্থাৎ মা ভক্তিবিজয়ের পারায়ণ পাঠ শুরু করে দিয়েছে।

কিট্টীর মেজাজ গেল আরো বিগড়ে। এখন তো ঘণ্টাখানেক আর অন্য কোন কথা মা চিন্তাই করবে না, সুতরাং কথা তাকেই শুরু করতে হবে।

"মা, মা"—বেশ জোরেই হাঁক দিল সে। পাঠে তন্ময় গঙ্গব্বা তার ডাক স্পষ্ট শুনতে পায়নি, সে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছিস" ?

"রাঘপ্পা যখন এসেছিল চা করলে না কেন ? এবার শুনতে পেয়েছ" ?

"কি আর বলব বাছা, ও সব কথা যেতে দাও"।

"বাড়িতে লোক এলে যদি তুমি এমনি ব্যবহার করো তাহলে আমার মান ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে যাবে বুঝলে ? আমি সরকারী চাকরে, আমার বাড়িতেই যদি আমার কথা না চলে তো লোকে বলবে কি শুনি ? এই তো বলবে যে......"। কিট্টী বকেই যেতে লাগল।

"কিট্টণা বাবা, চা পাতা শেষ হয়ে গেছে, সকালেই তো তোকে আনতে বলেছিলাম"।

'আরে হাঁ হাঁ, একেবারে ভুলে গেছি। মা তো সকাল বেলাই শেষ চামচ পাতা দিয়ে চা তৈরী করে কৌটো ঝেড়ে ঝুড়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। এখনি নিয়ে আসব, বলেই আমি আবার আপিসের কাগজ পত্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। সব কথা এখন মনে পড়ছে। হরি হরি, হে পুরন্দর বিট্টল, ছি ছি ছি'। কিট্টীর রাগের ঝাঁঝ কমে এসেছিল, এখন একটু একটু হাসিও পেতে লাগল। সে এই ভেবেই নিজেকে ধন্যবাদ দিল যে সেই সময় চায়ের জন্য মায়ের কাছে আরও বেশী জিদ করে নি। তাহলে হয়ত তহসিলদারের পরিচিত মামার সামনে সরকারী চাকুরের রান্নাঘরের দৈন্যদশা একেবারে বেপর্দা হয়ে পড়ত আর তার ফলে আজ যে মেয়ে দিতে এসেছিল কাল সে পিছিয়েও যেতে পারত। এই সব মনে ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই ওর হাসি পেতে লাগল। কিন্তু মায়ের সামনে অত রাগের পর হাসি মুখ দেখালে মান থাকে না তাই রাগ রাগ মুখেই কোট আর টুপী পরে সে বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে।

ছেলের মেজাজের এই পরিবর্তন গঙ্গব্বা টেরই পেল না। সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী অন্য রাস্তা খুঁজে বার করল। গতকাল ছিল শনিবার, হনুমানজীর নাম করে একটি নারকেল ভেঙেছিল, তারই কিছুটা বাকি ছিল, সেটুকু নিল কুরিয়ে, ভাঁড়ার থেকে বার করল ভাজা ছোলার ডাল। কিট্টী ফেরার আগেই তার রুটির সঙ্গে খাবার জন্য চমৎকার চাটনী বানিয়ে রাখল সে। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবন্দনা করেই খেতে বসে গেল কিট্টী। মার সঙ্গে দুপুরবেলার ঝগড়াটা মিটিয়ে নেবার এই উপযুক্ত অবসর। চাটনীর খুব খানিকটা তারিফ করে সে মার সঙ্গে ভাব করে ফেলল।

"কি আর করব বাছা, তুমি যা রেগে গেলে", এই বলে গঙ্গব্বাও শান্তি স্থাপন করতে দেরী করল না। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত চলল মা আর ছেলের গল্প।

5. পুরানো স্মৃতি

"কিট্টণা, আজ দুপুরবেলা তুমি রেগে উঠেছিলে। এই রাঘপ্পার সম্বন্ধে কোন কথাই তুমি জান না। কিন্তু আমরা অনেক কিছু সহ্য করেছি, সে ব্যথা আজও আমার মনে বিঁধে রয়েছে। তোমায় ছেলেমানুষ ভেবে ও যত খুশি মিথ্যা কথা বলে যাক, আমার সামনে যত খুশি তড়্পাক, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সর্বদা হুঁশ রেখো ও যেন কিছুতেই তোমাকে ধোঁকা না দিতে পারে। কোন রকমের কাজেই যার মনে এতটুকু দ্বিধা জাগে না সেই মানুষ নির্বিচারে দু চারটে মিথ্যা কথা বলে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি ? ওর মন ভোলানো কথা শুনে তুমি যেন গলে যেও না।

ওর জন্যই আজ আমাদের এই দশা কিট্টণা! চিরকাল আমরা এমন গরীব ছিলাম না বাছা, এই আমার গায়েই অন্তত একসের সোনার গহনা থাকত। সব একসঙ্গে পরলে তো গহনার ভারে হাতই তুলতে পারতাম না। প্রতি বছর এই পোদ্দার লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গেই আমি যেতাম লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শনে, ও সেই সব দেখেছে। এই জন্যই তো আজও সে আমায় এত খাতির করে। যাক্ সে সব কথা মনে করে তো আজ আর কোন লাভ নেই। আমার যখন সুদিন ছিল তখন এই রাঘপ্পা এসে তোমার বাবার পায়ে ধরে বলেছিল 'ক্ষেত খামার সব বাঁধা পড়েছে, আমায় পাঁচশো টাকা দিন, অন্তত কিছুটা জমি ছাড়িয়ে নিই। তোমার বাবা ছিলেন উদার স্বভাবের মানুষ! কি করব কিট্টণা, তুই তো তখন এতটুকু বাচ্চা, তিনি আমায় একলা ফেলে চলে গেলেন— বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মা—যাক গে, ভুলে যা ওসব কথা, আমি শুধু বসে বসে কাঁদবার আর হা হুতাশ করবার মেয়ে নই, খালি তোর সামনে বসে যখন তাঁর কথা মনে পড়ে তখন বড় কষ্ট হয়। আজ যদি তিনি থাকতেন কি খুশীই না হতেন। তোর জন্য বউ খুঁজতে তিনি কোথায় না যেতেন! যাক্......পাঁচশো টাকা পেয়ে ক্ষেত ছাড়িয়ে নেবার পর ঐ নীচ লোকটার অহঙ্কারের পালা শুরু হল। ওর বৌ চম্পী আজ ঐশ্বর্যে ডুবে আছে অথচ ওদের এমন দিনও গেছে যখন তোর বাবা ওকে বৌ-এর শাড়ী কেনবার টাকা দিলে তবেই তার কপালে নতুন শাড়ী জুটত। শেষ পর্যন্ত এত উপকারের কি প্রতিফলই না দিল! ও কি ভাই না পূর্বজন্মের শত্রু!

তোমার আর এক আপন মামা আছে, এই রাঘপ্পার চেয়ে ছোট—তার নাম বেঙ্কট, জানি না সে আজ বেঁচে আছে কিনা। আজ দশ এগারো বছর হয়ে গেল কোন খবর নেই তার। সে ছিল একটু পাগলাটে ধরনের কিন্তু মনটা ছিল তার ভাল : ভগবানে বড় ভক্তি ছিল তার। অন্যের লাখ টাকাও যদি সামনে পড়ে থাকত সে

কখনও তার একটি পয়সাও ছুঁতো না। আমাদের পরিবারে যা কিছু খারাপ সব রয়েছে ঐ রাঘুর মধ্যেই। বেঙ্কট আমার ছিল আধপাগল। চার ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। রাঘুর বিয়ের পর কে যেন ঠাট্টা করে বলে, 'এবার তোরও বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে'। তাই শুনেই সে পালাল বাড়ি ছেড়ে। কিছুদিন পুনায় ছিল, বোকাটা কাউকে কিছু জানায়ও নি। ওর ভাগের সম্পত্তি হাত করে নেবার আশায় রাঘুও ওর কোন খোঁজ খবর করে নি। নিজে তো ধারবাড়ে সংসার পেতে কিছু না কিছু কাজ-কারবার আরম্ভ করে দিল।

পুনায় এক গুজরাতীর বাড়িতে পূজো পাঠের কাজ করত বেঙ্কট। তিনি ছিলেন মস্ত ধনী লোক আর বেঙ্কটকে তিনি বিশ্বাসও করতেন খুব। জানিনে কে তাকে কি শেখাল যে শেষ পর্যন্ত তারও মনে দেখা দিল টাকার লোভ। একদিন সে দু হাজার টাকার এক হুণ্ডীতে সই জাল করে এক ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে নেয়। কিন্তু সে ছিল পাগল, তার একলার বুদ্ধিতে এমন কাজ সে করতেই পারে না। সেই সময় পুনায় তার ঠিকানা খুঁজে রাঘু গিয়ে তার কাছে দিন দুয়েক ছিল, এসব কুবুদ্ধি ওকে সেই দিয়ে থাকবে।

দু চার দিনের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ল সব কিছু এবং গুজরাতী শেঠ পুলিশে রিপোর্ট করে দিলেন। তখন সে কারো সাহায্যে রাঘুকে তার করে, "আমাকে জেলে যেতে হবে, বাঁচাও"। সেই তার পেয়েই তো রাঘু ছুটে এল আমাদের কাছে। এঁর পায়ে ধরে বলল, "যেমন করে হোক আমার ভাইকে ছাড়িয়ে আনুন, একবার যদি লোকে জেনে যায় আমাদের বংশে কারো জেল হয়েছে তাহলে যা দু চার পয়সা রোজগার করছি তাও আর সম্ভব হবে না"। শুধু আমার মন রাখার জন্যই ইনি ঐ ব্যাপারে নিজেকে জড়ালেন। সেই রাত্রেই রাঘুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন পুনা। রাঘুর তো সমস্ত ক্ষেতখামার বন্ধক দেওয়া ছিল, ইনিই পাঁচ হাজার টাকা জামানত দিয়ে বেঙ্কটকে ছাড়িয়ে ধারবাড়ে নিয়ে এলেন। ওঁর নিজের কাজ কিছু কম ছিল না কিন্তু তবু সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন বেঙ্কটকে। একদিন বেঙ্কটকে রাঘুর কাছে শুতে পাঠিয়েছিলেন, সেই রাতেই রাঘু যে তার মাথায় কি ঢুকিয়ে দিল কে জানে, রাতারাতি ছেলেটা দেশ ছেড়ে পালালো। তারপর আজ পর্যন্ত আর সেই পাগলের কোন খবর নেই।

এরপর যা হবার তাই হল। তার জামিন হয়ে ইনি যে ভুল করেছিলেন তারই ফলে বিষয়সম্পত্তি ঘরবাড়ি সর্বকিছু গেল। বাড়ির যা কিছু দামী জিনিসপত্র, সব নিলাম হয়ে গেল জলের দরে, একেবারে শূন্য হয়ে গেল ঘর। তখন এসে রাঘুর সে কি কান্না, কত নাটকই করল। এঁর সে সব একেবারেই ভাল লাগল না। এইসব দুশ্চিন্তা থেকেই দেখা দিল তাঁর হৃদ্‌রোগ, আর সেই রোগেই তো শেষ পর্যন্ত"—এই পর্যন্ত বলে আবার ফুঁপিয়ে উঠল মা, একটু পরে শান্ত হয়ে আবার শুরু করল, "যাক্, আজ আর কেঁদে তো কিছুই ফিরে পাব না, সে রামায়ণ আলোচনা করে আর

লাভ নেই কিছু। পরের বছর ধারবাড় ছেড়ে রাঘু চলে যায় বিন্দ্‌গোলে, সেখানে চাষবাস করে এখন সে বড়লোক হয়েছে, তাই আজ এসেছে নিজের পয়সা দেখাতে আর আমাদের অবস্থা নিয়ে তামাশা করতে। কিট্টুণা, কিছু কিছু কথা বলা যায়, সব কথা বলা যায় না, কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে ও লোকটা একেবারেই বিশ্বাস-যোগ্য নয়, ওর সঙ্গে তুমি মিশো না"।

আরও অনেক ছোটখাট কথা বলল গঙ্গব্বা, রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলল মা আর ছেলের কথাবার্তা। চাকরী শুরু করার পর এই প্রথম মা'র মুখ থেকে কিট্টী এত কথা শুনল। যে অতীতকে সে কোনদিন দেখেনি তারই একখানা সুস্পষ্ট ছবি যেন আঁকা হয়ে গেল ওর মনের পটে। মায়ের প্রতি গভীর ভালবাসায় ভরে উঠল ওর মন।

6. সংঘর্ষ

মা পুরানো যুগের আর কিট্টী নতুন যুগের। প্রত্যেক যুগেরই আছে কিছু কিছু নিজস্ব সমস্যা। সে সব এড়িয়ে চলার সাধ্য ছিল না কিট্টীর। বিয়ে করার সাহস তার ছিল না। কিন্তু আমাদের সমাজে ছেলের আঠারো কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই মেয়ের বাপেরা চারদিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরে কোন প্রকারে তার মগজে এটা প্রবেশ করিয়ে দেন যে বিবাহ ব্যাপারটা জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে সব ছেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার মত মনের জোর নেই তারা মেয়ের বাবার ঐ সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। বিয়ের নামেই কিট্টীর ভয় হত, কিন্তু তাহলেও তার মনে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে আজ হোক কাল হোক বিয়ে তাকে একদিন করতেই হবে। এদিকে আপিসে তো রোজকার তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিলই।

সেদিন রাস্তায় বিদায় নেবার সময় রাঘপ্পার শেষ কথাগুলো আপিসে বসেও কিট্টীর কানে বাজছিল। 'কিট্টুণা, আমি আর তোমার মা এখন পৌঁছে গেছি পেন্‌সন নেবার অবস্থায়, আমাদের কথাবার্তা তো আমাদেরই ধাঁচের হবে, এর জন্য তুমি তোমার মায়ের উপর রাগ করো না। পুরানো যুগের স্ত্রীলোক এই নতুন যুগের কথা বুঝতেই পারে না। আমাদের ঝগড়া আর মনোমালিন্য তাই চলতেই থাকে কিন্তু তোমাদের তো অতীতের ব্যাপার মনে করে রাখা উচিত নয়, তোমাদের এগিয়ে চলতে হবে, ভবিষ্যতে যা হতে চাও সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে'। রাঘপ্পার এই কথাগুলো ওর বেশ যুক্তিসঙ্গতই মনে হচ্ছিল।

কিট্টীর সামনে ছিল নানা ধরনের সমস্যা। ক্রমশ তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল নতুন যুগোপযোগী মানবিকতা, ফলে বিগত যুগের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। যেমন ধরা যাক, ছাত্রজীবনে যে বাড়িতে নিয়মমাফিক সাপ্তাহিক আহার

করতে যেত সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তাঁকে নমস্কার করাটা উচিত কিনা এই নিয়ে কিট্টী সঙ্কটে পড়ে যেত। যাঁদের কাছে কিট্টী এইভাবে উপকৃত এমন মানুষ তো গ্রামে অনেক। হাফপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরতে শুরু করার বয়স থেকেই কিট্টীর মনে সদাই আশঙ্কা হত যে তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে। ক্রমশ ওর মাথার চুল হচ্ছিল লম্বা আর টিকি হয়ে আসছিল ক্ষীণ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথি বাগানো আরম্ভ হল, টিকিটা কোনরকমে লুকোবার জন্য কিট্টী কায়দা করে এক কালো টুপী পরা শুরু করল, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই কালো টুপীর পাশ থেকে বেরিয়ে পড়ত টিকির গুচ্ছ, বন্ধুরা শুরু করত টানাটানি। কখনো কখনো ওর মনে হত সোজা বলে দেয় "আমার জামাকাপড় বা আমার মাথার চুল এগুলো আমার নিজস্ব সম্পত্তি, এর সঙ্গে তোমাদের তো কোন সম্পর্ক নেই !" কিন্তু এসব কথা বলার জন্যও ওর নিজের চেয়ে বড় কোন কেরানীর পরামর্শ দরকার হত। ও ভাবত কোন না কোনদিন এরা তার কিছু কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া কাউকে কড়া করে কিছু বলাও কিট্টীর সাধ্য ছিল না।

এই ভয় ভয় ভাবটাই ছিল কিট্টীর সবচেয়ে বড় মানসিক সমস্যা। ছাত্রজীবনে যখনই কিছু কষ্ট পেয়েছে তখনই এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, 'আমি তো সাপ্তাহিক ভোজনে খেতে পাওয়া ছেলে, আমার কি এত রাগ দেখালে চলে ?' নিজেকে এইভাবে সর্বদা নত করে রাখাই ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য এখন আর রাগ করাটাও ওর ঠিকমত আসত না। রাগ যদি কোথাও দেখাত তো সে কেবল বাড়িতে নিজের মায়ের সামনে। নিজের রাগ প্রকাশের অক্ষমতার দুঃখে আজকাল ওর মা, বাবা এমন কি স্বয়ং ভগবানকেও অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে। মায়ের মুখে নিজেদের অতীত ঐশ্বর্যের গল্প অনেক শোনা গেছে, আজ যদি সে সব থাকত তাহলে কি আর এই মানসিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারত তার মধ্যে ?

কিন্তু এই তিক্ততা সত্ত্বেও কিট্টীর মনে মায়ের প্রতি ছিল করুণা আর ভালবাসা। কিট্টীর চাকরী পাওয়া উপলক্ষ্যে প্রতিবেশী দেসাঈজী ওকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "কিট্টী, তোমার মা বহু কষ্ট সয়েছেন, কিভাবে উনি তোমাকে মানুষ করে তুলেছেন তা আমরা দেখেছি। ওঁকে তুমি সুখী করো"। চাকরী পাবার আনন্দে সে বলে উঠেছিল, "ওঁর জন্যই তো আমার চাকরীটা হল"। কথাটা মুখ থেকে বার হওয়ার পরমুহূর্তেই সে অনুভব করেছিল বড় বোকার মত বলা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাড়ির ভিতর খাবার পরিবেশন করতে এসে দেসাঈজীর ভাইঝি টিটকারী দিয়ে হেসে উঠেছিল। দেসাঈজীর স্ত্রী বেণুবাঈ বলেছিলেন, "পাগল ছেলে, আমরা সেকথা বলিনি। এখন তো তোর বিয়ে করে সংসার পাতার বয়স হয়েছে, কারো কথায় সহজে ভুলবি না মনে থাকে যেন"। আজও সেকথা মনে পড়লে কিট্টীর নিজেকে মনে হয় অযোগ্য আর অপমানিত।

এদিকে কাছারীতে একটা ঘটনা ঘটল, কিট্টীর পদ পরিবর্তন হল। পেয়াদা হুসেনকে কিট্টী বরাবরই একটু ভয় করে চলে। আপিসশুদ্ধ সবাই জানে হুসেন বেজায় হুঁশিয়ার আর করিৎকর্মা লোক। এতদিন কিট্টীর সঙ্গে হুসেনের পরিচয় ছিল কেবল দূর থেকে। প্রথম যেদিন কাছারীর সময়ের আগেই সাবান কাচা সাদা শার্ট, খাকি প্যাণ্ট আর টুপী পরে কিট্টী হাজির হয়েছিল সেইদিনই হুসেন বেশ একটু ছুঁচ ফোটানো বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার দিকে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কিট্টীর চালচলন, বেশ-ভূষা বা কথাবার্তা অন্য কারো নজর যদি বা এড়াতে পেরেছে, কিন্তু হুসেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোনদিনও এড়াতে পারেনি। রাস্তায় দেখা হলে হুসেন যদি সেলাম করত তাহলেও কিট্টীর মনে হত, ও বোধ হয় ঠাট্টা করছে। কিন্তু আজ হুসেন নিজে থেকেই এসে ওকে সেলাম করে দাঁড়াল। এই নতুন কায়দা দেখে কিট্টী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার" ?

হুসেন বলল, "বাইরে কেউ একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়"।

আর কিছু না বলে কিট্টী চুপচাপ বাইরে এসে দেখে লুঙ্গিপরা কালো চশমা চোখে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। একটু তফাতে হুসেনও এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল যেন সেও এই কথোপকথনে অংশগ্রহণ করবে। কিট্টী বুঝল এ সবই চেয়ারের প্রভাব। এখনও কিট্টী নতুন পদের চার্জও নেয়নি, মাত্র একদিন আগে সে বদলীর আদেশ পেয়েছে। কিট্টী ভাবতেই পারে নি এত তাড়াতাড়ি তার বদলীর খবর আপিসের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে।

কালো চশমা পরা লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "আমার নাম কীটল্লী ভীমন্না। আমার একটা ঝগড়ার মামলা আপনার কাছে আসবে। মামলা একেবারে পরিষ্কার, এতদিনে আমার স্বপক্ষে ফয়সলা হয়েও যেত। আপনার জায়গায় আগে যে সাহেব ছিলেন তিনি বলেছিলেন সমস্ত রাফ নোট তৈরী করেই রেখেছেন। উনি বদলী হয়ে যাওয়াতেই এখন আমার চিন্তা হচ্ছে। মামলায় কোন গোলমাল নেই। ওঁর তৈয়ার করা নোটটাই যদি আপনি পেশ করে দেন তো বড় উপকার হয়, কেস্ তো একেবারে ক্লিয়ার"—এত সব কথা শোনার পর কিট্টী শুধু বলল, "আমি এখনও চার্জ নিই নি, পরে দেখা যাবে"।

হুসেন একটু অবাক হয়ে গেল। কিট্টীর জবাব শুনে তার মনে শ্রদ্ধাও হল একটু। 'দেখা যাবে' এই সহজ সরল শব্দটির একটাই মানে জানত হুসেন। তার ধারণা 'দেখা যাবে' বোলনেওয়ালা সাহেবই আসল সাহেব। স এব বক্তা স চ দর্শনীয়ঃ, তাছাড়া চেয়ারের উপর হুসেনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসলে ছোট শিশুও যেমন ন্যায়বিচার করতে পারত তেমনিই ভাল চেয়ারে বসে একেবারে বুদ্ধুও নিশ্চয় সাহেব বনে যেতে পারে। হুসেনের অভিজ্ঞতাসাগরে কিট্টী এক নতুন রত্ন। নতুন পদের চার্জ না নিয়েই সে 'দেখা যাবে' বলতে পারছে, একে চেয়ারের মহিমা ছাড়া আর কি বলা যায় ?

কিট্টীর প্রতি নবজাগ্রত ভক্তির উৎসাহে হুসেন কালো চশমাপরা লোকটিকে দিল এক দাবড়ানি, "কি কেস্ ক্লিয়ার, কেস্ ক্লিয়ার বকে যাচ্ছ, কুর্সির একটা ইজ্জত করতে জান না ?"

কালো চশমাওয়ালা তখন হাতড়ে হাভড়ে দু তিন টাকার নোট বার করল, হুসেন চটে উঠে বলল, "নতুন সাহেব দেখে এই সব ঢং হচ্ছে, না ?" কিট্টীর দিকে ফিরে সে বলল, "সাহেব, আপনি ভিতরে যান। আমি একে দেখছি।"

এর পরবর্তী পনেরো মিনিটে কিট্টীর হাতে এসে পৌঁছল একখানি পাঁচ টাকার নোট। হুসেনের পকেটেও এসেছিল নগদ একটি টাকা। এই ধরনের প্রাপ্তিযোগের খবর কিট্টীর এতদিন জানা ছিল না। হুসেনের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা কেবল কানেই শোনা ছিল। কিট্টীর এই নতুন পদে বদলী হওয়া প্রথম দিন থেকেই বহু জনের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেডক্লার্ক জোশী রামরায় জানত যে ঐ কালো চশমাওয়ালা লোকটার জন্যই তহসিলদার কিট্টীর মত এক আনাড়ী ব্যক্তিকে ঐ পদে বসিয়েছে। তবে প্রথম দিনেই নগদ পাঁচ টাকা এবং হুসেনের বন্ধুত্ব অর্জন করে কিট্টীর মেজাজ ছিল খুবই প্রসন্ন। হুসেনের কেরামতির প্রতি যারা নজর রাখত সেইরকম কয়েকজন কেরানী সেই-দিনই ছুটির পর কিট্টীকে টেনে নিয়ে এল চায়ের দোকানে। কিট্টী এর আগে কোন-দিন চায়ের দোকানে যায়নি কিন্তু হুসেনের নেকনজর পাবার প্রারম্ভিক উৎসব তো করতেই হবে কাজেই তাকে ঢুকতে হল চায়ের দোকানে। ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে কিট্টী নিজে নিল কেবল এক পেয়ালা দুধ তবে বন্ধুদের জন্য খরচা করে ফেলল পনেরো আনা। রামরায় কিট্টীর পয়সায় কেনা খাবারের রসাস্বাদন করতে করতে আধঘণ্টা ধরে টিকা টিপ্পনী সহযোগে বক বক করে ওর মাথা ধরিয়ে দিল। প্রশ্ন করল, "তোমার চা চলে না, সিগারেট চলে না, তামাক চলে না, আড্ডাও দাও না, বউ পর্যন্ত চাই না, তবে তুমি চাকরী করতে এসেছ কেন কৃষ্ণজী ?" কিট্টী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। পার্টি ভাঙবার সময় রামরায় বলল, "কৃষ্ণজী, এ সব পয়সা এ ভাবেই খরচা করতে হয়, অন্য কাজের জন্য এ পয়সা থাকে না। তা যদি না হত তাহলে আমরা সব এতদিনে আমীর বনে যেতাম। একে এইভাবেই খরচা করা উচিত"। অন্য সব সঙ্গীরা এই উপদেশ শুনে সবাই খুব জোর গলায় সায় দিয়ে উঠল। রামরায়ের উপদেশ কিট্টীর মনে ক্ষণিকের বেশী প্রভাব রাখতে পারে নি। পকেটে খুচরো পয়সার ঝুন ঝুন শুনতে শুনতে চুরি করে খাওয়া বেড়ালের মত কিট্টী বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। পথে পোদ্দার লক্ষ্মীবাঈ-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা, কিন্তু তবু কিট্টী ভাণ করল যেন তাঁকে দেখতেই পায়নি, একটিও কথাবার্তা না বলে সোজা চলল বাড়ির পথে।

হেডক্লার্ক জোশী রামরায় জানত এই কেস্টার ব্যাপারে তহসিলদার সাহেবের নিজেরও যথেষ্ট ঔৎসুক্য আছে। আগেকার কেরানী সত্যিই কিছু নোট তৈরী করে গেছে কিনা

দেখার জন্য কিট্টী নিজের টেবিল তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু পেল না কিছুই। তখন সে গেল রামরায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে। জোশী রামরায়কে লোকে বলত শনি রামরায়। চা পার্টির দিন থেকেই সে ঠিক করে রেখেছিল কিট্টীকে একটা ঘা দেবে। কিট্টীর আনা কাগজপত্র দেখে সে, 'কেস্ তো একেবারে ক্লিয়ার' বলে কিল্লী ভীমন্নার অনুকূলে নোট লিখে কিট্টীকে দিয়ে দিল। কিট্টী নিজের হাতে সুন্দর অক্ষরে সেই নোটটিই নকল করে পাঠিয়ে দিল তহসিলদারের কাছে।

দশ মিনিট পরেই ডাক পড়ল তহসিলদার সাহেবের ঘরে। কিট্টীর তো ততক্ষণে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রামরায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি জবাব দিতে হবে ?" রামরায় তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "আরে তহসিলদার মাথা মুণ্ডু কিছু জানে নাকি ? কিছু বলে তো সোজা জবাব দেবে সব কিছু নিয়ম অনুসারেই করা হয়েছে। কেস্ তো একেবারে ক্লিয়ার। এখন তুমি নরম হলে পরে ও তোমারই মাথায় লঙ্কা বাটবে।"

কিট্টী গিয়ে ঢুকল তহসিলদারের ঘরে। তহসিলদার খাড়া বসেছিলেন। তাঁর টেবিলের উপর হাত রেখে কিট্টী প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে সাহেব ?"

"আগে টেবিল থেকে হাত ওঠাও", গর্জন করলেন সাহেব। তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিয়ে কিট্টী সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তহসিলদার সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত ঘুষ খেয়েছ ?"

"না সাহেব......"

"আরে সাহেব কে বাচ্চে, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।"

কিট্টী একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

"হুঁঃ নোট লিখেছেন ! নোট, কে তোকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছে আর কে তোকে চাকরী দিয়েছে, যা, গাধা চরাগে যা।"

"কেন সাহেব, আমার কি কিছু ভুল..."

"ভুল নয় রে গাধা, ঘুষ নিয়েছিস কিনা বল ? এই পার্টির ঐ 'ফাইটের' কথাটা নোটে লেখা হয়নি কেন ?"

কিট্টী কিছুই বুঝতে পারল না, বিভ্রান্তের মত সে বলল, "ভুল হয়ে গেছে সাহেব।"

তহসিলদারের মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এল—"কৃষ্ণজী, তুমি নতুন লোক। অন্য কাউকে ঐ জায়গায় বসালে সর্বনাশ করে ছাড়বে এই ভেবেই তোমাকে ওখানে দিলাম। কিন্তু ঐ জায়গায় দুদিন যেতে না যেতেই তুমিও ঐ সব শিখে গেলে ? একেবারেই টাকা খাবে না এমন কথা বলছি না, কিন্তু আইন অনুসারে চলতে হবে তো ? যেমন হজম করতে পারবে ততটাই খাও। আজ ঘুষ খেয়ে কাল যদি তা আবার উগ্‌রে ফেলতে হয় তবে আর লাভটা কি হল ? আগে নিজের চাকরী বাঁচিয়ে চলতে শেখো তারপর যা খুশি তাই ক'রো।"

ভগবানের কৃপায় একটা ভাল হয়েছিল এই যে সাহেবের রাগ দেখে রামরায়ের শেখানো বুলি কিট্টী সব ভুলে গিয়েছিল। আর কোন কথা না বলে সাহেব যেমন যেমন বলে দিলেন সেইভাবে নোট লিখে সে সাহেবের সামনে পেশ করল। তার বিদ্যের বহর দেখে সাহেব বেশ বেজার মুখে সই করে দিলেন।

কিট্টী অপমানে লজ্জায় মুখ লাল করে ফিরে এল নিজের টেবিলের কাছে। রাম-রায়ের সামনে মুখ দেখাতেও ইচ্ছা হল না। তার শেখানো উপদেশ তো দূরের কথা উলটে নিজের মুখে দোষ স্বীকার করা, সাহেবের কথা অনুসারে নোট লেখা, তারপর সাহেবের রাগ পড়তে দেখে ধড়ে প্রাণ আসা, এই সব কিছুর মধ্যেই এত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে তার নিজের দুর্বলতা সেই লজ্জায় সারা হয়ে যাচ্ছিল সে।

সব কেরানীরাই ভাব দেখাচ্ছিল যেন নিজেদের কাগজপত্র নিয়ে একেবারে ডুবে রয়েছে, আসলে মুখ লুকিয়ে হাসছিল সবাই। সেই সন্ধ্যায় কিট্টীর মনের সমস্ত গর্ব একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ওর মনে হতে লাগল, কাজটা যদি ঠিক নাও হয়ে থাকে তাহলেও এভাবে গালিগালাজ শোনার হাত থেকে বাঁচতেই হবে। স্বভাবগত বিনয়ের সাহায্যে কাজ আমি চালিয়ে যেতে পারব কিন্তু এই অসহ্য গালাগাল শুনতে পারব না, এ যেন ছুঁচের মত বিঁধছে সারা দেহে।

7: গঙ্গব্বার চিন্তা

সেদিন সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ গঙ্গব্বা গিয়েছিল দেসাঈদের বাড়ি। দেসাঈদের বড় ছেলে অচ্যুত কমার্স পড়তে বোম্বাই চলে গেছে তাই আজকাল ওঁদের দ্বিতীয় পুত্র বসন্তরাও সংসারের ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে হঠাৎ বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে। গঙ্গব্বা এবং তার ছেলেকে বসন্তরাও একেবারেই সুনজরে দেখে না তার কারণ কিট্টী প্রতি বছর পরীক্ষায় ঠিকঠাক পাশ করে যায় আর এখন তো প্রথম চেষ্টাতেই ম্যাট্রিক পাশ করে বসন্তরাওয়ের থেকে এগিয়ে গেছে। দেসাঈ যখন বলেন, "আমার কাছে কিট্টী আর বসন্তে কোন প্রভেদ নেই", তখন বসন্তর মনে হয় ওর বাবা কিট্টীকেই আসলে বেশী ভালবাসেন। তাছাড়া মাস দুই হল সে জানতে পেরেছে যে কিট্টীর মা প্রায়ই চুপি চুপি এসে দশ পনেরো টাকা চেয়ে নিয়ে যান। বসন্তরাও চমকদার সিনেমা দেখতে বড় ভালবাসে, কিন্তু সেদিন বাবার কাছে পয়সা চেয়ে হতাশ হতে হয়েছে সেই দুঃখে তার তখন জীবন ব্যর্থ মনে হচ্ছিল। মনের দুঃখে উঠানের চাটাইয়ে শুয়ে মাছি তাড়াচ্ছিল সে, এমন সময়ে গঙ্গব্বার প্রবেশ। তিক্তস্বরে বলে উঠল বসন্তরাও, "আসুন, কত টাকা চাই ? বাড়ির পেছনে আমরা তো পয়সার গাছ লাগিয়ে রেখেছি কিনা !"

কথাটা তীরের মত বিঁধল গঙ্গবাকে, দ্রুতপদে সে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে। দেসাঈজী আয়েস করে পান খাচ্ছিলেন, তাঁর সামনে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "গোপন্না, আমরা তোমার আশ্রয়ে আছি এটা ঠিক কিন্তু আমি যে এসে তোমার কাছে টাকা চেয়ে নিয়ে যাই সে কার টাকা ? কথাটা নিজের ছেলেকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

সব কথা শুনে দেসাঈজী খুব দুঃখিত হলেন এবং ছেলেকে ডেকে বেশ ধমক দিয়ে দিলেন। সিনেমা দেখার তিন আনা পয়সা না পাওয়ার দুঃখে গজ গজ করতে করতে চলে গেল সে, কিন্তু গঙ্গবার কথাগুলো বাজতে লাগল তার কানে—কার টাকা ? এ প্রশ্নের অর্থ কি ? এই কথাই ভাবতে লাগল সে মনে মনে।

দেসাঈজী বুঝেছিলেন এমনি সময়ে গঙ্গবার আগমনের নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণ আছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মন দিয়ে শুনলেন তার কথা। গঙ্গবাকে তিনি খুবই স্নেহ করেন বটে কিন্তু তাদের পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষ মাথা গলাতে চান না, কারণ তাঁর ভয়, ভাল করতে গিয়ে পাছে মন্দ ফল হয়। গঙ্গবা তো তার যা কিছু সমস্যা সবই নিয়ে গিয়ে হাজির হত তাঁর কাছে, কিন্তু তিনি যেগুলো সত্যিই জরুরী ব্যাপার বলে মনে হত সেইগুলোই শুধু দেখতেন। "কিট্টী আমার সঙ্গে আগের মত গল্প করে না, কিট্টী বড় বেশী পয়সা খরচ করে, কিট্টী বেশী রাত করে বাড়ি ফেরে", গঙ্গবার এই সব ছোটখাট তুচ্ছ নালিশ দেসাঈ শুনতে ভালবাসেন না। তিনি যে কাজ হাতে নেন তা ভালভাবে সম্পন্ন করে তবেই স্বস্তি পান তবে অন্যের ব্যাপারে বেশী মাথা গলানো উচিত নয় এই ভেবে যতদূর সম্ভব দূরে দূরেই থাকেন, চট করে কোন কাজের ভার হাতে নেন না। কিন্তু উনি না চাইলে কি হবে, গঙ্গবা সর্বদাই তার যা কিছু সমস্যা সব এনে ফেলে দেয় ওঁরই ঘাড়ে।

"গোপন্না, এ মাসে কিট্টী কত টাকা দিয়েছে ?"

"কোট সেলাই করাতে হবে বলছিল। পাঁচ টাকা দিয়েছে বোধ হয়।"

গঙ্গবা বলে উঠল, "তুমি একটু বল না ওকে, বড্ড বেশী খরচা করতে আরম্ভ করেছে। বেহিসেবী খরচা শুরু করে দিয়েছে।" পুরুষমানুষের সমস্যা দেসাঈ জানেন, তাই একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "ছেলে তো তোমার পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু নয়। সে চাকরী করছে, নিজে রোজগার করছে। এখন বড় হয়েছে তো, এ ভাবে আর কথা বলা উচিত নয়। তুমি হয়ত বলতেও পারো কিন্তু আমার মুখ দিয়ে এসব কথা বলানো মোটেই উচিত হবে না। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'।"

এসব শাস্ত্রকথা গঙ্গবার কাছে অসহ্য। সে চটে গিয়ে বলল, "তার মানে তুমি বলতে চাও যা কিছু হচ্ছে সব চুপচাপ দেখে যাবো ?" রাগে তার হেঁচকি উঠে গেল। তার রকম দেখে দেসাঈয়ের মনে হল গঙ্গবার মনে আরো কোন কথা জমে আছে। কিন্তু এই পরিবারের নিজস্ব ব্যাপারে নাক গলাতে অনিচ্ছুক দেসাঈ আরো কিছুক্ষণ চুপ করেই রইলেন। কিন্তু গঙ্গবা যখন আঁচলে মুখ ঢাকল তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না, প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে বল তো ?"

"হবে আবার কি ? রোজকার মত কাছারি থেকে তো রেগেমেগেই বাড়ি ফিরল তারপর বলল রাত্রে গান শুনতে যাবো। যেতে বললুম..." গঙ্গব্বা আর কিছু বলতে পারে না। দেসাঈজী তখন সান্ত্বনা দিতে দিতে ক্রমে সব কথা জেনে নিলেন, গান বাজনার আসরটা বসেছে গঙ্গব্বার ভাই রাঘপ্পারই বাড়িতে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই যে আপিসে এসে রাঘপ্পা যখন কিট্টীকে গান শুনতে যাবার নিমন্ত্রণ করে প্রথমটায় সে যেতে রাজী হয়নি কারণ গানের প্রতি কিট্টীর প্রীতি ছিল অনেকটা ঔরঙ্গজেবের মতই। কিন্তু যাবার সময় রাঘপ্পা বলে যায়, "তহসিলদার সাহেবও আসছেন ওখানে, তাঁর সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করিয়ে দেব।" এই কারণেই কিট্টীর মনে ওখানে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। সে ভাবল গালিবিশারদ তহসিলদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেলে হয়ত ঐ কামানের গোলার মত গালিবর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। স্বয়ং ভগবানই যেন রাঘপ্পা মামা হয়ে ওর সামনে এসেছেন।

নতুন পদে বদলী হবার পর বাড়িতেও কিট্টীর ব্যবহারে দেখা দিয়েছিল পরিবর্তন। সকালে উঠত দেরীতে, সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে ফিরত অনেক দেরী করে। এসেই বলত, ক্ষুধা নেই। তারপর কোনরকমে দু গ্রাস মুখে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। বাইরে থেকে দু চার পয়সা আসতে আরম্ভ করেছে এটা একেবারে গোপন রাখত। বাড়িতে কথাবার্তা বলাই কম করে দিয়েছিল আজকাল। আগের সেই ছেলেমানুষী ভাব আর ছিল না। কাজেই বাড়িতে আর বিশেষ সাড়াশব্দ শোনা যেত না। খেতে বসে মায়ের সঙ্গে সেই গল্পগুজব একেবারে বন্ধ। মার কাছে সে যেন কিছু লুকোতে চায়। হয়ত কিট্টীর মনে হত বাড়িতে বেশী কথা বললে, মা উপরি আয়ের খবর জেনে যাবে আর সেই পয়সাও চেয়ে বসবে, কিম্বা হয়ত লজ্জাতেই বলতে পারত না এটাও সম্ভব।

গঙ্গব্বা কিন্তু এতে বড় দুঃখ পাচ্ছিল। প্রথম কিছুদিন ভাবত হয়ত আপিসে খুব খাটুনি পড়েছে তাই চুপ করেই থাকত, শেষে একদিন মাতৃত্বের অধিকারেই প্রশ্ন করে বসল, "কিট্টী, তহসিলদার সাহেব তোর কাজকর্ম সম্বন্ধে কি বলেন ? ওঁকে খুশী রাখতে চেষ্টা করিস তো বাবা ? আজকে আনারসাটা (মিষ্টি খাবার) খুব ভাল হয়েছে, গরম গরম দু চারখানা ভেজে দিই ওঁর বাড়িতে দিয়ে আয়।"

এ সব কথাবার্তা কিট্টীর একেবারেই পছন্দ নয়, মা যা একেবারেই বোঝে না তা নিয়ে কথা বলতে আসে কেন। সে যে এখন বড় হয়ে গেছে এটা মা বুঝতেই পারে না। এই কারণে আজকাল তার বড় রাগ হত মায়ের উপর। মা তহসিলদারের নাম করলেই ওর মনে হত মা এটাই দেখাবার চেষ্টা করছে যে তার চেষ্টাতেই ওর চাকরীটা হয়েছে। ফলে অপমানিত বোধ করে সে চেঁচামেচি করে রাগ দেখাত। গঙ্গব্বা দেখত প্রতিদিন আপিস থেকে মেজাজ খারাপ করে ঘরে ফেরাটা ছেলের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এটাও গঙ্গব্বার হয়ত সহ্য হত, কিন্তু যে চারাটিকে আজ দশ বছর ধরে জল দিয়ে সে বড় করে তুলেছে তাতে যখন ফল ধরবার সময় এল তখনই রাঘপ্পা এসে জুটেছে তাকে চুরি করে নিতে এটা সে সহ্য করবে কেমন করে ?
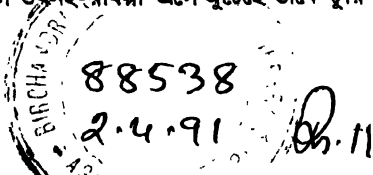
কেবল সেই দিন কিট্টী মাকে ধাপ্পা দিয়ে জিতে গিয়েছিল।

রাঘপ্পার বাড়ি যাবার কথা শুনলেই মা একেবারে ক্ষেপে উঠবে এটা সে ভাল করেই জানত কাজেই রাগ পড়ার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ সে চুপচাপই রইল। মায়ের বকাবকি শেষ হলে জামা কাপড়ের ট্রাঙ্ক ওলট পালট করতে করতে অসন্তুষ্ট স্বরে বলে উঠল, "তহসিলদার সাহেবও যাচ্ছেন গান শুনতে, ওঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ পরিচয় হয়ে যাবে এই ভেবেই রাজী হয়েছিলাম। তোমার রাঘুর মেয়ের গলায় বরমাল্য পরাতে যাচ্ছি না। সকালে উঠেই তোমার সেই চিৎকার চেঁচামেচি, এ বেলা বাড়ি ফিরতেই আবার সেই সুর ধরেছ, এদিকে পরবার মত একটা ইস্ত্রি করা কোট নেই, কি পরে যাব শুনি? ঠিক আছে, এই ময়লা কোট পরেই তহসিলদারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হব।"

গঙ্গব্বা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। মাকে এমন বেকায়দায় ফেলতে পেরে কিট্টীও বড় খুশী, নতুন জায়গায় কাজ করতে এসে ও বেশ বাক্‌চাতুরী আয়ত্ব করে ফেলেছে। কাউকে রাগিয়ে দিয়ে তারপর তার মুখ বন্ধ করা অবশ্য খুব বেশী কঠিন নয় তবে গঙ্গব্বা এইতেই সামলে গেল।

"তহসিলদারের সঙ্গে পরিচয় করতে রাঘুকে কি দরকার? বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য কি ল্যাংড়া দাসের সাহায্য নিতে হয়? আমি তো কবে থেকেই বলছি, কিট্টী বাবা একবার তহসিলদারের বাড়িতে যা, দেখা করে আয়, তাঁর কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে আয়। পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নিতে হয়। তা আমার কথা আর কে শোনে? এখন তহসিলদারের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য রাঘপ্পা মামার দরকার হয়ে পড়েছে।"

"মা, তুমি যা জান না তাই নিয়ে কথা বল কেন? এখন নতুন তহসিলদার এসেছেন, আগের তহসিলদার বদলী হয়ে গেছেন পাঁচমাস হয়ে গেল।"

গঙ্গব্বার মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, মুখ দিয়ে তার আর একটি শব্দও বের হল না। আগের তহসিলদার ছিলেন গঙ্গব্বার স্বামীর বন্ধু। স্বামী বেঁচে থাকতে গঙ্গব্বা ছিল বড়মানুষের বৌ, তখন তহসিলদারের স্ত্রী তার সমকক্ষও ছিল না, বরং গঙ্গব্বারই মর্যাদা ছিল বেশী। তার ব্যবহারও ছিল সেই অনুযায়ী। তা হলে সে তহসিলদার আর নেই। অবস্থা পরিবর্তনের পর আবার যখন মাঝে মাঝে ধারবাড়ে এসেছে তখন আর দেখা করতে ইচ্ছাও হয়নি কারণ তখন তার দুর্দিনের পালা চলেছে। কিট্টী ম্যাট্রিক পাশ করার পর নিজের মান অপমানের চিন্তা দূরে ঠেলে, দশ বছর পরে আবার সে পুরানো সম্বন্ধের দাবী নিয়ে তহসিলদারের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনিও পুরানো সম্পর্ক মনে রেখে খুশীমনেই তার কাজ করে দিয়েছিলেন। গঙ্গব্বার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। সেই সময় তহসিলদারের বারো বছরের মেয়ে নীলব্বার জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছিল। এই মেয়ের জন্মের সময় গঙ্গব্বার স্বামীই নিজের পয়সা খরচ করে বহু ছুটোছুটির পর

সিভিল সার্জেনকে বাড়িতে এনেছিলেন সেই কথা স্মরণ করে আজ এতদিন পরেও তহসিলদারের স্ত্রী গঙ্গব্বাকে জানিয়েছিলেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা। গঙ্গব্বারও তাই এই মেয়েটির প্রতি বিশেষ টান ছিল। তার বড় ইচ্ছা ছিল নীলব্বার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেই তার জন্য মনের মত উপহার তৈরী করবে। কিট্টীকে সে বলেও রেখেছিল যে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে জানতে পারলেই সে যেন জানায়। দু একবার নিজে থেকে জিজ্ঞাসাও করেছিল কিন্তু কিট্টীর কাছ থেকে ভাসা ভাসা জবাব পায় যে সঠিক কিছু জানা নেই। তারপর কিট্টী ভরসা দিয়ে একথাও বলে যে রোজ রোজ জিজ্ঞাসা করতে হবে না, খবর পেলে সে নিজে থেকেই জানাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বদলীর খবরটা পর্যন্ত সে চেপে গেছে। আর কিছু না হোক, এই অজুহাতে অন্তত গঙ্গব্বা ভাল ঘি-এ ভেজে আনারসা তৈরী করে পাঠাতে পারত। অবশ্য এটাও ঠিক যে সে নিজেও সেদিনের পর আর তহসিলদারের বাড়ি যায়নি। কিন্তু বদলীর খবর পেয়ে যদি কিছু মিঠাই তৈরী করে নিয়ে সে দেখা করতে যেত তাহলে সব দিক দিয়েই ভাল হত। কিন্তু বদলীর খবরটা অন্তত তাকে দেওয়া কি ছেলের উচিত ছিল না ? এই বিশ্বাসঘাতকতায় গঙ্গব্বার মন একেবারে জ্বলে উঠল কিন্তু তার মুখে আর কথা ফুটল না।

এদিকে ঝগড়া করে মায়ের মুখ বন্ধ করতে পেরে কিট্টীর মন ভরে উঠল প্রসন্নতায়।

গঙ্গব্বা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে দেখছে সেইভাবেই সবকিছু খুলে বলল দেসাঈজীকে আর সেই সঙ্গেই রাঘপ্পার সম্বন্ধে তার দুটো প্রধান আশঙ্কার কথাও জানাল. যদি সে কিট্টীকে কোনরকম খারাপ অভ্যাস ধরিয়ে দেয় ? কিম্বা কোনরকমে কিট্টীকে হাত করে ফেলে যদি নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে তার পরিণাম কি দাঁড়াবে ?

কথাবার্তা যখন এই পর্যন্ত এগিয়েছে সেই সময় বেণুবাঈ বাড়ির ঝিকে কিছু বলবার জন্য খিড়কির দিকে গেলেন, সেই অবসরে গঙ্গব্বা দেসাঈজীকে বলে ফেলল, "গোপন্না, একটা কথা বলব, কিন্তু আর কেউ যেন না জানে, এ শুধু তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে। রাঘপ্পা নাম করলেও আমার সারা শরীর জ্বলতে থাকে। কিন্তু তার মেয়ের বিয়েটাও হওয়া দরকার। ভগবানের কৃপায় তার বিয়েটা হয়ে যাক, শুধু আমার ঘরে না এলেই হল এইটুকুই আমার ইচ্ছা। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, 'কেন ?' যে কথা এতদিন লুকিয়ে রেখেছি আজ সে কথা বলব কারণ বিয়ের ঢোল এখন আমার বাড়িতেই বাজবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের রাঘুর বিয়ের সব কথা তোমরা জান না। বিয়ের আগে থেকেই ওদের দুজনের জানাশোনা ছিল। কিন্তু বিয়ের কথা যখন ওঠে তখন সে আপত্তি করতে শুরু করল। এদিকে মেয়ের মা এসে আমাদের বাড়ির লোকের পায়ে ধরে বলে, 'আমার মেয়ের ইজ্জত বাঁচান।' সেই কথা শুনেই ইনি গিয়ে রাঘুকে চেপে ধরে বললেন, 'চুপচাপ বিয়ে করে ফেল নাইলে হাণ্টারের বাড়িতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, গাধায় চড়িয়ে ঘোরাব।' সেই ধমক খেয়ে তবে এই মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হল। এই মানুষের

মেয়েকে আমার ঘরে আনতে আমি চাই না ভাইয়া।" দেসাঈজী এবার বললেন, "গঙ্গুবা, একথা এতদিন যেমন চেপে রেখেছিলে এখনও তাই রাখ। আর কেউ যেন একথা জানতে না পারে।" দেসাঈজীর মনে হচ্ছিল দূরে দূরে থাকতে চাইলে কি হবে, তিনি ক্রমশই যেন কাদার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাবছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব এদের সংসারের ব্যাপার স্যাপার থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলা দরকার।

ইতিমধ্যে বেণুবাঈ ফিরে আসায় ঐ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করতে হল। দু চারটে এদিক ওদিক কথাবার্তা বলে গঙ্গুবা ফিরে এল নিজের বাড়িতে।

৪. জলসাঘর

ইস্ত্রি না করা কোট পরেই কিট্টীকে জলসায় হাজির হতে হল। সে স্থির করেছিল তহসিলদার সাহেবের সামনে যথেষ্ট বিনয়াবনত ব্যবহার করে ইস্ত্রিহীন কোটের দোষ কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গানের আসর ব্যাপারটা কেমন হয় সে সম্বন্ধে কিট্টীর কোন ধারণাই ছিল না। সে ভেবেছিল একটা ঘরে রাঘপ্পা মামা আর সে সাহেবের কাছাকাছি বসবে। রাঘপ্পা তার গুণগান করবে আর সাহেব মৃদু হাসির সঙ্গে অনুমোদনসূচক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তার কথা শুনবেন। সে নিজে বিনয়ে মাথাটি নত করে ওঁদের কথা শুনবে। সঙ্গীতসভায় অবশ্য একজন গায়কও থাকার কথা কিন্তু কিট্টীর কল্পনায় তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। সাতটার সময় মামার বাড়ি পৌঁছে গোড়াতেই কিট্টীকে হতাশ হতে হ'ল। তাকে অভ্যর্থনা করতে মামা বাড়িতে উপস্থিত ছিল না। তহসিলদার সাহেবও এসে পৌঁছন নি। কেউ তাকে বাড়ির ভিতরে যেতে আহ্বান জানাল না। নিরুপায় হয়ে চটি জোড়া বাইরে খুলে রেখে সে অন্দরে প্রবেশ করল। সমস্ত উঠান জুড়ে লাল রঙের জাজিম পাতা, এক কোণায় জাজিমের বাইরে একটি পেট্রোম্যাক্স রাখা হয়েছে, তার চারপাশে পোকার মেলা। রেশমী পাগড়ী আর গরমকোট পরা ছসাতজন ভদ্রলোক জাজিমের পাশে রাখা চেয়ারে বসে গল্পগুজবে মগ্ন। গ্যাসের আলোর উত্তাপে কারো কারো ঘাম দেখা দিয়েছে। জাজিমের অন্যদিকে সাত থেকে বারো বয়সের কিছু বাচ্চা গোল হয়ে বসে তাদের স্কুল, শিক্ষক, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিচু গলায় আলোচনা করছে। কিট্টীকে প্রবেশ করতে দেখে সেই আত্মমগ্ন ধনী মানী ব্যক্তিরা একবার মাত্র চোখ তুলেই আবার নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন হয়ে গেলেন। ছোটরা তো ওর দিকে তাকালই না। ছুটে এসে দু বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানাবার কথা যে মামার, তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে রইলেন। অবশেষে কিট্টীর মনে হল বয়স্ক

ব্যক্তিরা সবাই তার থেকে বয়সেও বড় এবং পোষাক পরিচ্ছদও তার চেয়ে ভাল পরেছেন কাজেই ঐ স্কুলের বাচ্চাদের কাছে গিয়ে বসাই তার পক্ষে ঠিক হবে। বাচ্চাদের দলের মধ্যে গিয়ে সে একজনকে ধাক্কা দিয়ে, আরেকজনের বুকে গুঁতো মেরে, তৃতীয়-জনের হাত মাড়িয়ে, চতুর্থজনের প্রায় কোলের উপর গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল। যে বেচারার হাত মাড়িয়ে দিয়েছিল সে মাত্র সাত বছরের বালক. সে উঠল চিৎকার করে। ওদিকের চেয়ারে বসা দেবতারা তাই শুনে কিট্টীর দিকে একবার করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে আবার গল্পে মত্ত হয়ে গেলেন। কিট্টীর তখন মনে হচ্ছিল ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে যদি তাকে টেনে নেন তাহলে সে বেঁচে যায়। ছোটদের দলে সেই সবচেয়ে লম্বা। বর্ষায় ভেজা বেড়ালের মত নিজেকে কোনরকমে গুটিয়ে ছোট্ট করে বাচ্চাদের দলের মধ্যে মিশে যাবার চেষ্টা করতে করতে সে বসে পড়ল। উৎপীড়িত ছেলেদের আলোচনা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে সে নিজের একটু বসার জায়গা করে নিল. তারপর উঠানের চারপাশে নজর ঘুরিয়ে দেখতে শুরু করল। দেওয়ালের ছবি আর ছাদ থেকে ঝোলানো শামাদানগুলি দেখল মন দিয়ে. এক কোণে রাখা তবলা আর তানপুরাও লক্ষ্য করল খুব কৌতূহলের সঙ্গে। মনে মনে ভাবল. 'ও বাবা. তানপুরা এত বড় হয় ?'

উঠানের দুদিকে দুটি ঘর, দুটিতেই আলোর বেশী জোর নেই. কাজেই উঠানের পেট্রোম্যাক্সের চোখ ধাঁধানো আলোর জন্য প্রথমটা ঘরের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মিনিট দশেক উঠানের এপাশ ওপাশ দেখার পর ক্লান্ত হয়ে কিট্টী যখন আবার ঘরের দিকে নজর ফেরাল তখন চোখে পড়ল এক বিচিত্র দৃশ্য। ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে এক সুন্দরী। দেওয়ালের ছায়া পড়লেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখ। পুরাণের গল্পে কিট্টী উর্বশী, রম্ভা, চিত্রাঙ্গদা এদের নাম শুনেছে মাত্র. আজ এই মেয়েটিকে দেখে সে যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মেয়েটি সত্যিই অপরূপা সুন্দরী। এ কোন অপ্সরা তো নয়! এত সৌন্দর্য যেন কিট্টীর কল্পনারও অগোচর। সে আবার মন দিয়ে দেখল তার দিকে। মেয়েটিও দেখছিল ওর দিকে। তার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাবার সাহস ছিল না কিট্টীর, সে লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। কিন্তু সেই স্বর্গীয় মুখ আবার একবার দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল মনে, বারে বারেই ও চোখ তুলে তাকাতে লাগল আর বারে বারেই নত করতে থাকল মাথা। এত সৌন্দর্য আজ পর্যন্ত কিট্টী কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি, এমনভাবে কারো সৌন্দর্য তাকে কখনও আকর্ষিত করেনি। ওর দৃষ্টি যেন আর বশে থাকছিল না। যে সাহস কিট্টীর কোনদিন ছিল না আজ যেন সেই সাহস জন্ম নিল ওর মনে। সেও তাকিয়ে দেখছিল ওরই দিকে।

হুকল্লীর মহবুবজান ছিল প্রসিদ্ধ গায়িকা এবং রূপসী। তার নিজের ধরনে শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল যথেষ্ট। রাঘপ্পা কি কখনও সাদাসিধে কাউকে নির্বাচন করতে পারে ? গত দশ বারো বছর ধরেই সে রয়েছে রাঘপ্পার আশ্রয়ে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার নামডাক প্রচুর। শেষশায়ী নাটক কোম্পানী এককালে শুধু তার নামের জোরেই অজস্র পয়সা

কামিয়েছে। সে ঐ কোম্পানী ছাড়বার পর বহু নতুন নতুন দৃশ্যপট আর নতুন নটনটী আমদানী করেও কোম্পানীর রোজগার আর তেমন হয় না। পুনায় গন্ধর্ব নাট্য কোম্পানীর কল্যাণে একদল নতুন রসিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়, তাঁরা মহবুবজানের গানের বড় রসগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু গত চার পাঁচ বছর থেকে মহবুবজান নাটকে অংশগ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছে। কয়েকটা কোম্পানী তাকে মাসিক তিনশ টাকা পর্যন্ত বেতন দিয়েছে। কিন্তু একবার এক উৎসবে নাটক করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহবুবজান অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই সময় তার 'যজমান' দিব্যি দিয়ে তার নাটক করা বন্ধ করে দেয়। সেই থেকেই মহবুবজান রাঘপ্পার উপর নির্ভর করে তার হুকুম মেনে চলছে এবং দিন কাটাচ্ছে তারই আশ্রয়ে। এখন তার কিছু বয়স হয়ে গেছে, হেঁচাকির ব্যাধি ধরায় গান গাওয়াও কমাতে হয়েছে। আজ যজমানের বাড়িতে গানের আসর, তাই সকাল থেকেই এলাচ, যষ্টিমধু ইত্যাদি খেয়ে গলা সেধে গান গাইতে এসেছে।

এদিকে একঘন্টা হতে চলল তহসিলদারকে ডাকতে গিয়েছে বাড়ির কর্তা এখনও ফেরেনি, কাজেই তার বেশ বিরক্ত লাগছিল। যাঁরা গান শুনতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কারো কারো মহবুবজানের সঙ্গে একটু বাক্যালাপের সখ হচ্ছিল কিন্তু রাঘপ্পা অনুপস্থিত কাজেই তাঁরা সেদিকে আর বিশেষ ঔৎসুক্য না দেখিয়ে নিজেদের মধ্যেই গল্প করছিলেন। এদিকে মহবুবজানের সঙ্গে কথা বলবার লোক ছিল না। রাঘপ্পা ওকে বলেছিল সেদিন সন্ধ্যায় বড় অফিসার আসবেন গানের জলসায় তাই মহবুবজানও দামী রেশমী শাড়ি পরে এসেছিল। মুখে মেক আপ ছিল প্রচুর, কণ্ঠে সোনার হারের সঙ্গে ছিল ফুলের মালা। যৌবনকালে একদা যেমনভাবে সেজেগুজে উঁচু মহলে যাতায়াত করত আজও সেইভাবেই সেজেছিল সে। কিন্তু অভ্যাস ছেড়ে গেছে বহুকাল তাই ক্রমেই ঘেমে উঠছিল। এই রকম বিরক্তিকর সময়ে কিট্টীর প্রবেশ। তার ধরনধারণ দেখে মহবুব-জানের বিরক্তির মাত্রা কিছুটা কমে এল। প্রবেশের পর কিট্টীর দ্বিধা ও হতভম্বভাব, বসার স্থান খোঁজা, বাচ্চাদের মাঝে বসতে গিয়ে হুলুস্থুল বাধানো তারপর গুটিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে বসা, মুখব্যাদান করে তানপুরার পানে চেয়ে থাকা ইত্যাদি দেখে অভিনয় পটিয়সী মহবুবজানের মনে হচ্ছিল এ যেন ঠিক নাটকের বিদূষক। এই কারণেই সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল কিট্টীর দিকে।

এতক্ষণে রাঘপ্পা তহসিলদার এবং তাঁর আর একটি বন্ধুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হল। তহসিলদারকে দেখামাত্র তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসা ভদ্রলোকেরা খাড়া হয়ে উঠে বসে স্বাগত জানালেন। তহসিলদার নিজের বন্ধুকে বড় তাকিয়াটি এগিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়লেন, রাঘপ্পাও বসল তাঁর পাশে এবং সমাগত ভদ্রবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাতে আরম্ভ করল। যাঁরা পূর্বপরিচিত তাঁদের সঙ্গে তহসিলদার দু একটা হাসি মস্করাও করলেন। এদিকে যখন এই সব ব্যাপার চলেছে ততক্ষণে বাচ্চাদের দলে বসা কিট্টীও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসেছে। বেচারা কাতর দৃষ্টিতে

চেয়ে আছে মামার দিকে, কতক্ষণে মামার নজর এদিকে ঘুরবে সেই প্রতীক্ষায়। কিন্তু হায় রে, তহসিলদার অথবা তাঁর কাছে যাবার প্রধান অবলম্বন মামা দুজনের কেউই এই কাদায় গুঁজে থাকা কমলটিকে দেখতে পেলেন না।

রাঘপ্পা এবার গলা উঁচু করে ঘরের মধ্যে আসীন সুরসুন্দরীকে ডেকে বলল, "মহবুব' তহসিলদার সাহেব তোমার গান শুনতে এসেছেন। উনি অনেকদিন থেকে তোমার গান শোনার কথা বলছেন, আজ ওঁকে তোমার সবচেয়ে ভাল গান শোনাও।"

মহবুবজান আলোর দিকে একটু সরে এসে বড় তাকিয়ায় হেলান দেওয়া তহসিলদারের বন্ধু ভদ্রলোকটিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিবাদন জানাল। তাই দেখে তহসিলদার ও নয়, আমি এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে ভারিক্কি চালে প্রশ্ন করলেন, "গন্ধর্ব রাগ জানা আছে ?"

মহবুবজান উত্তর দিল, "জী হাঁ" (আসরে সে হিন্দুস্থানীই বলে থাকে)। সে আর বিলম্ব না করে বাইরে এসে তার জন্য আলাদা করে বিছানো সতরঞ্চিটির ওপর বসল এবং মাথার ঘোমটা ঠিকঠাক করতে লাগল। বাইরে আলোতে আসার পর কিট্টী দেখল তার রূপে একটু ভাঁটা পড়েছে। মুখের বয়সের রেখাগুলি চড়া রঙের প্রলেপেও সম্পূর্ণ চাপা পড়েনি. এখন গ্যাসের আলোয় সেগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনুভূতি যাদের তীক্ষ্ণ তাদের কাছে মহবুবজান হয়ত এখনও সুন্দর কিন্তু কিট্টী এখন সৌন্দর্যলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছে ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না—তাই কিট্টীর কাছে মহবুবজানের এখনকার রূপ বড় ভয়ানক বোধ হল। একটু মোটা হলেও তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বেশ সুপুষ্ট। মুখখানি কাছে থেকে দেখার পর কিট্টী বড়ই নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট পূর্বে ঘরের মধ্যেকার আধো অন্ধকারে যে মায়াবী রূপ সে দেখেছে তারই ফলে কৈশোর তাকে ছেড়ে গেল চিরকালের মত। পরমুহূর্তের নৈরাশ্যও আর সে কৈশোর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারল না।

বৈঠকের বাইরে বারান্দার বেঞ্চিতে বসেছিল এক বৃদ্ধ, সে এবার এসে তানপুরা আর তবলায় সুর বাঁধতে বসল। তবলায় হাতুড়ির ঠুকঠাক আওয়াজের মধ্যেই দেশ-পাণ্ডে আবিষ্কার করল তামাকের কৌটায় তামাক ফুরিয়েছে। সে ঘোষণা করল, "রাঘপ্পা তামাক ফুরিয়ে গেছে।" 'আঃ' বলেই রাঘপ্পা ফিরল বাচ্চাদের দিকে তারপর দু আনা পয়সা বার করে হাতটা বাড়িয়ে হেঁকে বলল, "ওরে, তোদের মধ্যে যার গোঁফ গজিয়েছে এমন কেউ গিয়ে দু আনার তামাক নিয়ে আয়।"

এদিকে তানপুরার টুংটাং আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে তাই ছেলেরা বাইরে যাওয়ার নামে এ ওর মুখ তাকাতে শুরু করেছে, একজন কিট্টীর দিকে ঈশারা করে বলে উঠল, "ওই তো ওর গোঁফ গজিয়ে গেছে।" কিট্টী ব্যস্তসমস্ত হয়ে তড়াক করে উঠে মামার হাত থেকে দু আনিটি নিতে এগিয়ে এল। এতক্ষণে রাঘপ্পা দেখল ওকে। "আরে, তুমি এসেছো ? তা ওখানে বসেছো কেন ?" বলতে বলতে নিজে কিছুটা সরে গিয়ে

তাকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করল। ওদিকে মহবুবজানের মুখে দেখা গেল মৃদু হাসির আভাস। সে তামাক আনার জন্য উঠেছিল এটা তহসিলদারও লক্ষ্য করেছেন কিনা সেটা যাচাই করবার জন্যও তহসিলদারের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হল না কিট্টীর। যা হোক এতক্ষণে ওর যেটুকু প্রমোশন হয়েছে তাতেই খুশী হয়ে ও সেইখানে বসে পড়ল। সাহেব তার দিকে ফিরেছেন দেখে সে নমস্কার করল। রাঘপ্পা পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু এইটুকুই বলল, "এটি আমাদের ছেলে, আপনার কাছারিতেই কাজ করে।" সাহেবও মাথা নাড়লেন। নিজের অধস্তন কর্মচারীকে এত কাছাকাছি বসতে দেখে তাঁর একটু অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। সাহেবের সামনে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসাটা উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে কিট্টীও চিন্তায় পড়েছিল। এর মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল গান। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনে তারপর সাহেব নিজের বন্ধুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। কিট্টী আবার ধাঁধায় পড়ে গেল, এদের আলাপ শুনবে না গানের দিকে মন দেবে। মামা তো গানের মধ্যে ডুবে গেছে, কিট্টী এদিকে গানের কিছুই মানে বুঝছে না, কিন্তু পালাবার উপায় নেই চুপচাপ বসে থাকতেই হবে। তাকিয়ায় হেলান দিতে না পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কোমর ব্যথা করতে লাগল, তার সঙ্গে আবার কানের উপর এই অত্যাচার। সেই সুরসুন্দরী স্বর্গের দরজার মত এক বিরাট মুখব্যাদান করে বিবিধ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সহযোগে এক শাস্ত্রীয় রাগের আলাপ শুরু করেছেন। শাস্ত্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে বেশ্যা স্ত্রীলোকের কি বিচিত্র যোগাযোগ কথাটা ভেবে কিট্টীর হঠাৎ খুব হাসি পেয়ে গেল। এরপর সে গাইল মারাঠী পদ ও কানাড়া পদ "কৃষ্ণ নী বেগনে বারো।" অর্থাৎ "কৃষ্ণ তুমি শীঘ্র এস।" তাও কিট্টীর বিশেষ ভাল লাগল না, কিন্তু তহসিলদার থেকে আরম্ভ করে বাচ্চারা পর্যন্ত সকলেই মাথা নাড়ছে দেখে নিজেও মাথা দোলাতে শুরু করল এবং কারো কানে না যায় এমন মৃদু স্বরে দুচারবার বাহবাও দিল। এই আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানে মামা তার সঙ্গে কথা বলেছে মাত্র একবার আর তহসিলদার মাত্র বার দুই তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন ; একবার তামাক আনার সময় আর দ্বিতীয়বার যখন সে তাঁর কাছাকাছি একটি তাকিয়া দখল করে তখন। তার এখানে আসা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এটা কিট্টী খুব ভাল করেই বুঝল। রাঘপ্পার অনুরোধে অভিনয় সহযোগে 'না মারো পিচকারী' এই ঠুংরীখানি গেয়ে সেদিনকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হল। মহবুব-জানের অভিনয় বা মার্জিত ব্যবহার কোনটাই কিট্টীর মন ভরাতে পারল না, তার মনে হল শুধু এই অভিজ্ঞতাটুকুই আজকের যা কিছু লাভ।

সভার শেষে তহসিলদার মহবুবজানের সঙ্গে দুচারটি কথা বলে, সমাগত ভদ্রলোকদের নমস্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন দেখে কিট্টী নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করল, "টাঙ্গা ডেকে আনব সাহেব?" সাহেব বললেন, "রাঘপ্পা ছেলেদের কারোকে পাঠিয়েছেন।" সাহেবের মুখ থেকে গালিগালাজ ছাড়া অন্য কথাও বের হয় দেখে কিট্টী কিছুটা সাহস পেয়ে দুচারটি এদিক ওদিক কথার পর সেই পুরানো মামলাটার

কথা তুলল। ইতিমধ্যে টাঙ্গা এসে গেছে। কিন্তু তহসিলদারের তখন কিট্টীর সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছা হয়েছে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গম্ভীরভাবে কিট্টীকে বললেন "দেখো কুলকর্ণী, রেভেন্যু বিভাগে টিকে থাকতে হলে একটা কথা ভাল করে জেনে রাখো, তুমি যে জায়গায় আছ সেই পদের লোককে আইনের সমস্ত কায়দাকানুন এবং আপিসের কাজের প্রতিটি বিধি নিয়ম একেবারে নখদর্পণে রাখতে হবে। অন্য কারো কথায় চলবার দরকারই নেই, তোমার নিজের নিয়মকানুন ঠিক থাকলেই হল, তাহলেই তুমি সামলে চলতে পারবে। পরশুদিন নোটটা কে তোমাকে লিখিয়ে দিয়েছিল তা কি আমি জানি না ভেবেছ?"

কিট্টী বলল, "না সাহেব, ওর কেস্ একদম ক্লিয়ার শুধু এইটুকুই বলেছিল।"

"যাই হোক তার উপর এতটা নির্ভর করা তোমার উচিত হয়নি। জরুরী আইন-কানুন সম্পর্কে কাছারিতে যে ফাইলটা আছে সেটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একবার নয়, অন্তত চারবার পড়ো তাহলে নিজের কাজ তুমি ঠিকমত বুঝতে পারবে। রেভেন্যু বিভাগে কাজ করতে হলে কারো উপর ভরসা রাখা চলবে না। এখন তুমি জুনিয়র তাই আশেপাশের লোক তোমাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু কোন চালাক ছেলে যদি তোমার অধীনে কাজ করতে আসে তাহলে দশ বা পনেরো দিনের মধ্যেই কোন মামলায় তোমায় বেকায়দায় ফেলে নিজে সুযোগ ছিনিয়ে নেবে। তুমি ভালমানুষ, এই বিভাগের হালচাল এখনও কিছুই জান না। কাল বিকেলে নিয়মকানুনের ঐ ফাইলটা বাড়ি নিয়ে যেও, পরশু সকালে আবার ফেরত এনো। কেউ যদি দিতে আপত্তি করে তবে আমার কাছে এসো, আমি দিয়ে দেব। অন্যের উপর নির্ভর করে কতদিন চালাতে পারবে? নিজের হাত পোড়বার আগে কথাটা ভাল করে বুঝে নাও।" এরপর সাহেব গিয়ে উঠলেন টাঙ্গায়, পৌঁছে দেবার জন্য রাঘপ্পাও টাঙ্গায় উঠে বসল। কিট্টীর মন ভরে উঠল কৃতজ্ঞতায়। টাঙ্গা চলে যাবার পর কিট্টী যখন বাড়ি যাবার কথা ভাবছে সেই সময় আঙ্গুল মাড়িয়ে দেওয়ায় যে কেঁদে উঠেছিল সেই বাচ্চাটি এসে কিট্টীর জামা ধরে টানল, "মামী তোমাকে ডাকছে।"

কিট্টী প্রশ্ন করল, "কে মামী?"

"আমার মামী।"

"তুমি কে?"

"আমি ভীমসেন।"

এ রকম আলাপে কোন ফল হবে না দেখে কিট্টী চুপচাপ ভীমসেনের করকবলিত বকাসুরের মত বাচ্চাটির পিছু পিছু চলল। ছেলেটা ওকে ভিতরে এনে একটা ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "ওখানে শুয়ে আছে" আর তারপরই ছুটে পালাল। রাঘপ্পার স্ত্রীকে পাড়াশুদ্ধ ছেলেই-মামী বলে। কিট্টীর মনে দেখা দিল ভয় আর সঙ্কোচ।

ওর মনে পড়ল রাঘপ্পা একবার বলেছিল তার স্ত্রী বহুদিন ধরে রক্তক্ষয় রোগে ভুগছে, বছরে তিন চার মাস সে বিছানায় পড়ে থাকে। সে কথা মনে পড়ায় ওর একটু ভরসা হল, ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছতেই পরিষ্কার কানে এল কিছু কথাবার্তা—"মহবুব বোন, তুমি আমার ছোট বোন, আমি তোমার চেয়ে বড়। এ কথা কোনদিন ভুলে যেও না। তুমি আমার কাছে ঈশ্বরের মত।"

কিট্টী চিন্তিত ভাবে এল দরজার সামনে। রাত দশটা বেজে গেছে। তার ছায়া দেখতে পেয়েই মহবুব চট করে সরে গেল এক পাশে। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে দেখা গেল একটি ক্লান্ত চেহারার দুর্বল মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে। মাথায় তার ক্ষীণ অথচ দীর্ঘ কুমকুমের রেখা। গায়ের রং তার লেবুর মত হলদে। এখন তাকে আসল বয়সের চেয়েও বেশী বৃদ্ধা দেখালেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এককালে সে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টের শিকার হওয়ার ফলে তার গাল ভেঙে ঝুলে পড়েছে চিবুকের দিকে কিন্তু তবু তার মুখে লাবণ্যের ছাপ আছে। সে ধীরে ধীরে এদিকে ফিরল কিন্তু তাকে ভাল করে দেখার বা আশ্চর্য হবার কোন ভাব ফুটল না তার মুখে, শুধু সহজভাবে বলল, "এসো কিট্টণা এসো।" মহবুবজানকে বলল, "মহবুব বোন, এদিকে চাটাইটা বিছিয়ে দাও তো।"

কিট্টী মাদুরে বসলে পর মহবুবজান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা বোন, আমি তবে আজ যাই। সাড়ে দশটা পর্যন্ত গাড়ি পাওয়া যায়।" রাঘপ্পার বাড়িতে যাতে রাত কাটাতে না হয় মহবুবজান সর্বদা সেই চেষ্টাই করত। যদি নিতান্তই কোনদিন উপায় না থাকত তাহলে রাঘপ্পার কাছ থেকে কথা আদায় করে তবেই সে এ বাড়িতে শুতো।

চম্পক্কা বলে উঠল, "বোন একটু দুধ খেয়ে যাও।" মহবুবজান আবার বসে পড়ল। চম্পক্কার শরীরে শক্তি নেই বলেই তার অনুরোধ এড়ানো যায় না। শক্তির অভাবে সে বেশী জোর করে আগ্রহ দেখিয়ে কথা বলতে পারে না, কিন্তু সেই জন্যই লোকে তার কথা ঠেলতে পারে না, তার ইচ্ছাকেই আদেশ মনে করে পালন করে। রত্না যাচ্ছিল দরজার সামনে দিয়ে, তাকে ডাক দিয়ে চম্পক্কা বলে উঠল, "রত্না উঠান থেকে গ্যাসবাতিটা নিয়ে আয়।" গ্যাসবাতি এল, দরজার কাছে সেটি রেখে রত্না বাইরে থেকেই সরে গেল।

"তুমি যখন এতটুকুটি ছিলে তখন তোমায় দেখেছি। তারপর তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্য আজ দশ বছর হয়ে গেল তাই আর দেখাশোনা হয়নি। যাই হোক আজ তো তুমি বড় হয়েছ", চম্পক্কা এবার মহবুবজানকে কিট্টীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা জানাল। মহবুবও বেশ ঔৎসুক্য দেখিয়ে প্রশ্ন করে করে সব কথা জেনে নিতে লাগল। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে চম্পক্কা গঙ্গব্বা সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিচ্ছে, ছোটখাট প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করছে গঙ্গব্বা কি এখনও তাদের ওপর রেগে আছে? যদি আজও রাগ না পড়ে থাকে তো কতখানি রেগে আছে? কিট্টীর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তাকে কত স্নেহ করতেন। তার নিজের অসুখের কথাও বলল বড় করুণভাবে। এই

মহিলাদের কথা শুনতে শুনতে কিট্টীর মনটা ভিজে এল আর এই সময়ই সুযোগ বুঝে চম্পক্কা একটা কথা বলল খুব সহজ সুরে, "যা যন্ত্রণা ভোগ করছি তাতে আমার বাঁচা মরা দুইই সমান, তবু যে আজ বেঁচে আছি সে কেবল তোমার বাবারই পুণ্যের ফলে। তোমার মায়ের কাছে তো আমি মৃতই, সে তো আমার তর্পণও করে ফেলেছে।" এ কথা শুনে মহবুবজানও গলে গিয়ে বলে উঠল, "তোমার মত মানুষের ওপর কি করে কেউ রাগ দ্বেষ রাখতে পারে ?"

"মহবুব বোন সব জিনিসেরই সময় আছে। এই তো দেখ না, তুমি কে আর আমিই বা কে ? অথচ বোনের মত রয়েছি তো ! আর এদিকে দেখ রক্তের সম্বন্ধ যেখানে সেখানেও কিরকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই তো লোকে বলে, 'কালায় তস্মৈ নমঃ'। কিন্তু বোন ঝগড়ায় কি আর রক্তের সম্পর্ক ভাঙতে পারে ? শত শত বছর কেটে গেলেও রক্ত তো সেই রক্তই থাকবে !"

এই রকম সব উদার মহিলাদের মুখে মায়ের তর্পণ করে ফেলার খবর শুনেও কিট্টীর বিশেষ লজ্জা হল না। এই সময় রত্না এল দু কাপ গরম দুধ নিয়ে, এখন আর ঘরে প্রবেশ না করে উপায় ছিল না। দরজার কাছে সসঙ্কোচে দণ্ডায়মানা পনেরো বছরের তরুণী মেয়েটিকে কিট্টী দেখল। মায়ের রূপ যেন তার মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে ফুটে উঠেছে। সে যখন দুধ এনে সামনে রাখল তার আবরণহীন মাথা কিট্টীর দৃষ্টিকে আকর্ষিত করল তীব্রভাবে। তিন ঘণ্টা পূর্বে যে কিট্টী যুবক হয়েছে সে এবারে প্রেমিকে পরিণত হল।

9. গঙ্গব্বার অসাবধানতা

গতবার দেসাঈজীর বাড়ি এসে অসতর্কভাবে গঙ্গবা একটা ভুল করে বসেছিল। রাগের মাথায় টাকা পয়সা সম্বন্ধে সে একটা কথা বলে যা বসন্তর কানে পৌঁছেছিল। সিনেমা দেখার পয়সা না পেয়ে বসন্তরাও সেদিন সারা সন্ধ্যা চটে ছিল। সে এতবার সিনেমা দেখেছে, ঐ সিনেমা হলের সে একজন স্থায়ী গ্রাহক, তবু গেটকীপার তাকে বিনা টিকিটে সেদিন ঢুকতে দেয় নি। বসন্ত অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল কিন্তু সে কথা শোনেনি। মাত্র তিন আনা পয়সার জন্য এত দুঃখ তাকে কখনও পেতে হয়নি।

সেদিন সিনেমা হল থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে পর্যন্ত সে গঙ্গব্বার কথার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় লেগে যায়। বসন্ত ঋতুর মতই বসন্তরাও-এরও ধরনধারণ ছিল বেশ বিচিত্র। পরের দিন দুপুরে মায়ের আহার শেষ হতেই বসন্তরাও লুকিয়ে ফেলল তাঁর পানের বাটাটি। এদিকে খাওয়ার ঠিক পরেই দুটি পান আর একমুঠো সুপারি মুখে না দিতে পারলে বেণুবাঈ-এর অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে। ছটফট করতে করতে

তিনি সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজতে শুরু করলেন। দেসাঈজীর তখন নিদ্রার সময় কাজেই বেশী চেঁচামেচিও করা সম্ভব নয়।

এমনি সময় বসন্তরাও ওপর থেকে নেমে এসে প্রশ্ন করল, "মা কাল গঙ্গুবা কি যেন বলছিল ?"

"বলবে আর কি বেচারী, ছেলে ছেলে করেই সারা হল।"

"না মা, কিছু টাকা পয়সার কথা হচ্ছিল মনে হল ?"

"টাকা পয়সার কথা আবার কখন হল রে ?"

"যাই হোক, কিন্তু ওর জন্যই আমায় বকুনি খেতে হল। বাড়ির ছেলের সিনেমা দেখার তিন আনা পয়সা জোটে না অথচ এই মহিলার দরকার পড়লেই তিনি দশ পনেরো টাকা পেয়ে যান। বাড়িতে কি হয় না হয় আমি কিছু টের পাই না বুঝি ? পাড়ার লোকে দিব্যি মৌজ করছে আর বাড়ির লোকের কপালেই ঠেঙ্গার বাড়ি ? আমি কিছু বলি না তাই !"

"তোমাকে দিতে তো কেউ বারণ করে নি বসন্তন্না। উনি তো বলেন তোমার ভালর জন্যই। হপ্তায় একবার সিনেমা দেখো বাবা, রোজ দেখলে কি চলে ? তোমার লেখাপড়ার কি হবে তাহলে ?..."

"সিনেমা না দেখলে আমার মাথা ধরে ওঠে, আর মাথা ধরলে পড়ব কি করে ? তারপর যদি ফেল করি তখন তো বলবে, "দেখ্ ওদের কিট্টীকে।" তখন সারাদিন কিট্টী কিট্টী করে আমার কান ঝালাপালা করে দেবে। ওদের দেখলে আমার গা জ্বলে যায়...। যাক্ গে, যেতে দাও, পয়সা চাই না আমার। কিন্তু বাড়ির টাকা কোথায় যায় সেটা তো আমার জানা দরকার। আমি কি কচি ছেলে ? আমি কি এ বাড়িতে জন্মাইনি ? এইভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে অচ্যুতন্নাকে আমি চিঠিতে সব কথা জানিয়ে দেব।"

"অচ্যুৎ তোর মত বোকা নয়। যাক গে, আগে তো আমায় পানটা খেতে দে", প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললেন বেণুবাঈ।

"পান সুপারি খাবে কোথা থেকে, পানবাটা তো আমি লুকিয়ে রেখেছি, আগে বল তবে দেব।" ছেলের ছল কৌশল দেখে বেণুবাঈ-এর দয়া হল। তিনি পান সুপারিও ছাড়তে পারেন কিন্তু ছেলের এই হাবভাব, কথা, বুদ্ধি বিচার সব কিছু তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছে। একটুক্ষণ চিন্তা করে ওঁর মনে হল যে কথা এতদিন গোপন রাখা হয়েছে তা প্রকাশ পেলে কোন ক্ষতি নেই, আর গোপন রেখে কোন লাভও নেই। তিনি আরও এই আশায় মুখ খুললেন যে কথাটা শুনে হয়ত বসন্ত গঙ্গুবার প্রতি আর একটু শ্রদ্ধাশীল হবে।

"বাবা বসন্ত, তুমি এখন বড় হয়েছ। পান সুপারির জন্য নয়, তোমার টাকার অহংকার যাতে দূর হয় সেইজন্যই বলছি, গঙ্গুবা অবশ্য কাউকে বলতে বারণ করেছিল,

কিন্তু আমাতে তোমাতে আর প্রভেদ কি, যাক, এখন তো দশ বছর কেটেও গেছে, বললে আর ক্ষতিই বা কি। তাছাড়া টাকা কড়ির ব্যাপারে বেশী অস্থির হতে নেই, ও তো আজ আছে কাল নেই। সবাইকার সঙ্গে বুঝে সুঝে চলো...”

“আগে তো কথাটাই বলো”, বসন্ত কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারে না।

“গঙ্গব্বা খুব বড় ঘরের বৌ, বাছা, ওর স্বামী মুক্তার ব্যবসা করত, তাছাড়া গুড়েরও কারবার করত। বেচারা কি বিপদে যে পড়েছিল সে আর কি বলব! সব কিছু নিলাম হয়ে গেল। যাকে যা দিয়েছিল, যা কিছু নিয়েছিল, যেখানে যা রেখেছিল সমস্ত চলে গেল। তারপর সেই দুঃখে ছ'মাসের মধ্যে নিজেও শেষ হয়ে গেল। গঙ্গব্বা খুব শক্ত মেয়ে। কারবার সম্পর্কিত ক্ষেত খামার হাট সবই তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, যখন বাড়ি ক্রোক করতে এল ওর স্বামী তো তখন ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু গঙ্গব্বা বাড়িতে যেটুকু সোনা দানা ছিল সব ঐ কিট্টীর হাতে দিয়ে বাড়ির পেছনে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়ে দেয়। কি করে যে ও নিয়ে গিয়েছিল আর অন্য কারো সেদিকে নজর পড়েনি সেটাই আশ্চর্য। যাই হোক সেইটুকু ওর বেঁচে গিয়েছিল। সবকিছু যখন হাতছাড়া হয়েছে, স্বামীও মারা গেছেন তখন একদিন রাতারাতি আমাদের কাছে সেই গয়না এনে বিক্রি করতে দেয়। তার দরুণ প্রায় সাত আটশো টাকা তোমার বাবার কাছে ও রাখতে দিয়েছিল। সুদে আসলে মিলিয়ে এখন সেটা প্রায় হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমরা ওকে আর কিছুই দিই না, দিই শুধু দুটো মিষ্টি কথা। তাইতেই বেচারী আমাদের প্রতি এত কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ হয়ে থাকে। এটা ওর কত বড় গুণ সেটা তো দেখো।”

“তা কিট্টীও কি প্রতি মাসে টাকা দেয় নাকি ?”

“গতবার যখন কাশী যাই গঙ্গব্বাও গিয়েছিল আমার সঙ্গে। সে সময় আমি সামান্যই খরচা করেছিলাম। এখনও তাই কিট্টীর হাতে দিয়ে কিছু টাকা প্রতিমাসেই দিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে কিছুটা সঞ্চয় হবে এই ওর বাসনা। গরীব দুঃখীরা এইভাবেই চালিয়ে থাকে। যার দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে না তার বেশী কথা বলা সাজে না।”

শেষের কথাটায় বসন্তের আঁতে ঘা লাগল। সে পান সুপারির কৌটো এনে রেখে দিল মায়ের সামনে।

মা বললেন, “দরকার নেই, তুই নিজে পান খা গে যা।”

মায়ের দেওয়া সুশিক্ষার দুগ্ধধারাকে বিষে পরিণত করতে বসন্তের সময় লাগল দুদিন।

ছেলের কথাবার্তা এবং তাঁর নিজের জবাব সবই বেণুবাঈ সেই রাতেই জানালেন স্বামীকে। সব শুনে নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে দেসাঈজী বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। যেভাবে চলছে এইভাবেই যদি চলতে থাকে তো এ ছেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কে জানে। বড় ছেলে অচ্যুতকে নিয়ে তাঁর কোন ভাবনা ছিল না, তাকে দেখলেও মন খুশীতে ভরে ওঠে। কিন্তু এখন তাঁর চিন্তা হল এই ভেবে যে বসন্তরাও-এর কুশিক্ষায় ছোট ছেলে পুরুষোত্তমও না বিগড়ে যায়।

অবশ্য দেসাঈজী নিজেও এককালে তাঁর বাবার সঙ্গে অনেক বিবাদ করেছেন কিন্তু তাঁর মধ্যে বসন্তের মত নীচতা ছিল না, তিনি কখনও সিনেমা দেখার তিন আনা পয়সার জন্য বাপের সঙ্গে ঝগড়া বাধান নি। এটা ঠিক যে সম্পত্তি আছে বলেই বড় ঘরের ছেলেপিলেরা বাল্যকাল থেকেই টাকাকড়ির ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। তারপর তারাই যখন আবার বড় হয় তখন নিজেদের সন্তানের মধ্যে বিষয়সম্পত্তির মোহ দেখলে. দুঃখ পায়। বিষয়সম্পত্তি থাকলেই তার সঙ্গে সঙ্গে এ অভিশাপও লেগে থাকবে।

দেসাঈজী এই পরিস্থিতিকে অন্যভাবে কাজে লাগাবেন স্থির করলেন। গঙ্গবাদের সংসারের এই বোঝা বহুদিন ধরে তাঁর ঘাড়ে চাপানো রয়েছে, ইচ্ছা থাকলেও এ বোঝা তিনি নামাবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না, এখন মনে হল ঘাড় থেকে এ ভার নামাবার একটা ভাল অজুহাত পাওয়া গেছে। পরের দিনই তিনি গঙ্গবাকে ডেকে পাঠালেন এবং সব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন।

"তুমি আমার কাছে যে টাকা রেখেছ তার তো কাগজপত্র কিছুই নেই। আমারও বয়স হয়েছে। আমাদের বাপদাদারা যে বিশ্বাসের জোরে সংসার চালাতেন আজ আর তা দেখা যায় না, আবার আমাদের মধ্যে যেটুকু বিশ্বস্ততা আছে আমাদের ছেলেদের মধ্যে সেটুকুও থাকবে না, এই দুনিয়ার নিয়ম। তোমার ছেলেও এখন ভাল চাকরী করছে। তাছাড়া ভবিষ্যতেও যে আমার অবস্থা এতটাই স্বচ্ছল থাকবে এ কথা জোর করে বলা যায় না। আমার ছেলেরাও বড় হয়ে উঠছে...যাক গে, এসব কথা ছেড়ে দাও। আসল কথা হচ্ছে পয়সা বড় নশ্বর বস্তু। তোমার কাছে ঋণী হয়ে আমি মরতে চাই না। আমার হাতে টাকা থাকতে থাকতে তোমার প্রাপ্য তোমাকে মিটিয়ে দিতে পারলে আমার বুকের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়।" এই দীর্ঘ বক্তৃতাটি দিয়ে দেসাঈজী এতদিনের হিসাব পড়ে শোনালেন।

কিন্তু গঙ্গবা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তার চোখের জলের সামনে দেসাঈজীর বক্তৃতা একেবারেই ব্যর্থ হল। অবশেষে দেসাঈ অনুনয় করে বললেন এই টাকাকড়ির ব্যাপারটা কিট্টীকে অন্তত জানানো হোক, কিন্তু গঙ্গবার তাতেও আপত্তি।

"সে তো আগে থেকেই খরচা বাড়িয়ে রেখেছে। কোন সঞ্চয় নেই জানে বলেই তবু ঐ দু চার পয়সা বাঁচাচ্ছে। গোপন্না, ঐ হাজার টাকা যদি নিয়ে যাই, চারদিনও টিঁকবে না, কোন লাভই হবে না। কথায় বলে বন্ধ মুঠি আর সুগন্ধ বন্ধ করে রাখাই ভাল। তার কানে এ সব কথা পৌঁছে দেবার কোন দরকার নেই।" এ কথার পর দেসাঈজীকে নিরুত্তর হতেই হল। অবশেষে বিদায় নেবার সময় গঙ্গবা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও, আমার কাছে কারো কোন টাকাকড়ি নেই। আমার এই কথাটা অন্তত রাখো তারপর যা হয় সে দেখা যাবে।" দেসাঈজী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেন।

পরের দিন বসন্তরাও তহসিলদারের কাছারির ক্যান্টিনে বসে চা আর পকোড়ার প্লেট শেষ করে বারে বারেই জানলা দিয়ে দেখছিল কিট্টী কখন আপিস থেকে বের হয়। তহসিলদার সাহেব আপিস থেকে বের হবার পরই কিট্টী এবং আরো জন চারেক ক্লার্ক কাঁধের ওপর কোট ফেলে গল্প করতে করতে ক্যান্টিনের দিকে এল। সবাইকার সঙ্গে বসে চা জলখাবার খেল কিট্টী কিন্তু পেছন দিকে বসা বসন্তরাওকে সে দেখতে পেল না। খাওয়াদাওয়ার পর কিট্টী যখন একলা বাড়ির পথ ধরল সেই সময় বসন্তরাও রাস্তার মাঝে এসে হাজির ওর সামনে।

"কি সাহেব, আজকাল যে পুরানো পরিচিতদের চিনতেই পার না?"

গত একমাসের মধ্যে বসন্তের সঙ্গে কিট্টীর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তার উদ্ধত স্বভাব কিট্টীর জানা ছিল কিন্তু সে নিজে বসন্তের সঙ্গে সর্বদাই ভালভাবে কথা বলত।

"আপনি তো দেসাঈ বাহাদুর, গরীবকে ভুলতে পারেন, আমরা গরীব মানুষ কি করে..."

"ফের বাজে কথা! চায়ের দোকানে পেছনে বসেছিলাম, তুমি তো কথাই বললে না। পেছন ফিরলে পাছে কথা বলতে হয় তাই সোজা সামনে মুখ করে বসে রইলে। ঠিক আছে, আমিও ভাবলাম এখানে আপিসের মধ্যে আর কেন টিকি ধরে টানি, বাইরে তো আসুক, এখন তো সাহেব বনে গেছে...। এবার কিন্তু সাহেবীয়ানা ছাড়। আমার বাবার তো তোমার প্রশংসা করে করে আর যেন তৃপ্তি হয় না। কিট্টী হোটেলে চা খায় না, খাবার খায় না, সিনেমা দেখে না, একেবারে যেন ভৃগুমুনি। এদিকে চোর-বেড়ালের মত লুকিয়ে তুমি সব কিছুই করে থাক।"

"ভাই বসন্ত, তোমার মত বাড়িতে বসে আরাম করে খেতে পেলে এ সবের কোন দরকারই হত না। পেটের জন্যই এই সব করতে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও কিছু কিছু অভ্যাস করতেই হয়।"

"আরে, তোমার অভাবটা কিসের? ভেতরে ভেতরে উইপোকার মত অনেক জমিয়েছ, তোমার মা প্রচুর সঞ্চয় করেছেন। এখন যেমন রোজগার করছ দুদিন বাদে তো সত্যিই একদম সাহেব বনে যাবে। এই পচা পুরানো কোটটা এবার ফেলে দাও। এই সুজাউদ্দৌলা মার্কা গোঁফটাও এবার সাফ করে ফেল। সাহেব হতে যাচ্ছ, এদিকে গাঁইয়াপনা এখনও গেল না।"

"ওটা আর যায় কি করে? ওটা তো গুরুজনদের কাছেই পাওয়া," কিট্টী কথাটা সহজ করে নেবার চেষ্টা করল।

"আরে ও কথা বোল না। তোমার বাবা অল্পেতে ডোববার লোক ছিল না, কিন্তু তুমি তো তাকেও মাত করে দিয়েছ। আট বছর বয়সেই তুমি সোনাদানা চুরি করেছ।"

"এই, কি বলছ কি?"

"যা বলার ছিল তাই বলে দিলাম।"

বসন্তের সঙ্গ ছাড়বার পরই কিট্টীর প্রবল ইচ্ছা হতে লাগল মাকে গিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতে আসতে সে আবার মত পরিবর্তন করে ফেলল। সুযোগ বুঝে মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এই স্থির করে তখনকার মত একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। কিন্তু সেদিনের অনুভূতি কিট্টীর জীবনে এনে দিল ছোট খাট কিছু কিছু পরিবর্তন। একটু একটু করে হাজার টাকা জমেছে এটা জেনে মনে বেশ তৃপ্তি এল। তহসিলদারের উপদেশ মত কায়দা কানুনের বইটি উল্টে পাল্টে পড়ে দেখতে লাগল সে এবং অনেক বিষয়, যা আগে বোধগম্য হয়নি, এখন ক্রমশ পরিষ্কার বুঝতে পারল। তার চাল চলনেও এল কিছুটা গাম্ভীর্য। আপিসে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করল, এখন আর সর্বদা সবাইকে খুশী রাখার জন্য সে ব্যস্ত হয় না, আত্মসম্মান জ্ঞান বেড়েছে, সবসময় অন্যদের কথামত চলার স্বভাবটা ছেড়েছে। খরচপত্রও ভালই করছে, শরীরটা ওর সেরেছে বেশ। কাজকর্মেও এতদিনে এসেছে একটা যান্ত্রিক মসৃণতা।

10. ঘর ভাঙানো জীবন

বিন্দ্‌গোলে রাঘপ্পা 'রাঘোবা ভরারী' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল আর এই নামকরণের জন্য সে মনে বেশ গর্বও অনুভব করত। তার কীর্তিকলাপ ছিল বহুমুখী। তার বয়স যখন দশ বছর এবং স্বয়ং গান্ধীজীও যখন ছোট ছিলেন সেই সময়েই সে সত্যাগ্রহের মন্ত্র শিখে ফেলেছিল। চারজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এক বেকারীর সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে ধ্বনি তুলেছিল "ব্রেড্ চাই।" অবশেষে বেকারীর মালিক তিতিবিরক্ত হয়ে একখানা পাঁউরুটি দিয়ে তাদের নমস্কার জানিয়ে অনুরোধ করে যে আর যেন তারা কখনও তার দোকানে না আসে। বারো বছর বয়সে বাপের পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট চুরি করে সে আর এক ধাপ অগ্রসর হল। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের সব কাজকর্ম, উৎসব ইত্যাদিতে সে থাকত সবার আগে। কখনও আউট না হওয়া ব্যাটস্‌ম্যান যে ভাবে অবসর গ্রহণ করে সেইভাবেই সে নিজের গদি এই দশ বারো বছরে অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম বছর চারেক যুবকেরা সব কাজকর্মেই তার কাছে আসত পরামর্শ নিতে।

রাঘপ্পার ভাগ্যটা ভালই ছিল, কোন কিছুরই অভাব হত না তার। বিন্দ্‌গোলের আট বছরের জীবনে সেই ছিল গ্রামের প্রধান। চাষীরা ভয়ে তার কাছে কোনকিছুর চাঁদা চাইতে আসত না। শোনা যেত চাঁদা চাইতে গেলেই সে তলায় তলায় কারসাজি করে

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে থাকে। চাষবাস যখন শুরু করল তখন সে বড় বড় চাষীদেরও লজ্জা পাইয়ে দেবার মত বলদ নিয়ে এল, উপার্জনও করল যথেষ্ট। কিছুদিন চলল মৌমাছি পালন, তারপর মুরগীও পুষল কিছুকাল। সে ধার চাইলে 'না' বলবার মত হিম্মৎ সারা গ্রামে কারও ছিল না। ঘাসের গাদায় যদি আচমকা আগুন লাগে তাহলে সে খবরও আধ ঘণ্টা আগেই পেয়ে যেত রাঘপ্পা। গ্রামে কোন ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে দু পক্ষকে কাছারিতে পৌঁছে দিতে যদি বের হত তাহলে অন্তত পাঁচ ছ টাকা রোজগার না করে ফিরত না সে। কিন্তু এই রকম সব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেও গ্রামের বাইরের হনুমানের মত সে বেশ নির্লিপ্ত থাকতে পারত। রাঘপ্পা ধারবাড়ে চলে আসার পর বিন্দ্‌গোলে সুখশান্তি বিরাজ করতে থাকে। ধারবাড়ে এসে সে এদিকে এক নতুন পথ ধরল। বেছে বেছে বন্ধুত্ব করতে লাগল বড়লোকদের সঙ্গে। ঘোড়া পুষল তো ভাল জাতের ঘোড়া, চাষবাস ধরল যখন, করল উঁচু দরের কৃষিকর্ম আবার পশুপালন করল তো প্রদর্শনীতে দেখাবার মত পশুই রাখল। সব কাজেই যশস্বী রাঘপ্পা এই নতুন রাস্তাতেও বছর খানেকের মধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে ফেলল।

মহবুবজানের সঙ্গে তার সম্পর্ক আজ প্রায় বারো চৌদ্দ বছর ধরে। প্রথম আলাপ খুব শীঘ্রই পরিণত হয় প্রেমে। তিন চার বছর পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপনীয়ই ছিল তারপর প্রকাশ পেয়ে যায়। বিন্দ্‌গোলে একবার বাড়ি থেকে কিছু সোনার গহনা চুরি যায়। চুরি হয়েছে বলে হৈ চৈ করে রাঘপ্পা তল্লাশ শুরু করে। কিন্তু পাড়ার এক বৃদ্ধ নিজের ছেলেদের বারণ না শুনে সোজা এসে চম্পক্কাকে বলে, "মা তোমার ভালর জন্যই একটা কথা বলছি। যজমান কাছারি যাওয়ার ছুতায় আজকাল বার বার হুব্বলী যাওয়া আসা করছে, সেখানে কুপথে যাওয়া বিচিত্র নয়। সোনা আর কোথাও যায়নি. যে খুঁজছে আর যে সরিয়েছে সে একই লোক। তুমি একটু হুঁশিয়ার হয়ে সংসার সামলাও।"

পরবর্তী তিন বছরেও চম্পক্কা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। সংসার কলহ আর অশান্তিতে ভরে ওঠে। একবার তো সে বাচ্চাদের নিয়ে চারমাস বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল, তারপর ভাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ফেরত পাঠায়। কিন্তু রাঘপ্পাকে বোঝাবার সাহস বিন্দ্‌গোলে কারও ছিল না। একবার চম্পা নিজের সমস্ত গহনা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে, প্রাণ গেলেও চাবি স্বামীকে দেবে না প্রতিজ্ঞা করে, বাক্স নিয়ে পূজার ঘরে ঢুকে বসেছিল। কিন্তু স্বামীর হাতের এক চড় খেয়েই কোথায় উড়ে গেল তার প্রতিজ্ঞা. সে নিজেই তখন পায়ে ধরে, অনশন করে, আদরের মেয়েকে সঁপে দেয় স্বামীর পায়ের তলায়। কিন্তু সবেতেই রাঘপ্পার সেই এক জবাব, "আমি রোজগার করি, আমিই খরচ করব। যদি কোনদিন তোমাদের খাওয়া পরার কষ্ট হয় সেদিন আমি বিন্দ্‌গোলের চৌপালের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নাককান কেটে ফেলব। পুরুষমানুষের কাজে তুমি নাক গলাতে আস কেন?" এই কথাই বরাবর রাঘপ্পা বজায় রেখে চলেছে। বেহিসেবী খরচ করেও সে কখনও মুস্কিলে পড়েনি। সে বলত, কোথাও চার পা হাঁটলেই আমি চার টাকা পকেটে ফেলব, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাটা। খাওয়াদাওয়ার কোন কমতি ছিল না,

তার সংসারে। ছেঁড়া কাপড় সে নিজেও কখনও পরেনি, পরিবারের লোককেও পরতে দেয়নি। যদি কখনও কোথাও কিছু টাকা খোয়া গেছে তাহলে হয় তাস খেলে, নয়ত কোর্ট কাছারিতে মধ্যস্থতা করে আর না হয় কারোকে ধাপ্পা দিয়ে সে টাকা সে আবার রোজগার করেই নিয়েছে।

কিন্তু এ সব সত্বেও চম্পক্কা এটা স্থির বুঝে নিয়েছিল যে তার স্বামীর মত মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই সে একেবারে মুখ বুজে থাকত। বাইরের লোকের কাছে একবার নিজের স্বামীর নামে নালিশ করতে গিয়ে নিজেরই মর্যাদায় ঘা লেগেছিল তারপর একবছর আর সে বাড়ি থেকে বার হয়নি।

বছর দুই বাদে চম্পার ভাই বদলি হয়ে এল হুব্বলীতে। ওকে পরাজিত করে যে সুন্দরী ওর স্বামীকে জয় করে নিয়েছে সেই রূপসীকে একবার স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল ওর মনে। হুব্বলীতে ভাইয়ের কাছে এসে সে মহবুবজানের খোঁজ শুরু করল তারপর একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল গিয়ে তার বাড়িতে। সেখানে মেয়েকে তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আঁচল বিছিয়ে কান্নাকাটি সহযোগে নিজের দুঃখ জানিয়ে ফিরে এল।

রাঘপ্পার যে স্ত্রী আর সন্তান আছে এটা মহবুবজান কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। এই নতুন খবর জানতে পেরে তারও মন গলে গেল করুণায়। পরের সপ্তাহে রাঘপ্পা এসে পৌঁছতেই, "আপনি বাড়ি ফিরে যান", এই বলে বিদায় করল তাকে। এরপর দেড় বছর রাঘপ্পা আর মহবুবের দর্শন পায়নি। এদিকে চম্পক্কার মনে তখন আবার এক নতুন চিন্তা দেখা দিয়েছে। তার ভয় হয়েছে রাঘপ্পা এদিক ওদিক খারাপ জায়গায় যাতায়াত করে নিজের স্বাস্থ্য না নষ্ট করে বসে। অবশেষে একদিন চম্পক্কা স্বয়ং মহবুবের বাড়িতে গিয়ে স্বামীর সব ভার সঁপে দিয়ে এল তার হাতে। সেইদিন থেকে এদের সংসারে একেবারে কুলদেবীর সম্মান পেতে লাগল মহবুবজান। তখন থেকেই 'যুগাদি' বা দীপাবলী ইত্যাদি উৎসবে মহবুবকে নিমন্ত্রণ করে চম্পক্কা, তাকে জামাকাপড় উপহার পাঠায়। মহবুবজানও পেয়ারা, আম ইত্যাদি সময়ের ফল ঝুড়ি ভরে পাঠায় চম্পক্কার বাড়ি। ফলে রাঘপ্পার জীবনে আগের চেয়ে শান্তি বিরাজ করতে থাকে। এ সবের পূর্বেই, এখানে এসে চম্পক্কার আর একটি সন্তান হয় এবং তারপর থেকেই হৃদরোগ ও রক্তক্ষয় ব্যাধিতে ভুগতে আরম্ভ করে সে। বছরে তিনচার মাস তার কাটাতে হয় রোগ-শয্যায়। ডাক্তারে উপদেশ দিল তার পক্ষে আর সন্তানধারণ উচিত হবে না।

অসুখের শুরুতে চম্পক্কা যখন হুব্বলীর হাসপাতালে ছিল সেই সময় মহবুবজান দিনে দুবার করে তাকে দেখতে যেত। মেয়েদের পড়ানোর অজুহাতে রাঘপ্পা যখন ধারবাড়ে সংসার তুলে আনল তখন থেকেই মহবুবজানের বাড়ি যাতায়াত আরো বেড়ে যায়। সেও যেন হয়ে গেল এদের পরিবারেরই একজন। বাচ্চারা তো খুবই ভালবাসত তাকে, কারণ সে যখনই আসত সঙ্গে নিয়ে আসত পেড়া, আটিগা (নোনৃতা খাবার) আর নানারকম ফল ফুলুরী।

এখন রত্নার বয়স চোদ্দ আর শান্তার বারো। তাদের আচার ব্যবহারের জন্য ধারবাড়ে সারা পাড়ার লোক তাদের ভালবাসত। রত্না দিন দিন বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠছে, তাই চিন্তাও বেড়ে চলেছে চম্পক্কার। গঙ্গব্বা আর কিট্টীর কথা ওর মনে ছিল কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কখনও সে আলোচনা করেনি এতদিন। তবে কিট্টী এখন বড় হয়ে তহসিলদারের আপিসে চাকরী করছে সে খবর রাঘপ্পা পত্নীকে জানিয়েছিল। কিট্টীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাঘপ্পা বিশেষ আগ্রহী ছিল না কিন্তু চম্পক্কা চাইত যে এই বিয়েটার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার ভাঙা সম্পর্ক আবার জোড়া লাগুক। তার নিজের বিয়ের সময় কিট্টীর পিতা স্বামীরায় যে উপকার করেছিলেন তা সে আজও ভোলেনি। তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কন্যাদান করে সেই উপকারের অন্তত কিছুটাও শোধ করবে সে। তারই আগ্রহাতিশয্যে রাঘপ্পা আপিসে গিয়ে কিট্টীর সঙ্গে দেখা করে এবং তারপর গঙ্গব্বার বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু গঙ্গব্বার আপত্তি আছে বুঝতে পেরেই চিরকালের খেলোয়াড় লোক রাঘপ্পা আবার বাজিমাৎ করবার নেশায় মেতে উঠল। 'তোর চোখের সামনেই তোর ছেলেকে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলব' এই রকম একখানা ভাব নিয়ে সে ফন্দি আঁটতে আরম্ভ করে দিল। তাছাড়া আরো একটা কথা, যদিও তার নিজের বিয়ে নিয়ে কোনদিন আফশোষ করার কারণ ঘটেনি তবু সেই সময় স্বামীরায়ের ধমকের সামনে তাকে মাথা নিচু করতে হয়েছিল সে গ্লানি তার আজও কাটেনি। কিট্টীর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে সে ব্যাপারেরও কিছুটা বদ্‌লা নেওয়া যায়।

কপালজোরে রত্না মেয়েটি ভারি সুন্দরী। রাঘপ্পার খুবই ভরসা আছে যে রত্নার রূপের জোরেই অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যাবে। কাজেই সে পরবর্তী পরিকল্পনার দিকে মন দিল। বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেলে খরচখরচার জন্য হাতে অন্তত দু তিন হাজার টাকা তো থাকা চাই! ধারবাড়ে বড় বড় লোকের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব, বিয়েতে তাঁরা নিমন্ত্রিত হবেন, কাজেই বিয়েটা যথেষ্ট ঘটা করেই দিতে হবে। সংসার খরচের জন্য রাঘপ্পাকে কোনদিন চিন্তা করতে হয়নি কিন্তু একসঙ্গে বেশী টাকার দরকার হলে জমি বেচা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রাঘপ্পা যখন এইসব চিন্তায় ব্যস্ত সেই সময় চম্পক্কা কিন্তু তার স্ত্রীসুলভ দুর্বলতায় আর একটা অন্য কথাও ভাবছিল, "মহবুবজান আমার বোনের মত, এ বাড়িতে সে দেবীর মত শ্রদ্ধা পায় এটা তো ঠিক। আজ পর্যন্ত এ বাড়ি থেকে সে কম করেও আট দশ হাজার টাকা পেয়েছে। রত্না তো তারও মেয়ের মত, এই মেয়ের বিয়েতে তারও কি দু এক হাজার দেওয়া উচিত নয়?" মহবুবজানকে স্নেহভরেই চম্পক্কা দু একবার এ কথাটা আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছে। নিজেকে সামলাতে না পেরে সে রাঘপ্পার কাছেও একবার কথাটা বলে ফেলেছিল কিন্তু শোনামাত্র রাঘপ্পা ক্ষেপে গর্জে ওঠে, "এ কথা আর কখনও আমার সামনে বলবে না। দরকার হয় জমিজমা বেচে দেব, আর নয়ত রত্না ছেলের মতই চিরকাল আমার ঘরেই থাকবে।" সেই থেকে তার সামনে আর কিছু বলার সাহস চম্পক্কার

হয়নি, কিন্তু সুযোগ বুঝে মহবুবকে চম্পক্কা বলেছিল, "দেখো বোন, তোমার যজমান রত্নার বিয়ের জন্য মেগ্নুরের ক্ষেত বেচে দেবার কথা ভাবছে।"

বুদ্ধিমতী মহবুব এসব কথার মানে বোঝে না এমন নয়, কিন্তু এ ধরনের কথায় সে চুপ করেই থাকত। প্রথমত বিয়ে এখনও পাকা হয়নি, আর তাছাড়া সম্প্রতি মহবুব তার ভাগ্নেকে একটি মুদীর দোকান খুলে দিয়েছে, নিজের প্রায় সমস্ত সঞ্চয় তাকে ঢালতে হয়েছে সেই দোকানের পেছনে।

11. দেসাঈজীর চিন্তা

দেসাঈজী বেশ চিন্তিতভাবে লক্ষ্মী হাই স্কুলে এসে পৌছলেন। সব ক্লাস থেকেই মৃদু গুঞ্জন উঠছিল কিন্তু দেসাঈজীকে প্রধান শিক্ষকের ঘরের দিকে যেতে দেখে সবাই কথাবার্তা থামিয়ে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল। একটি ক্লাসে একজন শিক্ষক চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডোণ্ট লুক হিয়ার এণ্ড দেয়ার, বী এ্যাটেণ্টিভ্!" (এধার ওধার তাকিও না, মনোযোগ দাও)। দেসাঈজীর চিন্তা আরো বেড়ে গেল। যা খুশি হোক, ঝগড়া হোক, চুরি হোক, খুন হোক কিন্তু ঐটি যেন না হয় ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানাতে জানতে দেসাঈজী প্রবেশ করলেন প্রধান শিক্ষকের খাসকামরায়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক বরাবরের মত হেসে উচ্চ কণ্ঠে তাঁকে স্বাগত জানালেন না, শুধু "আসুন" এইমাত্র বলে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

যা আশঙ্কা করছিলেন তাই ঘটেছে। এতকাল ধরে বসন্তরাওয়ের নামে অভিযোগ ছিল নানা রকমের। ক্লাসে হৈ হল্লা করা, শিক্ষকদের মুখে মুখে জবাব দেওয়া, যখন খুশি স্কুলে আসা এ সব তো বসন্ত প্রথম শ্রেণী থেকেই করে আসছে। কিন্তু স্কুলের জন্ম থেকেই দেসাঈজী মোটা চাঁদা দিয়ে আসছেন, তাছাড়া তিনি স্কুলের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য কাজেই বসন্তের সম্বন্ধে নালিশ করার কথা শিক্ষকরা চিন্তাও করতেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করে বসন্ত এমন ব্যবহার আরম্ভ করল যেন বাপের পরে সেই স্কুল কমিটির আজীবন সদস্য হয়ে যাবে। গুটি চারেক তার নিজের মতই বেয়াড়া বন্ধুকে জুটিয়ে ক্লাসের মেয়েদের বাড়ি যাবার পথে সে নানা রকমে জ্বালাতন করত একথাটা চাপরাশী থেকে প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত সবাইকারই জানা ছিল। এতদিন বসন্ত এর চেয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে নি। মেয়েরাও তার হালচাল দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাকে লক্ষ্যও করত না, যে যার বাড়ি চলে যেত। সামনের বছর বসন্তরাও তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসবে। এ বছর বসন্তরাও একেবারে বামনাবতার ধারণ করে তৃতীয় আর এক নতুন পথে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তার কাণ্ডকারখানায় ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে

আগত রাজারাও বোধ হয় লজ্জা পেয়ে যেতেন। মেয়েদের কোমল গাল লক্ষ্য করে সে সুপারি ছুঁড়ত, মাঝে মাঝে চাঁপা ফুলের পাপড়িতে নিজের নাম অথবা কোন মেয়ের নাম লিখে এক এক দিন এক একটি নতুন নতুন মেয়ের চুলে গুঁজে দিয়ে প্রেম নিবেদন করত, এ ব্যাপারে তার পক্ষপাতশূন্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যেত বলা চলে। একটি বেশ ফ্যাশানেবল একটু 'টম্‌বয়' টাইপের লম্বা চুলওয়ালা মেয়েকে সে মোটেই দেখতে পারত না। কারও কাছে সে একবার শুনেছিল মাথায় নুন ঢেলে দিলে নাকি সব চুল উঠে যায়। ব্যাপারটা হাতে নাতে পরখ করে দেখার জন্য স্কুলের পাঁচিলের ওপর উঠে সে একদিন ঐ মেয়েটির মাথায় ঢেলে দিল প্রায় আধসের নুন। প্রধান শিক্ষক দেখতে পেয়ে বসন্তকে খুব বকাবকি করলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের মন ভেজাবার কলাকৌশলও বসন্তর বেশ জানা আছে। ধমক খেয়ে সে একেবারে বেকুবের মত হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি শুরু করে দিল, "আমার ভুল হয়ে গেছে, নিজের ছেলে মনে করে এবারটা আমায় মাফ করে দিন স্যার।" এমন ছেলেকে কি করে বোঝানো যায় প্রধান শিক্ষক মশায়ের এইটেই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বসন্তের কীর্তিকাহিনী একেবারে পুরাণের পুণ্যকাহিনীর মত ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরত এবং দিন দিন বসন্তের নামযশ বেশ ছড়িয়ে পড়ছিল। সে কোন ছাত্রের ক্ষতি করত না বা কারও মনে কষ্ট দিত না এ কথাও সবাই বলত।

সেই বছর দ্বিতীয় সত্রে (term) পানা থেকে বদলি হয়ে আসা নতুন সবজজের মেয়ে এসে ভর্তি হল স্কুলে। সমস্ত স্ত্রী জাতির প্রতি পক্ষপাতশূন্য মনোযোগ দেওয়ার ফলে বসন্ত ছেলেদের কাছে অনাসক্ত যোগেশ্বর কৃষ্ণ উপাধি পেয়েছিল কিন্তু এই মেয়েটি স্কুলে আসার পর সে যোগভ্রষ্ট হয়ে একান্তভাবে এর প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল। এই বিড়ালাক্ষী মেয়েটির দিকে সে ভেড়ার মত চোখে চেয়ে থাকত। এতদিন যে শুধু হাসি মস্করা করে এসেছে সেই বসন্ত একদিন প্রাণের বন্ধু আবদুল আজিজের কাছে এসে হৃদয় উজাড় করে সব কথা বলে ফেলল। ওর কাছে বসে গজল শিখল, আর ক্ষণে ক্ষণে হায় হায় করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল। অবশেষে বন্ধুর সাহায্যে নিম্নোক্ত প্রেম-পত্রখানি লিখে লুকিয়ে রেখে এল কম্পাসের বাক্সের মধ্যে।

প্রিয়তমা লায়লা (কুমারী খোট),

সব ঠিক আছে। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসি, তুমিও আমাকে ভালবেসো। তুমি আর আমি বক্সে বসে সিনেমা দেখব। মোটর স্ট্যাণ্ডে আমি বেলা তিনটের সময় তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। সিনেমা সাড়ে তিনটেয় শুরু হয়। তুমি না এলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর বেশী কিছু লিখতে পারছি না। দেখা হলে কথা হবে। সব ঠিক আছে।

পোঃ ধারবাড়।
জিঃ ধারবাড়।

তোমার পরমপ্রিয় মজনু
বসন্তরাও গোপাল গোড়
দেসাঈ (বাহাদুর)

লায়লা চিঠিটি দেখায় মাকে, মা দেখালেন তাঁর স্বামীকে এবং স্বামী আর একখানি পরিচয়পত্র সহ চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন প্রধান শিক্ষক মশায়ের কাছে। এইভাবে বসন্তের প্রেমপত্রখানি তিনদিন ঘোরাঘুরি করল।

একালে পাঠক এরকম প্রেমপত্র হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার ঘটনাটা প্রায় তিরিশ বছর আগেকার। সে যুগে প্রেমপত্র এখনকার মত এত সস্তা ছিল না।

প্রধান শিক্ষক বেচারা বেশ সমস্যায় পড়ে গেলেন। মেয়ের সবজজ পিতা সরকারী ঢঙে এক কড়া নোট লিখে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছেন—

প্রধান শিক্ষক মহাশয়,

যে চিঠিটা আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি সেটি আমার কন্যার কম্পাসের বাক্সে পাওয়া গেছে। আমি জানতে চাই এই গুণ্ডাটার সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? পত্রবাহকের হাতে দুটি চিঠিরই প্রাপ্তি সংবাদ অনুগ্রহ করে জানাবেন।

ইতি আপনার ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্রবাহক চাপরাশী চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ নিয়ে ফিরে গেল। একদিক থেকে প্রধান শিক্ষক খুশীই হয়েছেন বলা চলে, কারণ এতদিনে সব অভিযোগ লিখিতভাবে পাওয়া গেছে। তিনি স্থির করলেন এই চিঠি দেসাঈজীর সামনে রেখে তাঁকেই প্রশ্ন করবেন এ বিষয়ে কি করা কর্তব্য।

চিঠি পড়ে দেসাঈজীর কপালে ঘাম দেখা দিল আর ওঁকে ঘেমে উঠতে দেখে প্রধান শিক্ষকও ঘামতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছেলে বাইরে যাওয়ার ছুটি চেয়ে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে প্রধান শিক্ষকের কামরায় উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দেসাঈজী মনস্থির করে ফেললেন, "মাষ্টারমশাই, আমি এ স্কুলের একজন ডোনার একথা আপনি ভুলে যান। শুধু একটি ছেলের পিতা হিসেবেই আমি আপনাকে একটা অনুরোধ জানাব। অনুচিত মনে হলে এ অনুরোধ আপনি নাও রাখতে পারেন, তার জন্য আপনার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই।"

দেসাঈজী কে জানে কি অনুরোধ করে বসেন এই ভেবে মাষ্টারমশাই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। একটু বিরক্ত ভাবেই তিনি বললেন, "বলুন কি বলবেন?"

"আমার ছেলের নাম আপনি স্কুলের খাতা থেকে কেটে দিন এই আমার অনুরোধ। তারপর আমি তাকে সাবধান করে দেব যেন সে স্কুলের ধারেকাছেও না আসে। এতেও যদি কোন ফল না হয় তাহলে আপনি তাকে চাপরাশী দিয়ে বার করে দিতে পারেন।

একজনের জন্য সারা স্কুলের বদনাম হওয়া উচিত নয়। স্কুলটাও বলতে গেলে আমার সন্তানের মত। দেসাঈজীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল, রুমালে চোখ মুছে তিনি বললেন, "শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা যে বহিষ্কার কথাটা নোটিশ বোর্ডে দেবেন না বা রেকর্ডেও লিখবেন না। জজসাহেবকে আপনি লিখে জানাতে পারেন যে ছেলেটিকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। আপনি যদি বলেন তো আমিও ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি কিন্তু স্কুলের রেকর্ডে ঐ শব্দটি যেন লেখা না হয়। এইটুকুই আমার অনুরোধ ; উচিত মনে করেন তো এই অনুরোধটুকু রাখুন।"

'প্রগ্রেস বুক পাঠানো হয়নি', 'মাইনে বেশী নেওয়া হচ্ছে', 'খেলার জন্য ফী নেওয়া হয় অথচ খেলার সরঞ্জাম নেই', এই ধরনের অভিযোগ সাধারণ অভিভাবকদের কাছ থেকে দুবেলা শুনতে হয়। ঐ ধরনের কথায় অভ্যস্ত মাষ্টারমশাইয়ের কানে দেসাঈ সাহেবের কথা অমৃতের সমান বলে মনে হল। কৃতজ্ঞতায় তিনি প্রায় হতবাক হয়ে পড়লেন। দেসাঈজীর কাছে এ ধরনের উক্তি তিনি আশা করেন নি। এ প্রস্তাবে সব দিক থেকেই ন্যায়বিচার করা হবে বলেই তাঁর মনে হল। জজসাহেবের কাছে অবশ্য একটু মিথ্যা বলতে হবে তবে গুছিয়ে গাছিয়ে লিখতে পারলে সেটা মোটের ওপর সামলে নেওয়া যাবে। স্কুলের রেকর্ড সম্পর্কে দেসাঈজীর শ্রদ্ধা দেখে বিব্রত মাষ্টারমশাই অনেকখানি শান্তি পেলেন। বসন্তরাওকে ডেকে পাঠালেন তিনি কিন্তু সে তখনও নিজের ক্লাসে এসে পোঁছয় নি।

বসন্তরাও সেদিন সারা দুপুর সেজেগুজে বন্ধু আবদুল আজিজের ঘরে বসেছিল এবং তার সঙ্গে চলছিল ওর সলা পরামর্শ। বেলা দুটোর সময় সে গিয়ে হাজির হল মোটর স্ট্যাণ্ডে। দাঁড়িয়ে থাকল ঠায় দুটি ঘণ্টা কিন্তু কেউই এল না। মোটর স্ট্যাণ্ড থেকে সিনেমা হল পর্যন্ত কম করেও বার দশেক ঘোরাঘুরি করে অবশেষে তার ধারণা হল প্রেমিকার নিশ্চয় তাকে পছন্দ হয়নি। তার ব্যথিত হৃদয় তাকে এই পরামর্শই দিল যে স্কুল শেষ হবার আগেই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে প্রাণের কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া ভাল। পথ অনেকটা, সময় মত হয়ত পোঁছতে পারবে না এই ভেবে সে চটপট একটা টাঙ্গায় উঠে পড়ল। জোর কদমে দেখতে দেখতে টাঙ্গা এসে হাজির স্কুলের আঙিনায়। ঘোড়ার আওয়াজে সারা স্কুল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন কি প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত হঠাৎ কোন ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন ভেবে নিজের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর পেছন পেছন দুটো চাপরাশী। ইন্‌স্পেক্টর আসার আতঙ্কে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে গাছে গাছে পাখীরা পর্যন্ত স্তব্ধ। এই রকম পরিবেশে বসন্তরাও সাড়ম্বরে ধুতির কোঁচা সামলাতে সামলাতে টাঙ্গা থেকে অবতীর্ণ হল। পানের রসে তার ঠোঁট লাল, গরম কোট থেকে আতরের যা সুবাস ছাড়ছে তাতে বাগানের ফুলের গন্ধও চাপা পড়ে গেছে, কোটের বুকে লাগানো একটি তাজা গোলাপ, পকেট থেকে উঁকি মারছে দু তিন রঙা রুমাল, জুতোর পালিশে চোখ ঠিকরে যায়, গলায় সাপের মত ভঙ্গিতে জড়ানো স্কার্ফ, মাথার এক গুচ্ছ চুল উড়ছে। আবদুল আজিজ আবার ওকে মজনু সাজাবার জন্য চোখে সুরমাও লাগিয়ে

দিয়েছিল। এতসব সাজগোজের ফলে বসন্তরাওকে কোন একটি নাটকের দুটি বিচিত্র চরিত্রের মত দেখতে লাগছিল ; তার খানিকটা যেন ভীমসেন আর বাকিটা যেন একটি তিনমাসের শিশু।

প্রধান শিক্ষক মশাই দিশাহারা হয়ে প্রায় দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে টাঙ্গার কাছে এসে বসন্তের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নমস্কার করার জন্য ওঠানো হাত তুলে শুরু করলেন মাথা চুলকোতে। কি করা যায় ভেবে না পেয়ে প্রায় মিনিট খানেক ধরে উনি শুধু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। ক্লাসের মধ্যে থেকে ছাত্রেরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে কোনক্রমে হাসি চাপছিল কিন্তু চতুর্থ পঞ্চমশ্রেণীর ট্রেনিং না পাওয়া শিক্ষক আর থাকতে না পেরে শব্দ করেই হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সারা ক্লাস হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। সেই শব্দ শুনে আরো দু তিনটি ক্লাস থেকে উঠল হাসির রোল। এরই মধ্যে প্রধান শিক্ষকমশাই নিজেকে সামলে নিয়েছেন এবং কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি, "ব্যাপার কি ?"

"কিছু না স্যার, বাড়িতে শ্রাদ্ধের কাজ ছিল তাই আসতে দেরী হল।"

শিক্ষকমশাইয়ের মনে হল এ শ্রাদ্ধ আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি ওকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের কামরায়, তারপর সেই প্রেমপত্রখানি ওর হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এ চিঠি তোমার লেখা ?" নিজের রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি এখন প্রধান শিক্ষকের হাত থেকে পেয়ে চিঠিটাকেই ওর পরম শত্রু বলে মনে হতে লাগল। হাতের লেখা তারই, কালিও তার, পাছে বুঝতে ভুল হয় তাই নিজের হাতে আবার শেষকালে 'বাহাদুর' নামটাও জুড়ে দিয়েছিল। সবদিক থেকেই বসন্তরাও ধরা পড়েছে, কিছুই বলার নেই তার। মিথ্যে আশায় সে এবার আইনের স্মরণ নিল, "হ্যাঁ আমারই লেখা, কিন্তু আপনি এ চিঠি কেন পড়েছেন ?"

এবার প্রধান শিক্ষকমশাই জজসাহেবের চিঠিখানা তার নাকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে গর্জন করে উঠলেন, "কাল থেকে তুমি আর স্কুলে আসবে না।" তাঁর রাগ দেখে বসন্ত আবার অনুনয় বিনয়ের পথ ধরল, "স্যার, আমাকে আপনার ছেলে ভেবে এবার ক্ষমা করে দিন। এই অপরাধ কাউকে জানাবেন না।" বসন্তের এসব কথাবার্তা মাষ্টারমশাইয়ের কাছে কিছু নতুন নয়। "কোন কথা শুনতে চাই না। কাল থেকে তোমার স্কুলে আসবার দরকার নেই। যদি আস তো..." মাষ্টারমশাই ঢোঁক গিললেন।

এ ধরনের কথা বসন্তের কাছে নতুন ঠেকল, "যদি আসি তো কি করবেন ?"

"সে কথা বালাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করে নিও।"

বালাপ্পা নামধারী ষণ্ডামার্কা চাপরাশীটি স্কুলের ঘণ্টা বাজায়। বসন্তের ভারি রাগ হল, অপমানও বোধ হল। দাম্ভিক সুরে সে বলে উঠল, "বালাপ্পা আমার কি করবে ? আমার বাবার দেওয়া চাকরী করে, না হলে তো মারা পড়ত। আমাকে ছুঁয়ে দেখুক তো সে।" তারপর সে বেশ গলাবাজি করেই আসল কথায় এল, "কাল থেকে আমি স্কুলে

আসব না ? কেন ? আমি কি মাইনের বদলে ঢিল পাটকেল দিই ? আমি রীতিমত ফীস্ দিয়ে থাকি, ফীস্ !"

"তোমার ফীস্‌ও চাই না আর তোমাকেও চাই না আমরা।"

"কেন ? যখন আপনি চাইবেন তখনই আসব আর নাহলে আসব না ? স্কুলটা কি আপনার বাবার ?" এই বলে বসন্ত ফোঁস ফোঁস করতে শুরু করল। চাপরাশীরা এসে ওকে ধরলে ও জোর করে মাটিতে বসে পড়ল। প্রধান শিক্ষক যখন দেসাঈজীর লেখা ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক চিঠিটি পড়ে শোনালেন তখন বসন্তের পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। প্রধান শিক্ষক বললেন, "তোমাকে, বালাপ্পাকে দিয়ে স্কুল থেকে বার করে দেবার আদেশ স্বয়ং দেসাঈজীই মৌখিকভাবে দিয়ে গেছেন। তিনি সব কথাই জানেন।" এরপর তিনি জানালেন, "তোমার বাবা একথাও বলে গেছেন যে রাতে আমার ফেরার সময় যদি তুমি রাগের মাথায় কিছু কর তো......" সব কথা বলার পর বললেন, "এবার তুমি যেতে পার।"

বসন্ত বলের মত ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। পয়সা পায়নি বলে টাঙ্গাওয়ালা তখনও দাঁড়িয়েছিল বাইরে, বসন্তরাও রাগে ফু'সতে ফু'সতে আঙ্গুল মটকিয়ে টাঙ্গায় চড়ে বসল—যাবার সময় নিজের স্কুলের মেঝেতে থুথু ফেলে বলে উঠল, "বয়ে গেছে, কে আসতে চায় এখানে !"

12. বসন্তরাওয়ের লঙ্কাদহন

বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বসন্ত সোজা এসে হাজির হল বন্ধু আবদুল আজিজের ঘরে। তার কলাবিদ্যার যোগ্য পুরস্কার জোটেনি দেখে আবদুল আজিজ হল মর্মাহত। প্রেমে এই আশাভঙ্গের আসল কষ্টটা যেন তারই। লায়লা মজনুর কাহিনী পড়তে পড়তেই সে বড় হয়েছে, এখন তার ভাবনা হতে লাগল বসন্তরাওয়ের জীবনটাই না বরবাদ হয়ে যায়, বুক চাপড়ে চাপড়ে সে পাগল না হয়ে বসে। সে ওকে বোঝাতে শুরু করল। কিন্তু বসন্তের এওক্ষণে প্রেমের কথা আর মনেও ছিল না। স্কুলে অপমানিত হওয়ার ব্যাপারটাই এখন তার মাথায় ঘুরছে। সে এখন, স্কুলে আগুন লাগানো যায় কিনা, অথবা প্রধান শিক্ষককে অন্ধকারে ধরে উত্তম মধ্যম দিলে কেমন হয়, এইসব দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা ভাবছিল। আবদুল আজিজের গজল তাকে কিছুই শান্তি দিতে পারল না। যা করার একলাই ভেবে স্থির করবে চিন্তা করে সন্ধ্যার পর সে বাড়ির দিকে চলল, কিন্তু বাড়ির কাছে এসেই, 'এখানে এসে কি হবে ?' এই ভেবে আবার

ধরল উল্টো রাস্তা। এই ভাবে অশান্ত মন নিয়ে পথে ঘুরে ঘুরে রাত দশটা বেজে যাবার পর এবার যখন বাড়ির কাছে এল, বাইরে থেকেই কানে এল নিম্নোক্ত কথোপকথন,--

দেসাঈজী জিজ্ঞাসা করছেন, "ঐ কূয়োর ধারের বাড়িতে হয়ত তাস খেলছে. সেখানে দেখা হয়েছে কি ?"

"সেখানেও নেই হুজুর।"

"সেই মুসলমান ছেলেটার ঘরে দেখে এসেছ ?"

"এখন তো সেখান থেকেই আসছি।"

"দেখো আরো এক আধ ঘণ্টা, এলেই আমাকে ডেকে দেবে। যাবে আর কোথায়..."

এরপর আর কিছু শোনা গেল না। এই বার্তালাপ শুনে বসন্তের একবার ইচ্ছা হল পালায়, কিন্তু বেচারার পা ব্যথা করছিল। আজিজের ঘরও অনেকটা দূরে। আর কারও বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে অনেকরকম গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। পুরোহিত বালম ভট্টের বাড়ি গিয়ে বলা যেতে পারে, "ভট্ট, আজ তোমার এখানেই খাব", কিন্তু সেখানে শোবার জায়গার মুস্কিল, কারণ দারুণ ছারপোকার উপদ্রব। একটা উপায় মাথায় এল। কোনরকমে বাড়ির পেছন দিক থেকে উঠানে প্রবেশ করে চুপচাপ ওপরে নিজের ঘরে ঢুকে পড়া যায়। পেছন দিকটা অবশ্য একেবারে অন্ধকার। পাঁচিল টপকাতে গিয়ে কাঁটা ফুটল না দেখে সে খুশী হয়ে বাড়ির কাছে এল। অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। টুপীটা খুলে সে পকেটে পুরল এবং কোটটা খুলে বেঁধে ফেলল কোমরে। জুতো লুকিয়ে রাখল ঝোপের মধ্যে, ধুতি উঁচু করে কষে বাঁধল তারপর জানলায় পা রেখে জানলার শিক পায়ের আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ঘষে ঘষে কিছুটা ওপরে উঠে জানলার মাথায় কার্নিসের মাঝখানের পাথরে পা রেখে সেঁটে দাঁড়াল। পাথরটা মোটে আধফুট চওড়া, পায়ে লাগছে, হাত দিয়ে কোন রকমে দেওয়াল ধরে সে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে হাত উঠিয়ে নিজের ঘরের জানলার তলাটা সে ছুঁতে পারল, জানলার শিকটা একবার ধরতে পারলে সে এক লাফে নিজের ঘরে পৌঁছে যেতে পারত। অন্য দিকে হাত বাড়ালে বারান্দার শিকগুলোও ঠিক ওর নাগালের থেকে এক ইঞ্চি দূরে। প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত শক্তি দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েও সে নিজের জানলার তলার পাথরটার আধখানা মাত্র ধরতে পারল কিন্তু ঐটুকুর ওপর পুরো ভার ছেড়ে দিয়ে লাফানো অসম্ভব। এতখানি নিরাশ বসন্ত জীবনে কখনও হয়নি। সারাদিনের ক্লান্তি এখন আবার নতুন করে অনুভূত হতে লাগল। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে, দেহে যেন ছুঁচ ফোটার মত যন্ত্রণা। ক্লান্তি আর হতাশায় সে এত ভেঙে পড়েছে যে আর একটু হলেই হাত ফসকে, ছাত থেকে পড়া টিকটিকির মত সে মাটিতে এসে আছাড় খেত। একটু সামলে নিয়ে নিচের দিকে পা বাড়িয়ে দেখল নিচের জানলার শিক পর্যন্ত পা পৌঁছচ্ছে না। এখন লাফ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মাটি যে কতটা নিচে অন্ধকারে তাও বোঝা যাচ্ছে না। যেখানেই পড়ুক পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়াই যুক্তিযুক্ত মনে হল। সামান্য ঝুঁকে সে মারল এক লাফ, আধ মুহূর্ত শূন্যে ভেসে মাটিতে এসে পড়ল ধপাস

করে। চোখে অন্ধকার দেখে মিনিট দুই বেচারা দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল, সারা বিশ্ব সংসার যেন শূন্য বোধ হচ্ছে। এরই মধ্যে কোণের দিক থেকে সর্সর্ শব্দ পাওয়া গেল। ওদিকে গোয়ালঘর। বসন্তরাও গোয়ালঘরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চুপি চুপি সেখানেই গিয়ে ঢুকল এবং খড়ের গাদায় শুতে না শুতেই এসে গেল গভীর ঘুম।

রাত বারোটা বেজে গেছে এখনও ছেলে ফেরে নি, সিনেমা দেখতে গেলেও এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। বেণুবাঈ এতক্ষণ মুখ বুজে থেকে এইবারে কেঁদে ফেললেন। স্বামী স্ত্রী দুজনের কারোই সে রাতে খাওয়া হয়নি। রাত দুটো পর্যন্ত দেসাঈজী ঘুরেছেন রাস্তায় রাস্তায়, অবশেষে রেলওয়ে ষ্টেশনেও খুঁজে তারপর বসলেন গিয়ে ওয়েটিং রুমে। সেখান থেকে ভরমাকে এক দিকে আর মল্লাকে আর এক দিকে খুঁজতে দৌড় করালেন। তারা লণ্ঠন নিয়ে এক মাইল দেড় মাইল করে ঘুরে এল। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই ফিরে এল বাড়িতে। বেণুবাঈ ছোট ছেলে পুরুষোত্তমকে বুকের কাছে নিয়ে চুপ করে শুয়েছিলেন, আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, আওয়াজ শুনে উঠে এসেই আবার শুরু করলেন কান্না। দেসাঈজী নানাভাবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে দিতেই ওদিকে মোরগ ডেকে উঠল। ভোরের দিকটায় ক্লান্ত হয়ে সবারই চোখ এল জড়িয়ে।

বেলা সাতটা নাগাদ গোয়াল পরিষ্কার করতে এসে ভুষির গাদায় শায়িত দ্রোণাবতারের মত বসন্তকে আবিষ্কার করল ভরমা। দেসাঈজী ঢুলছিলেন তাঁকে এসে জাগাল সে। বেণুবাঈও ছুটে এসে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। দেসাঈজী ভরমাকে শুধু বললেন ওকে জাগিয়ে দিতে। বেণুবাঈ এগিয়ে এসে ছেলের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে ঘুম ভাঙালেন, চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল ছেলে। এদিক ওদিক চেয়ে ঘাস গোবর ইত্যাদি চোখে পড়ায় গতকালের সমস্ত কথা মনে পড়ে গেল তার। মা তো তাকে বুকে চেপে ধরে হেসে কেঁদে আদর করে বসে বসে একবাটি দুধ খাওয়ালেন। দেসাঈজী চুপচাপ দেখলেন সব কিছু। ছেলেকে ঐ অবস্থায় ঘুমোতে দেখে তাঁরও মনটা নরম হয়েই এসেছিল, কিন্তু সে ভাব বাইরে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না তাঁর।

বেণক্কা এদিকে বসন্তকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে খারাপ নজর ঝাড়াবার জন্য আরতি করে তার কপালে পরিয়ে দিলেন কুমকুমের টিপ। তারপর বসালেন খাওয়াতে। খিদের জ্বালায় বসন্ত প্রচুর আহার করল। মা করুণভাবে বললেন, "বসন্ত, আমায় ছেড়ে কোথাও চলে যাসনে বাবা। দেখ্ কাল তোর জন্য সারারাত চোখের পাতা এক করিনি। সারারাত ঠায় বসে কেটেছে। উনিও সমস্তটা রাত পথে পথে তোকে খুঁজে বেড়িয়েছেন; কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ভরমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। যা বাবা ওঁর কাছে মাফ চেয়ে নে, বল, "আমার দোষ হয়ে গেছে বাবা", তাহলে ওর মনটা একটু হাল্কা হবে।"

কিন্তু পেটে আহার পড়েছে এখন আর বসন্ত বাবাকে ক্ষমা করতে রাজী নয়। বাবাই তো ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়েছেন। চাপরাশী দিয়ে ওকে বার করে দেবার কথাও বলেছেন। এই সব মনে পড়তে, মায়ের কথামত কাজ করতে সে মোটেই রাজী হল না।

বসন্তের কাণ্ডকারখানা এবং পূর্বেকার সব অপরাধ ভুলে বাড়ির লোক তাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করলেও পরের দিন থেকেই ধারবাড় শহর তার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। স্কুল থেকে বিতাড়িত হবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে; অলি গলি দিয়েও এখন হাঁটা মুস্কিল। ওর মনে হতে লাগল গোটা শহরটাই ওর শত্রু। সে স্থির করে ফেলল মিস্ খোট-এর ওপরই এই অপমানের শোধ নিতে হবে। একরাত্রে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরের সমস্ত প্রকাশ্য জায়গায় মিস্ খোট-এর নাম এবং সেই সঙ্গে শৃঙ্গার রসাত্মক অভব্য কথা ছুরি দিয়ে খোদাই করে রেখে এল সে।

দেসাঈজীর কাছে আবার এল নালিশ। বসন্ত বাড়ির সবাইকার নামে শপথ নিয়ে বলল, "আমি তো বাড়ির বাইরেই যাই না, এমন কাজ আমি কেন করতে যাব।" কি করা যায় তাই নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন দেসাঈজী। অবশেষে বেণক্কার অনুরোধে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামে। বসন্ত তো ধারবাড় ছাড়তেই চাইছিল, গ্রামে গিয়ে সেও আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

13. জর্জ ওয়াশিংটন কম্বার গণিবী

কিট্টীর ধরনধারণে পরিবর্তন আসার ফলে তার লাভ হল এক নতুন বন্ধু, নাম তার জর্জ ওয়াশিংটন কম্বার গণিবী। এই বিদ্‌ঘুটে নামের জন্য কিট্টী বরাবর এই লোকটিকে একটি আজব জীব ভেবে এর থেকে দূরে দূরেই থাকত। সেও নিজের মনে কাজ করে যেত, কাজের প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলত না। কিট্টী বহুদিন লোকটির নাম ছাড়া তার সম্বন্ধে জানত না কিছুই। কিন্তু কিট্টীরও স্বভাব পালটেছে আজকাল। তহসিলদার সাহেবের উপদেশ মত সে আইন কানুনের বই এবং বিভিন্ন কেসের ফাইল বাড়িতে এনে পড়াশোনা করছে। কাজটা কিছুটা আয়ত্বে আসার পর থেকে পুরানো বন্ধুদের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে, প্রতি পদক্ষেপে আনাড়ির মত ওদের কাছে পরামর্শ নিতে এখন তার আত্মসম্মানে বাধে। ওদিকে তাদের ইচ্ছা ছিল যে কিট্টী বরাবরই তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক। এখন কোন ব্যাপার বুঝতে না পারলে কিট্টী নিজেই সোজা চলে যায় তহসিলদারের ঘরে। এর ফলে কিন্তু অন্যেরা কিট্টীকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তার সঙ্গে আর তেমন মন খুলে গল্প করে না কেউ। তহসিলদার কিট্টীর কাজের প্রশংসা করেছেন তাই শুনে অনেকের মনে বেশ হিংসারও উদ্রেক হয়েছে। কিট্টী কোন দরকারে কথা বলতে গেলে ওরা আজকাল বেশ বাঁকা সুরে জবাব দেয়। কিন্তু একবার কোন দরকারে জর্জের সঙ্গে কথা বলতে এসে অল্পক্ষণের মধ্যেই জর্জের সঙ্গে কিট্টীর বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠল। দেখা গেল জর্জ বেশ মিশুকে লোক। সে নিজে থেকে

এগিয়ে এসে আলাপ করতে পারে না বটে কিন্তু কেউ যেচে এসে আলাপ করলে এবং তাকে জর্জের পছন্দ হলে, তখন সে বেশ মন খুলেই মেলামেশা করে। অল্পদিনেই কিট্টী ও জর্জের বন্ধুত্ব বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এতদিন যার শুধু নামটাই জানা ছিল সেই জর্জ এখন কিট্টীর কাছে হয়ে উঠল এক জীবন্ত মানুষ।

জর্জের জীবনটা ছিল যেন নিদ্রার মত নিস্তব্ধ। মৌনতাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আপিসে সবাই তাকে চিনত। আড়ালে আবডালে লোকে তার বিদঘুটে নাম আর ঐ অদ্ভুত মৌন স্বভাব নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে বটে কিন্তু কিট্টীর মত তাকে কেউ কখনও ধমক খেতে দেখেনি। সে কখন যে ফাইলগুলো পড়ে ফেলে কেউ বুঝতেই পারে না, কিন্তু এটাও ঠিক যে তার কাছে কাজ কখনও অসমাপ্ত পড়ে থাকে না। একটা কাজ নিয়ে বসে থাকা বা কাজে ভুল করা ইত্যাদি দোষ না থাকায় তার কাজের সম্বন্ধে কেউ কিছু খবরই রাখত না। তাকে কেউ কোনদিন ভাল কর্মচারী বলে প্রশংসা করেনি, অন্যদের মত চেষ্টা চরিত্র করে লোকের চোখে পড়বার বা উন্নতি করার চেষ্টাও সে করত না। এমন কি সে নিজেও বোধ হয় জানত না যে, কাজ সে করতে পারে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে। 'সবাই নিজের নিজের কাজ করছে তাই আমিও করছি' কাজ সম্বন্ধে এই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গী।

কিট্টীর সঙ্গে প্রথমটা এত চট করে যে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেল তার কারণ এই নয় যে তার আর কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। বরং কিট্টীই তার এই নতুন বন্ধুর স্বভাবের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ল। জর্জের মধ্যে যে জিনিসটা কিট্টীর সবচেয়ে পছন্দ ছিল সেটা হচ্ছে তার, যে যেমন তাকে সেই ভাবেই মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি। কিট্টীর বেশভূষা, কথাবার্তার ঢঙ্ ইত্যাদি সম্পর্কে জর্জ কোনদিন একটি মন্তব্যও করেনি। অথচ অন্য বন্ধুরা হামেশাই কিট্টীর জামাকাপড়, টিকি, গোঁফ, কোট, টুপী ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই হাসি ঠাট্টা চালিয়ে যেত। জর্জের এ সব কিছু কখনও চোখেও পড়ত না, কিট্টী যেমন ছিল সেইভাবেই তাকে সে আপন করে নিয়েছিল।

নিজের কাজে সে ছিল একেবারে চৌকস কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তার কেমন একটা রোমান্টিক ধাঁচের অরুচি দেখা যেত। সেই অরুচি দূর করতেই বোধ হয় সে দুদিনে একটা করে সিনেমা দেখত আর এইটেই কিট্টীর কাছে জর্জের জীবনের সারবস্তু বলে বোধ হল। নিজের সম্বন্ধে জর্জ বিশেষ কিছু চিন্তা করত না আর সেই কারণেই অনাবশ্যক বিনয়ও ছিল না তার স্বভাবের মধ্যে। ভাল করে চিনবার আগেই কিট্টীর কাছে জর্জ হয়ে উঠল এক আদর্শব্যক্তি। যে সুখ্যাতি লাভ করার জন্য কিট্টী প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে সে খ্যাতি লাভের উপযুক্ত সমস্ত গুণই জর্জের মধ্যে রয়েছে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে। এটা কি করে হয় ভেবে পায় না কিট্টী। তহসিলদার সাহেব তাকে 'ভাল কর্মচারী' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু জর্জের সম্বন্ধে এ ধরনের কোন মন্তব্য করেন নি তাই প্রথমটা তার মনে হয়েছিল সে নিশ্চয় জর্জের থেকে বেশী কর্মদক্ষ কিন্তু এ ধারণাও কেমন যেন ঠিক খুশী করতে পারছিল না কিট্টীকে।

কিট্টীর জীবনে সিনেমা দেখার বিলাসিতা নিয়ে এল জর্জ। সিনেমা বিনা জর্জের জীবন মরুভূমিতুল্য। দু তিনদিন অন্তর সিনেমা দেখা তার অভ্যাস। কয়েক বছর আগে আমোদ প্রমোদ সংক্রান্ত বিভাগের ভার ছিল জর্জের হাতে, এখন অবশ্য তা আর নেই কিন্তু সিনেমাওয়ালাদের সঙ্গে খাতিরটা থেকে গেছে। আজও সে যতজনকে খুশি বিনা পয়সায় সিনেমা দেখাতে পারে।

জর্জের সঙ্গেই কিট্টী প্রথম সিনেমা দেখে। মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল। এদিকে জর্জের প্রবল আগ্রহ এবং বিনা পয়সার সিনেমা। তবে নিজের পয়সা উড়িয়ে তো ছবি দেখতে যাচ্ছে না, এই বলেই সে সান্ত্বনা দিচ্ছিল নিজের বিবেককে। কিট্টীর জীবনে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছোটবেলায় একবার নির্বাক চিত্র দেখেছিল, সেটা কিন্তু তার বিশেষ ভাল লাগেনি। অনভিজ্ঞ কিট্টীর প্রথমটায় সিনেমা হলে বড় গরম, অন্ধকার আর হৈ হল্লা বোধ হতে লাগল তারপর ক্রমে ক্রমে আবহসঙ্গীত তাকে সচেতন করে তুলল সিনেমার গল্পের প্রতি। দুঃখের গান শুনে বড় কষ্ট হল কিট্টীর। ছবির ভাষা হিন্দি তাই কথাবার্তা সে বুঝছিল না। হিন্দি জানা জর্জ মাঝে মাঝে ওকে বলে দিচ্ছিল 'ঐ হচ্ছে বিলমোরিয়া, এই হল হুস্‌ন বানো' ইত্যাদি। এতে কিন্তু কিট্টীর রসাস্বাদনে বাধাই ঘটছিল। ছবিতে একবার দেখা গেল একদল গুণ্ডা এক তরুণীকে বড় উৎপীড়ন করছে, তাদের সর্দার তরুণীর চুলের গোছা ধরে টানছে, অন্যেরা তার মুখের সামনে মশাল জ্বেলে পুড়িয়ে মারার ভয় দেখাচ্ছে। এরা সব কারা কিছুই বুঝছে না কিট্টী কিন্তু তরুণীর দুর্দশা দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। এ দৃশ্য আর দেখা যায় না, ভেবে সে মুখ নত করে ফেলল বটে কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহলের বশে আবার মুখ তুলে দেখতে লাগল। কিট্টী তখন একেবারে ডুবে গেছে করুণরসের সমুদ্রে কিন্তু জর্জ এর মধ্যে দু তিনবার মন্তব্য করেছে, 'বোরিং, একেবারে বোরিং।' কিট্টীর মনে হল জর্জ বড় রসভঙ্গ করে।

বিরতির সময় বাইরে এসে জর্জ বলল 'ব্যাড্ পিকচার', সে আর ভেতরে ঢুকতে নারাজ। কিট্টী বেচারা পড়ল মুস্কিলে। সম্পূর্ণ ছবিটা দেখার ইচ্ছা ছিল তার খুবই, কিন্তু জর্জের নিমন্ত্রণে সে এসেছে সুতরাং সাধ অপূর্ণ রেখেই ফিরে আসতে হল তাকে।

এরপর অনেকবারই এই রকম ঘটনা ঘটতে লাগল। জর্জ আধখানা ছবি দেখে চলে যায় আর কিট্টী শেষ পর্যন্ত বসে ছবি দেখে। খারাপ ছবি হলে বসে বসে 'বোর' হয়, তারপর রাত দশটায় বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে খায় বকুনি। সেও চোটপাট জবাব দেয়, তারপর বিরক্তিভরা মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই কিট্টী ভাল ছবি আর খারাপ ছবির প্রভেদ বুঝতে শিখে গেছে কিন্তু অর্ধেক ছবি দেখে উঠে আসতে সে কিছুতেই পারে না। 'আর সিনেমা দেখব না, মা একলা ঘরে পথ চেয়ে বসে থাকে' এ কথা সে বহুবার মনে ভেবেছে কিন্তু কখনই শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত টিঁকিয়ে রাখতে পারেনি। জর্জই বারে বারে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায় ভেবে মাঝে মাঝে জর্জের ওপর রাগ হয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে দেখে সে শেষ পর্যন্ত নিজের ওপরই চটে ওঠে।

এই সব ক্ষেত্রেই কিট্টী নিজের সঙ্গে জর্জের প্রভেদটা বুঝতে পারে পরিষ্কার ভাবে। জর্জের মনে আসক্তি নেই। যেখানে মন চায় না সেখানে সে নিজেকে সংযত করে নিতে পারে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি আছে বলেই জীবন নিয়ে তার ভাবনা চিন্তা কম। নিজেকে ভালবেসে সকলকে ভালবাসা যায় এ সত্যটা সে বুঝত খুব ভাল করে আর এই বোধই একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল তার সমগ্র ব্যক্তিত্বে। কাছারিতে পরিস্থিতি বুঝে টাকা পয়সা সেও নিত কিন্তু লোককে সাফ সাফ জবাব দিতে সে কখনও ইতস্তত করত না, পরিষ্কার বলে দিত, "প্রসিজিয়র এইরকম, আমি কি করতে পারি ?" একবার ঐ সাফ জবাব শোনার পরেও একটা লোক তার টেবিলে পাঁচ টাকার নোট রেখে যায়, জর্জ চাপরাশীকে তৎক্ষণাৎ তার পেছনে দৌড় করিয়ে নোটটা ফেরৎ পাঠায়। কে তাকে কি কারণে পয়সা দিচ্ছে এটা ঠিকঠাক না বুঝে সে একটি কানাকড়িও কারও কাছে নিত না। পয়সার তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। বাড়িতে আছে তার অবিবাহিত বড় বোন, সে পড়ায় একটি স্কুলে, সে নিজেও রোজগার করছে। ছোট ভাই সামনের বছর ম্যাট্রিক দিয়ে চাকরীতে ঢুকবে, বাবা চাকরী করেন চার্চে। মা নেই তাদের, কিন্তু পরিবারের প্রত্যেকেই যথেষ্ট দায়িত্বশীল। কিট্টীর স্বভাবটা ছিল টলমলে, জর্জের মত মনের জোর ছিল না তার। যতই পয়সা হাতে আসুক কিছুতেই যেন কুলিয়ে উঠত না তার। কার কাছে পয়সা নিয়েছে সেটাও অনেক সময় খেয়াল থাকত না। অনেক সময় বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে সে দু তরফের কাছেই পয়সা নিয়ে পকেটে ফেলেছে। 'অন্যেরাও এই করে থাকে' ভেবে মনকে বোঝাত বটে কিন্তু জর্জের দৃঢ়তার উদাহরণ চোখের সামনে দেখে মনটা ওর অশান্ত হয়ে উঠত প্রায়ই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কিট্টী ছিল হুসেনের প্রিয়পাত্র। হুসেন সবাইকার কাছে বড়াই করে প্রায়ই বলত যে কৃষ্ণজী সাহেবকে তো সেই গড়ে পিটে তৈরী করেছে।

দুই শ্রেণীর লোক পয়সা কামিয়ে থাকে। একদল কামায় নিজ অধিকারের জোরে, এটাকে তারা দৈনিক কাজের অঙ্গ হিসেবেই ধরে। আর একদল শুধু লোভের বশে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে খুশীতে নাচতে থাকে। প্রথম শ্রেণীকে পয়সা দিয়ে লোকে উপকৃত হয় আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে লোকে পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। প্রথম শ্রেণীর মানুষ টাকা নিয়ে দেনেওয়ালাকেই যেন কৃতার্থ করে আর অন্য শ্রেণী টাকা নিয়ে নিজেরাই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। 'দাতার হাত থাকে সর্বদাই উঁচুতে' এ কথাটা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের ক্ষেত্রেই খাটে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ টাকা নেয় যেন নাকে নস্যি গোঁজার ভঙ্গিতে। কিট্টীও হয়ত খেটেখুটে কারও কারও কাজ ঠিকঠাক করে দেয় কিন্তু জর্জ যখন কাজ করে দেয় তখন লোকে চিরকাল সে কথা মনে রাখে, জর্জের কোন কাজ করে দেবার জন্য তারা যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। এমনটা কেন হয় ? এ প্রশ্নটা প্রায়ই দেখা দেয় কিট্টীর মনে।

শুধু রেভেন্যু বিভাগ কেন যে কোন সরকারী দফতরে যারা কাজ করে তাদের কাছে

কোনদিন না কোনদিন কিছু না কিছু প্রয়োজনে লোককে আসতেই হয়। তাই শুধু সিনেমাওয়ালারা নয়, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি সবাই সরকারী কর্মচারীদের সর্বদা খুশী রাখতে চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারীরাও ওটা তাঁদের ন্যায্য অধিকার বলেই ধরে নেন।

এক রবিবার কিট্টীর মন মেজাজ ভাল না থাকায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। পকেটে পয়সা অবশ্য ছিল কিন্তু সিনেমা হলের সামনে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হল না, তাছাড়া পয়সা খরচ করারও ইচ্ছা ছিল না সুতরাং সে সোজা চলে গেল বক্সে ঢুকবার দরজায়। এখানকার গেটকীপার জর্জকে দেখলেই সেলাম করে, তাকে সেলাম না করুক ভেতরে ঢুকতে অন্তত দেবে এটুকু ভরসা কিট্টীর ছিল। টিকিটধারীরা সবাই ভেতরে চলে গেলে সে যেই প্রবেশ করতে যাবে, গেটকীপার বেশ কড়া গলায় প্রশ্ন করল 'টিকিট ?' কিট্টী একটু হকচকিয়ে গেল, জর্জের নাম করাটা উচিত মনে হল না। সে তাড়াতাড়ি পয়সার থলিটা বার করে একটু খোঁজাখুঁজির ভাণ করে অপ্রস্তুত ভাবে বলে উঠল, "আরে, কোথায় পড়ে গেল" তারপর কেটে পড়ল সেখান থেকে। পেছনে গেটকী-পারের বিদ্রূপভরা হাসি শুনে নিজেকে ঠিক চোর চোর মনে হচ্ছিল ওর। স্থির করল আর কখনও ঐ হলে যাবে না, কিন্তু দ্বিতীয় দিনই জর্জের আমন্ত্রণ শুনে নিজেকে সামলাতে পারল না সে। ভাবল দেখা যাক আজ ঐ গেটকীপার কি করে। এবার গেটকীপার ওকে নজরেই আনল না দেখে বড় হতাশ হল কিট্টী।

চা জলখাবার সম্বন্ধে জর্জ বড় কড়া নিয়ম মেনে চলে। প্রত্যেক দিন আপিসে বিকেল চারটের সময় সে চা পান করে, কোন কোন দিন প্রয়োজন মনে হলে দুপুরে দুটোর সময় কিছু খাবার খায়, নয়ত তাও না। কাছারিতে যারা আসে তাদের সঙ্গে সে কখনও হোটেলে যেত না। লোকে বলত, তার এই নিয়মটা খুব ভাল। আর কিছুর জন্য না, যার তার সঙ্গে গিয়ে বসতে জর্জের ভাল লাগে না বলেই সে এই নিয়মটা মেনে চলত।

তাদের বন্ধুত্বের প্রথম দিনে কিট্টী জর্জকে চা খেতে যাওয়ার জন্য টানাটানি করে, কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা আগেই চা খেয়েছে বলে এ আমন্ত্রণ কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করে জর্জ। খালি সঙ্গ দেবার জন্য শেষ পর্যন্ত কিট্টীর আগ্রহাতিশয্যে তাকে আসতেই হয় ক্যাণ্টিনে। কোন বারণ না শুনে কিট্টী দুটো স্পেশাল চায়ের অর্ডার দিয়ে বসল। তার বিশ্বাস ছিল চা এসে গেলে জর্জ অনুরোধ রাখবে। চা তো এল, কিন্তু জর্জ অবিচল। স্পেশাল চা ফেরৎ দিতেও মন চায় না আবার শুধু শুধু বাড়তি কাপের দাম দিতেও ইচ্ছা করে না, অবশেষে কিট্টীকেই খেতে হল দু কাপ চা। জর্জের এই জেদী স্বভাবের জন্য মাঝে মাঝে কিট্টীর বেশ রাগ হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে ঐ রকম জিদ যদি থাকত তবেই সে উন্নতি করতে পারত।

প্রতিদিন কাছারিতে তিন চার বার চা আর জলখাবারের পর্ব চলে এবং প্রতিবারেই কিট্টী খাবারের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করে থাকে। এই খাওয়ার লোভে বাড়ির খাওয়া আর মুখেই রোচে না। জর্জকেও সে তর্ক করে দলে টানতে চাইত কিন্তু জর্জ এসব

ব্যাপার লক্ষ্যই করে না, অথবা তার মতে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। তাই জর্জ এসব বিষয় নিয়ে কোন কথাই বলে না। কিট্টী নিজে থেকে একদিন জিজ্ঞাসা করায় শুধু বলেছিল, 'ওতে ডাইজেস্টিভ্ সিস্টেম বিগড়ে যায়।'

কিট্টী নিজের পছন্দমত এ কথার উত্তর খুঁজে রেখেছিল। সে মনে মনে বলত, বাড়ি থেকে ও কতরকম মাছ মাংস খেয়ে আসে তাই এখানকার চাকলি চিঁড়ে মুখে রোচে না।

রবিবার দিনটা কিট্টীর বড় খারাপ লাগে। কাছারির ক্যাণ্টিনও বন্ধ, আমদানীও বন্ধ থাকে। এক রবিবার কিট্টী বাড়ির কাছে এক চেনা হোটেলে গিয়েছিল। বয় স্পেশাল চা নিয়ে আসতে কিট্টী সাহেব হুকুম করলেন, "এক টুকরো চাকলিও আনো।" বয় প্রশ্ন করল, "এক প্লেট চাকলি আনব?" কিট্টী বলল, "আরে না না; চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য একটা টুকরো নিয়ে আয়।" বয় সোজা গিয়ে হোটেল মালিককে বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠল, "ঐ সাহেব চায়ের সঙ্গে একটু চাকলি চাইছেন।" উপস্থিত সকলেই ফিরে তাকাল কিট্টীর দিকে। মালিক একটু মুচকি হেসে বললেন, 'দিয়ে দাও।' কিট্টীর সামনে যখন চাকলির টুকরো এসে পৌঁছল ততক্ষণে সেটা বিস্বাদ হয়ে উঠেছে।

সুখ পেতে হলে লজ্জা ত্যাগ করতে হবে, এ তত্ত্বটি ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো এত সহজ নয়।

জর্জের বন্ধুবান্ধব বড় কম, কিন্তু কিট্টীকে সে সত্যিই ভালবাসে। বন্ধুত্ব এখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে উঠেছে তাই জর্জের খুব ইচ্ছা তার প্রণয়িনীর সঙ্গে কিট্টীর আলাপ করিয়ে দেয়। বিয়ে অবশ্য এখনও একেবারে ঠিক হয়ে যায়নি কিন্তু তবু জর্জের মনে এ বাসনা দিন দিনই বলবতী হয়ে উঠছে।

এই প্রেমিকা জর্জের জীবনে এক বিরাট জয়ের স্বাক্ষর। সারা এক পাদরীর কন্যা, শহরের প্রটেষ্ট্যাণ্ট সমাজের মধ্যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, ষষ্ঠ স্ট্যাণ্ডার্ডের ছাত্রী এবং আগামী বছর ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরীতে ঢুকবে এই কারণেই তার খ্যাতি আরো বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক পাত্রই এ পর্যন্ত সারার পিতার কাছে এসে সারার পাণিপ্রার্থনা করেছে, ম্যাঙ্গালোরের এক তরুণ পাদরীও আছেন তাদের মধ্যে। কিন্তু স্থানীয় ছেলে বলে সারার পিতা জর্জকে ভালভাবে চিনতেন। একদিন তিনি জর্জকে ডেকে এই বিবাহ সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। জর্জের পরিবার এমন অসম্ভব সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করেনি তাই আনন্দের সীমা রইল না তাদের। ম্যাঙ্গালোরের পাদরীর প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে জর্জকে কন্যাদান করার প্রস্তাব নিঃসন্দেহে এ পরিবারের পক্ষে চূড়ান্ত গর্বের বিষয়।

সারাও বেশ খুশীমনেই এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। প্রায় দেড় বছর ধরে কোর্টশিপ গরীবের ঘরে যেটা বেশ দুর্লভ বস্তু, তারও সুযোগ পাওয়া গেছে। প্রেয়সীর রূপ

জর্জের বড় গর্বের বিষয়। বন্ধু তার বিশেষ নেই, কিন্তু কিট্টীর কাছে অন্তত এ কথাটা জানাতে না পেরে সে ছটফট করছিল। একদিন আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল 'আগামী বছর আমার বিয়ে, পাদরীর মেয়ের সঙ্গে। সে ভারি রূপসী। একদিন আমার সঙ্গে চল পাদরী সাহেবের ওখানে তাহলে তোমার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেব।" সুন্দরী মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছা কিট্টীরও কম নয়, কিন্তু পাদরীর বাড়িতে যেতে তার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। তাছাড়া আজকাল অনেক ব্যাপারেই কিট্টী বাড়িতে চেপে যায় বটে কিন্তু খ্রিশ্চান বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আসতে ওর বেশ ভয় হচ্ছিল। জর্জের বাড়িতে তার পীড়াপীড়িতে ও শুধুমাত্র চা খেয়েছে কয়েকবার। জর্জের এ নিমন্ত্রণ ও দু তিনবার নানা অজুহাতে কাটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু জর্জ এবার এক নতুন উপায় খুঁজে বার করেছে।

একদিন দুজনে সিনেমায় গেছে, সেখানে দেখা গেল সারাম্মা মেয়েদের জায়গায় বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। এদের দেখে সে উঠে এল। জর্জ জিজ্ঞাসা করল, "অনেকক্ষণ এসেছ না কি?" সারা বলল "না তো।" এরপর কিট্টীর সঙ্গে পরিচয় পর্ব। জর্জ বলল, "ইনি আমার কলিগ্ কৃষ্ণজী কুলকর্ণী...আর ইনি সারা ডিসুজা, আমার বাগ্‌দত্তা। কিট্টী এদিকে তখন লজ্জায় প্রায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তিনজনে দোকানে গিয়ে চা বিস্কুট খাওয়া হল। জর্জ সারাকে নিজের বন্ধুর বিষয় আগেই বলেছে। এখন সারার সামনে জর্জ আর কি বলবে ভেবেই পাচ্ছে না। সারা এদিকে জর্জের এই লাজুক বন্ধুটিকে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। কিট্টীকে অবশ্য সারা সম্বন্ধে অনেক খবরই জানানো হয়নি তাই জর্জ এখন সারার বাবার কথা, স্কুলে সারার কি রকম সুনাম, হাউস্ কিপিং আর এমব্রয়ডারীতে তার কত অনুরাগ এই সব বিষয় বিশদভাবে কিট্টীকে শোনাতে আরম্ভ করল। তার হাতে পরানো বাকদানের আংটিটি দেখিয়ে জানাল সে কিভাবে নিজেই আংটির ডিজাইন পছন্দ করে কোন দোকান থেকে গড়িয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সারা মাঝে মাঝেই বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিচ্ছিল কিট্টীর দিকে, তার মান রাখতে কিট্টীও বিস্কুট তুলে নিচ্ছিল এক আধখানা।

জর্জ যতটা বলেছিল কিট্টীর কিন্তু ততটা কিছু রূপসী বলে মনে হল না সারাকে। অবশ্য এটা ঠিক যে সুখ এবং স্বাস্থ্যের লাবণ্যে মেয়েটির মুখ ঝলমল করছে। মাথায় বেশ লম্বা মেয়েটি এবং মুখে এখনও ছেলেমানুষী ভাবটা আছে। একটি হলুদ রঙের ফ্রক পরেছে, মাথায় লাল রিবন বাঁধা তাছাড়া চুলের এদিক ওদিক কয়েকটা ক্লিপও লাগিয়েছে। নিজে থেকে কথা বলেনি, যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর দিয়েছে, বাকি সময় চুপ করে বসে জর্জের কথা শুনছে, ঠোঁটের ওপর লেগে রয়েছে সম্মতিসূচক মৃদু হাসির আভাস।

সারা সিনেমা যেতে চাইল না। ওর বাবা অন্য শহরে পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কাজে যাবেন তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ওকে রাত্রের রান্না সারতে হবে! সেই বাড়ির গৃহিনী। পাদরীর স্ত্রী মারা গেছেন ছ বছর আগে। বিয়ের পর জর্জও থাকবে পাদরী সাহেবের

সঙ্গে। এত তাড়াতাড়ি সারাকে ফিরতে দেবার ইচ্ছা না থাকায় জর্জ ওকে নিয়ে চলল বাজারে। কিট্টী পড়ল মুস্কিলে। ওদের ছেড়ে চলে আসাটাও উচিত মনে হচ্ছে না আবার সঙ্গে যেতেও লজ্জা করছে। কাজেই সে এদের সঙ্গে প্রায় এক গজ তফাতে পিছু পিছু চলল। জর্জ আর সারা নিজেদের মধ্যে কি কথা বলবে তাই ভেবে পাচ্ছে না এর ওপর কিট্টীকেও আলাপের মধ্যে টেনে আনা তো আরোই কঠিন কাজ। ফলে পথের মধ্যে যেন এক মূক অভিনয় চলছিল ওদের মধ্যে। দোকান থেকে সারার জন্য কেনা হল রিবন, লেস্, রুমাল, চিরুণী ইত্যাদি ছোটখাট জিনিস। জিনিসগুলি সব কাগজের বাক্সে ভরে রিবন দিয়ে বেঁধে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য জর্জ চলল সারার সঙ্গে। এই শোভাযাত্রার পেছন পেছন আর যাওয়াটা ঠিক হবে না বুঝে কিট্টী এবার সব্জী কেনার অছিলায় অন্য পথে চলে গেল। সে রাত্রে কত যে স্বপ্ন দেখল কিট্টী, রত্নাকেও যেন সে ঐ রকম সারা শহর ঘোরাচ্ছে, তার চুলে ফুল পরাচ্ছে, দোকানে নিয়ে গিয়ে চুড়ি কিনে দিচ্ছে, আরো কত কি। ঐ সারাকে দেখেই মুগ্ধ জর্জ রত্নাকে দেখলে না জানি কি বলবে, এই সব বোকার মত চিন্তাও মনে এল। ঘুম আসতে আসতে বাজল রাত বারোটা।

সৌন্দর্য শব্দটা জর্জ যে অর্থে প্রয়োগ করেছিল তার মানে বুঝতে কিট্টীর এখনও বহু সময় লাগবে।

14. কিট্টীর প্রেম

রাঘপ্পার বাড়ি কিট্টীর কাছারি থেকে দূর নয়। কিট্টীকে, যখন খুশি এ বাড়িতে এসে চা জলখাবার খেয়ে যাবার স্থায়ী নিমন্ত্রণ রাঘপ্পা করেই রেখেছে কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। তাই এবার দেওয়ালীর আগে, অর্থাৎ ভূত চতুর্দশীর দিন সে কিট্টীকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করল। সেদিন কিট্টী ছাড়া আর কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। কিন্তু তাতে কি, পাড়ার অন্তত বারো তেরোটি মেয়ে রত্নার ভাবী বর দেখার জন্য এ বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। এই প্রমীলার রাজ্যে কিট্টীর খুব একটা মন্দ লাগছিল না। মেয়েরা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিল যেন রত্নার সঙ্গে তার বিয়ের কথা একেবারে পাকা হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একটি লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এবং প্রগলভা মেয়ের হাতে কিট্টীকে বেশ নাকাল হতে হল। সে যখন বৈঠকখানা ঘরে এসে বসেছে তখন থেকেই ঐ মেয়েটি তার প্রমীলা বাহিনী নিয়ে দরজার কাছ থেকে চোখ বড় বড় করে কিট্টীকে দেখছিল এবং পরস্পরকে চিমটি কেটে ইশারা ইঙ্গিতও চলছিল মেয়েদের মধ্যে। অবশেষে সেই প্রগলভা গোদাবরী আরো এক ধাপ এগিয়ে এল,-

তার লম্বা মজবুত হাতের বাঁধনে রত্নাকে টেনে আনল দরজার সামনে, বলল, "আপনি চটছেন না তো ? এ আপনাকে এখনও ভাল করে দেখেনি তাই দেখাবার জন্য টেনে আনলাম।" এই টানাটানি আর হাসিঠাট্টায় রত্নার গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে, আনত আঁখির কোলে এক বিন্দু জল এসে জমেছে, এই বুঝি ঝরে পড়ে। এক ঝলক কিট্টীর পানে চেয়েই সে ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল। প্রগলভা মেয়েটির বয়স প্রায় ষোল, কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি, সেজন্য তার বিন্দুমাত্র চিন্তাও নেই। ছেলেমানুষী এখনও তার যায়নি। অন্য কারও বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে দেখলেই দুষ্টুমির মাত্রা ওর আরো বেড়ে যায়।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে। কিট্টীর জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত আরতি এতক্ষণ আটকে ছিল এবার রাঘপ্পা এসে পৌঁছতেই শুরু হল আরতির কাজ। গোদাবরী গম্ভীর ভাবে ডাক দিল, "এদিকে আয়, তোকে দিয়েই আরতি করাব।" রত্না তাই শুনেই পালিয়েছে আর গোদাবরী ছুটেছে তাকে ধরতে। রত্নার মহা আপত্তি, গোদাবরী রেগে ওকে চিমটি কাটল। অন্দরে মাও মেয়ের পক্ষ না নিয়ে বরং রাগ করেই বললেন, "বন্ধু ডাকছে, যা না, তুই তো বাড়িরই মেয়ে।" নিরুপায় হয়ে রত্না নিয়ে এল আরতির থালা। গোদাবরীও এল সঙ্গে। আরতির গান কে গাইবে ? গোদাবরী মেয়ের দলকে কড়া হুকুম জারি করল, "কেউ গাইবে না, রত্নাকেই গাইতে হবে।" সবাই একদম চুপ, বাধ্য হয়ে রত্নাকে গান শুরু করতেই হল। সে ধরল মহবুবের কাছে শেখা গান, "কৃষ্ণ নীনু বেগনে বারো।" মহবুব যেমন শিখিয়েছে গায়নের মূল পদ্ধতি অনুসারে পদের আরম্ভেই কৃষ্ণ শব্দ সম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়, শেষের দিকে 'ণ' অস্পষ্ট থেকে যায়, সেইভাবেই গান শুরু করেছে রত্না। কিট্টীর মনে হল গানে বুঝি তাকেই সম্বোধন করা হচ্ছে, লজ্জায় সে মাথা নিচু করে ফেলল। ব্যাপারটা বুঝে মেয়েরা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছে। রত্না প্রথমটায় কিছু খেয়াল করেনি, দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয়বার গাওয়ার সময় হঠাৎ বুঝতে পেরে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গলা কেঁপে গেল, 'কৃষ্ণ' শব্দ এবার আর সে গাইতেই পারল না, কৃষ্ণের কৃ-টুকু শুরু করেই হেসে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওদিকে মেয়ের দল হেসে লুটোপুটি।

কিট্টীও লজ্জায় তাকাতে পারছে না, সে অপ্রস্তুত হয়ে ঘরের অন্য কোণে দৃষ্টি ফেরাল, কিন্তু সেদিকেও দেখে হাসি আর চোখের জলে মাখামাখি একখানি মুখ। সে মুখ চম্পকার।

জলখাবার খাওয়াতে বসিয়ে গোদাবরী অন্য মিষ্টির সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করল লঙ্কার গুঁড়ো ভরা মিষ্টি। হাসির খোরাক জোগাতে কিট্টী কখনও কসুর করে না তাই এ অবসরও বৃথা গেল না। কিট্টীর কেবলই মনে হতে লাগল এ মেয়েগুলোর পাল্লায় না পড়লেই হত। জলখাবার পর্ব শেষ হতে পানসুপারি নিয়ে রাঘপ্পা বার হল কোন কাজে, কিন্তু যাবার সময় কিট্টীকে বলে গেল "এখানেই খেয়ে যাবে, আমি এখনই ফিরে আসছি।" বর্তমান পরিস্থিতিতে দিশাহারা হয়ে যাওয়া কিট্টীর মুখে চট করে আপত্তি

জোগাল না। তাছাড়া মনে আশা ছিল রত্নার সঙ্গে আবার হয়ত দেখা হবে। রত্না একটু পরেই এল এবং সলজ্জভাবে দু খিলি পান তার সামনে রেখে গেল। কিট্টী তুলে মুখে পুরল বড় খিলিটি এবং সেটাই ছিল লঙ্কার গুঁড়ো ভরা। মেয়েরা শেষবারের মত প্রাণভরে হেসে নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। এবার রাঘপ্পার প্রতীক্ষায় কিট্টী বসে রইল একেবারে একা।

বৈঠকখানা ঘরে একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত নেই। আধঘণ্টা একলা বসে বসে কিট্টীর উৎসাহ ঝিমিয়ে এল। সে উসখুস করতে শুরু করল, বাড়ি এবং মায়ের কথাও মনে পড়েছে এতক্ষণে।

সেদিন গঙ্গব্বা ভোর পাঁচটায় কিট্টীকে ডেকে তুলেছে। পনেরো বছর ধরে যত্ন করে তুলে রাখা আতরের শিশি থেকে দু ফোঁটা সুগন্ধী মেশানো হয়েছে তেলের বাটিতে। এবার দেওয়ালী উপলক্ষ্যে বাড়িতেই কিট্টীর আরতি করা গঙ্গব্বার একান্ত ইচ্ছা। যে বছর স্বামীরায় মারা গেলেন সেবার বাড়িতে শোক পালন করতে হবে তাই আরতির জন্য কিট্টীকে দেসাঈ-বাড়ি পাঠান হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ঐ ব্যবস্থাই চলে আসছিল। এবারেও দেসাঈজীর বাড়ি কিট্টীকে যেতেই হবে। চাকরী করে অহঙ্কার বেড়েছে একথা ওঁরা বলবার সুযোগ না পান সেটা দেখা উচিত, কিন্তু গঙ্গব্বার ইচ্ছা ওখানে পাঠাবার আগেই ভোরবেলা বাড়িতে চুপচাপ আরতিটা সেরে নেয় তাই প্রতিবেশী কাশীর মাকে তার ছ'বছরের ছেলে আর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ই আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। তারা এল যথাসময়ে এবং আরতির গানও গাইল। কিট্টীকে আরতি করে তার ললাটে পরানো হল তেল কুমকুমের টিপ। কিট্টীর হাত দিয়ে গঙ্গব্বা সেদিন গরীব কাশীর মায়ের আরতির থালায় একটি টাকা দান করল। পনেরো বছর পরে নিজের বাড়িতে এই প্রথম আরতি, চোখে জল আসছিল গঙ্গব্বার। সবারই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। জল-খাবার দিতে দিতে কাশীর মা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল গঙ্গব্বাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঙ্গব্বা যেন কিছুতেই সামলাতে পারল না নিজেকে। রান্নাঘরের চৌকাঠ চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। তখন কাশীর মাও আঁচল তুলল চোখে। কাশীর মায়ের আধপাগল স্বামীও তখন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলছিল 'কেঁদ না মা, কেঁদ না।' কিট্টী কোনরকমে কান্না চেপে বসেছিল চুপ করে।

এরপর দেসাঈজীর বাড়িতে আরতি হয়েছে যথানিয়মে। সকালবেলার ঘটনা তখনই কিট্টীর মন থেকে প্রায় সরে গেছে। সন্ধ্যায় রাঘপ্পার বাড়ির হৈ হল্লায় সে কথা তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এখন একলা বসে বসে সকালবেলার সমস্ত ছবিখানি যেন ভেসে উঠল তার চোখের ওপর। মনটা কেমন অস্থির হয়ে পড়ল ওর। বাড়িতেও তো আজ পূজো, মা পথ চেয়ে বসে আছে, কত কি রান্না করেছে হয়ত। আর থাকতে পারল না কিট্টী, উঠে পড়ল। চম্পক্কাকে গিয়ে বলে দেবে, "আজ বাড়িতেও পূজো, এখানে খাওয়া সম্ভব হবে না।" দ্রুতপদে ও ঢুকল গিয়ে চম্পক্কার ঘরে।

ঘরে চম্পকা নেই, রয়েছে রত্না। দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া একটা বড় আয়নার সামনে বসে সে তার ফুরফুরে ঈষৎ পিঙ্গল চুলের গোছা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর মুগ্ধ হয়ে দেখছে নিজের অপরূপ সৌন্দর্য। তার পিঙ্গলবর্ণের নরম চুলের রাশি ভারি সুন্দর। নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে সে একবার ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তেরছা নজরে দেখতে লাগল নিজেকে।

কিন্তু কিট্টীর তখন এ সব লক্ষ্য করার মত ধৈর্য নেই, সাড়া দেবার জন্য সে আস্তে কাশল। রত্না ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তখনই চুলের গোছা সামলে একপাশে সরে গেছে। কিট্টী সসঙ্কোচে জানাল, "আমি বাড়িতে গিয়েই খাব।" যতই লাজুক মেয়ে হোক, না খেয়ে যাওয়ার কথা শুনে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়, তাই সে বলে উঠল, "এখানেই খেয়ে যান।"

কিট্টী ব্যঙ্গ করে বলল, "খুব যে জোর ফলানো হচ্ছে দেখছি।"

পনেরো বছরের সরলা কিশোরী এ ব্যঙ্গের মানে বুঝল না, বলল, "কেন, আমাদের বাড়িতে খেয়ে যাবার কথা আমি জোর করে বলতে পারি না বুঝি ?"

কিন্তু কিট্টী ওকে না বুঝিয়ে ছাড়বে না, "আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছে তা জানো ?"

নীরসভাবে জবাব দিল রত্না, "সে তো সবাই জানে।"

"পানের খিলির মধ্যে যে লঙ্কা খাওয়ায় তাকে কি বিয়ে করা উচিত ?"

"আমি দিইনি, বোধ হয় গোদাবরী ভরে দিয়েছিল, আমি জানতামই না।"

"যেই দিয়ে থাকুক আমার তো মুখ জ্বলছে", কথাটা বলেই কিট্টী তাকাল ওর লাল টুকটুকে ঠোঁটের দিকে।

"সেই জন্যই তো খেয়ে যেতে বলছি। করি কুড়ুবু[1] তৈরী হয়েছে।"

"তোমার বাবা তো বিয়ে দিতে রাজী কিন্তু তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে ?"

রত্না এবার কথাটা বুঝল, একটু ভেবে জবাব দিল, "আমার কথা বাদ দিন। আপনার মা কি বলেন আগে জেনে নিন। তিনি যা বলবেন তাই তো আপনাকে করতে হবে ?"

এখানেও যে মায়ের প্রসঙ্গ উঠতে পারে এটা কিট্টী ভাবে নি, সে একটু মিইয়ে গেল। অমন মধুর রসালাপকে একেবারে নিরেট গদ্যের স্তরে নামিয়ে আনতে পারে যে মেয়ে তার মনোভাবের নাগাল পেতে ওর সময় লাগছিল। ইতিমধ্যে চম্পকা এসে পড়ায় আলাপ ঐখানেই থামাতে হল। কিট্টী চম্পকাকে বলল, "আজ পূজোর দিন, আমি বাড়ি গিয়েই খাব।"

"কেন ? এটা বুঝি বাড়ি নয় ?" চম্পকার প্রশ্ন।

"না, তা নয়, আসলে মা পথ চেয়ে বসে আছে। আবার একদিন আসব।"

---

1. চালের গুঁড়ো ও তিল দিয়ে তৈরী মিঠাই।

"তা হবে না, রান্না হয়ে গেছে, উনি এলেই খাবার দেব।"

বলতে বলতেই রাঘপ্পা এসে হাজির। চম্পক্কা তাকে কিট্টীর কথা বলতেই সে কিট্টীকে আর মুখ খুলতেই দিল না, "ছি ছি, কিট্টীণা, আমি কি তোমার পর? আমাতে আর তোমার মাতে তফাৎটা কোথায়? দুটো তো তোমারই বাড়ি। এতদিনে যদি এসেছ, আজ না খাইয়ে ছাড়তেই পারি না। কতবার চা খেতে ডেকেছি, তুমি তো আসই না। আবার কবে আসবে তার ঠিক নেই। এসো এসো, বসে পড়ো।"

উপায়ান্তর না দেখে খেতে বসল কিট্টী। খেতে বসে রাঘপ্পা অনেক মজার মজার গল্প শোনাল কিন্তু কিট্টীর তখন রসগ্রহণ করার মত মনের অবস্থা নেই। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে সে জোর কদমে চলল বাড়ির পথে। সে রওনা হয়ে যেতেই রাঘপ্পা স্ত্রীর দিকে ফিরে মুচকি হেসে মন্তব্য করল, "আজ যা একখানা চোট দিয়েছি, গঙ্গার খুব গায়ে লাগবে।" স্ত্রী নির্বিকার ভাবে শুনে গেল কোন মন্তব্য করল না।

কিট্টীর বাড়ি পৌঁছতে একটা বেজে গেল। গঙ্গব্বাও কুডুবু তৈরী করেছে, তারপর থেকে সমানে ঘর বার করছে, কয়েকবার বাড়ির কাছের বাজার পর্যন্ত দেখে এসে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসেছিল। কিট্টী হুড়মুড় করে বাড়ি ঢুকতেই সে বলে উঠল, "কত দেরী করলি? খাবার ঠাণ্ডা হয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

"আমি খেয়ে এসেছি, এক বন্ধুর বাড়ি কিছুতে ছাড়ল না, জোর করে খাইয়ে দিল। তুমি খেয়ে নাও মা।"

"ও মা, এত সব রাঁধলাম, কিট্টণা এই আসে, এই আসে...করে সমানে পথ দেখছি, আর তুই কিনা খেয়ে এলি? কে খাওয়াল শুনি? সবার বাড়িতেই আজ পূজো সে কথা কি তারা জানে না? খুব বন্ধু জুটেছে তোর।" দুঃখ করতে করতে হঠাৎ কি মনে হল, চকিতভাবে, প্রশ্ন করল গঙ্গব্বা, "কিট্টী কোথায় গিয়েছিলি সত্যি কথা বল তো? রাঘুর বাড়ি গিয়েছিলি তাই না?"

এতক্ষণ মায়ের জন্য মনে যেটুকু সহানুভূতি জন্মেছিল তা উড়ে গেল ঐ শেষ কথাটা শুনে। রূক্ষস্বরে কিট্টী বলল "হ্যাঁ।"

"তাই বল। যাক্ যা হবার হোক, মেয়েমানুষের জন্মই তো কাঁদবার জন্য, সহ্য করতেই হবে।" বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে গঙ্গব্বা নিজের ভাত বেড়ে নিল। তীব্র মনোকষ্টে তখন ওর মাথা ঘুরছে। দু গ্রাস গলা দিয়ে নামাতে ওকে চার গেলাস জল খেতে হল, আর একটু খেতে না খেতে উঠে গিয়ে হুড়হুড় করে বমি করে ফেলল নর্দমার কাছে। যা খেয়েছিল সব বেরিয়ে গেল, সারা মুখ তেতো বিস্বাদ।

মায়ের বিবেচনার অভাব দেখে বিরক্ত লাগছিল কিট্টীর কিন্তু এখন অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়তে দেখে ওর বড় দুঃখ হল। এতক্ষণ চুপ করে দেখে এবার কাছে এসে ব্যগ্রভাবে বলল, "মা দিনে তো একবার মাত্র খাওয়া, আর একটু খেয়ে নাও না? রাত্রে তো আর খাওয়া হবে না তোমার।"

কিট্টীর মুখে এমন মিষ্টি কথা গত দু বছরে শোনা যায়নি। ঐটুকুতেই মায়ের মন গলে গেল। "তা কি হয় রে ? আমাদের একবারই মাত্র খেতে বসতে আছে। খিদে পায় তো রাত্রে একমুঠো চিঁড়ে খাব এখন" এই বলে এঁটো বাসন মাজতে বসল গঙ্গব্বা। গরম ছাই-এর মধ্যে সযত্নে রাখা পিতলের কৌটোয় ভরা কুড়ুবু যেন বিদ্রূপ করছিল ওকে।

15. দেসাঈজীর চেষ্টা

গঙ্গব্বা এবার দেসাঈজীর ঘাড়ে এক মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে সে শুনিয়েছে তাঁকে। পূজোর দিনে কিট্টীকে বাড়িতে না খেতে দিয়ে রাঘপ্পা গঙ্গব্বার মনে গভীরভাবে আঘাত করেছে। কিন্তু যা হয়েছে ভালই হয়েছে, এতে বরং সাবধান হবার সময় পাওয়া গেছে। এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার আগেই কিট্টীর জন্য অন্য পাত্রী খুঁজে বার করা দরকার।

"আমি ভাবছিলাম, এই তো সবে চাকরীতে ঢুকল আর একটু গুছিয়ে নিক তারপর বিয়ে দিলেই হবে, কিন্তু এখন কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হচ্ছে রাঘু নিজের কাজ প্রায় হাসিল করে এনেছে। ও কিছু খাইয়েও দিতে পারে। ভাইয়া, সত্যি বলছি আমার বড় ভয় করছে, এতদিন ভাবতাম কিট্টী তো আমারই নিজের ছেলে...যাক সে সব কথা। এখন যেমন করে পার একটি মেয়ে খুঁজে দাও। যাই হোক না কেন, কথা পাকা করে আমি বিয়ে দিয়ে ফেলব।"

দেসাঈজীর কাছে কিট্টীর জন্য অনেক সম্বন্ধই এসেছিল, কিন্তু গঙ্গব্বা কখনও কথা তোলে নি বলে তিনিও চুপ করেই ছিলেন। তাঁর এক গরীব বন্ধু ছিল দুন্দুরু শিবপ্পা। এই শিবপ্পার পনেরো বছরের মেয়েটিকে দেসাঈজীর বেশ পছন্দ হয়েছিল। রং ময়লা হলেও মেয়েটির মুখশ্রী সুন্দর এবং স্বাস্থ্যও ভাল, সংসারের কাজকর্মেও পটু। মেয়েটিকে নিলে গঙ্গব্বা সুখী হবে। দেসাঈজীর প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল এ সম্বন্ধটি গ্রহণ করা উচিত। এতে গরীব বন্ধুও উপকৃত হবে। তিনি মেয়েটির সম্বন্ধে গঙ্গব্বাকে বিস্তারিত ভাবে বললেন ; শুনে গঙ্গব্বা তো তৎক্ষণাৎ রাজী। দুন্দুরু শিবপ্পা খুব গোঁড়া এবং কর্মঠ ব্রাহ্মণ। গরীব হলেও সম্ভ্রান্ত এবং উদারচেতা ব্যক্তি। বাড়িতে অগ্নিহোত্র করে এবং সে নিজেও বেদান্ত। এ সব শুনে গঙ্গব্বা খুব খুশী। দেসাঈজীর কাছে রাখা জন্মপত্রিকা বার করে মিলিয়ে দেখা গেল ঠিকুজিও মিলছে। দুন্দুরু শিবপ্পাকে মেয়ে দেখাবার জন্য সপরিবারে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে দেসাঈজীকে দিয়ে চিঠি লেখাল গঙ্গব্বা।

রবিবার দিন সকাল থেকেই গঙ্গব্বা দেসাঈজীর বাড়ি যাওয়া আসা করছে। কি ব্যাপার সেটা মাথায় আসছে না কিট্টীর। অবশেষে বেলা দশটা নাগাদ ও-বাড়ি থেকে কিট্টীর

ডাক এল। দেসাঈজীর বাড়ি থেকে কেউ ডাকতে এলে মা আগেই সব কাজ ফেলে ছুটে আসে, কিন্তু আজ যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে রান্নাঘরে বসে বাসনপত্র নাড়ছে। কিট্টী ইদানীং দেসাঈজীর বাড়ি বিশেষ যায় না, ডেকে পাঠালে তবেই যাওয়া হয়। প্রতি বছরের মত দেওয়ালীর দিন অবশ্য গিয়েছিল কিন্তু দেসাঈজী ওর সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন নি। বসন্তরাওয়ের প্রসঙ্গ পাছে ওঠে সেই ভয়ে দেসাঈজী আজকাল লোকজনের সঙ্গে কথা কম বলেন। আজ হঠাৎ কেন ডাক পড়ল ভাবতে ভাবতে চটিটা পায়ে গলিয়ে, মাথায় কিছু না দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ছিল, হঠাৎ মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "দেসাঈজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস টুপীটা মাথায় দিয়ে যা।"

শিবপ্পার পূজোপাঠ তখনও শেষ হয়নি। বৈঠকখানা ঘরে দেসাঈজী কিট্টীকে আদর করে ডেকে বসালেন। দু চারটে এদিক ওদিক কথাবার্তার পর এলেন আসল কথায়, "দুন্দুরু শিবপ্পা আমার পুরানো বন্ধু, সম্ভ্রান্ত পরিবার, এঁর মেয়েটিও বড় ভাল, তোমার সঙ্গে এর সম্বন্ধ করা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা...।" কথার মাঝখানেই কিট্টী বলে উঠল, "এখন বিয়ে করার আমার ইচ্ছাই নেই।"

"তোমাদের তো কখনই ইচ্ছা থাকে না। তাছাড়া বিয়ের কথা তোমাদের ভাববারও দরকার নেই। ওটা গুরুজনদের ব্যাপার। মেয়ে দেখে পছন্দ করার কাজটা শুধু তোমাদের।"

"কিন্তু গোপন্নাজী, চাকরী পাকা না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করতে চাই না...।"

"হ্যাঁ সে তো ঠিক কথাই। বিয়ের আগে এ সব কথা তো ভাবতেই হয়। তবে মেয়ে দেখে কথাটা পাকা করে রাখতে দোষ কি? চাকরী তো কিছুদিনের মধ্যেই পাকা হয়ে যাচ্ছে।"

"এখন দেখেই বা কি লাভ?"

দেসাঈজীর সামনে এই প্রথম কিট্টী এভাবে কথা বলছে। সে যে এতটা দৃঢ়ভাবে মতামত জানাতে পারে এটা দেসাঈজী আন্দাজ করতে পারেন নি। তিনি একটু চটেই বললেন, "না দেখতে চাও দেখো না। বেচারা গরীব ব্রাহ্মণ রেলভাড়া দিয়ে এসেছেন, দেখার ব্যাপারটা চুকে গেলে একটা কাজ হয়ে যেত এই আর কি। তারপর তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কোর।"

দেসাঈজী রেগে গেছেন দেখে কিট্টীর আর মুখ খুলতে সাহস হল না, বিড় বিড় করে প্রায় নিজের মনেই বলল, "বলছেন যখন, ঠিক আছে দেখব।"

এখনকার মত কাজ হয়েছে দেখে দেসাঈজী নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়লেন।

এতক্ষণে পূজোপাঠ সমাপ্ত করে বিভূতিমণ্ডিত খালি গায়ে বাইরে এলেন শিবপ্পা, বৈঠকখানা ঘরের যে কোণটায় সতরঞ্চি বিছানো নেই সেখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সাবধানে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বসে পড়লেন। দেসাঈজী পানের ডিবে থেকে দুটি পান একটু সুপারি ও তামাকের কৌটো এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। হাতে পূজার আংটি, কপালে ত্রিপুণ্ডক, গলায় রুদ্রাক্ষধারী খর্বকায় চেহারা। দেখে কিট্টীর কিছুটা শ্রদ্ধা হল বটে কিন্তু

এঁকে শ্বশুর বলে স্বীকার করতে হলে নানা রকম অসুবিধা হবে এটাও মনে হল তার। প্রথমত এই ত্রিপণ্ড্রকধারীর সঙ্গে তহসিলদারের পরিচয় করানো অসম্ভব, বড় জোর তাঁর কুলদেবতার সঙ্গে এঁর পরিচয় চলতে পারে। তারপর, এই টিকি ও কৌপীন-ধারীর সঙ্গে তো রাস্তায় বার হওয়াই মুস্কিল হবে। এঁরই যখন এই রকম শ্রী তখন এঁর মেয়ে কে জানে কেমন হবে। কোথায় ইনি, আর কোথায় গৌরবর্ণ ছ'ফুট দীর্ঘ ম্যান-চেষ্টারের ধুতি পরিহিত রাঘপ্পা !

দেসাঈজী উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন সংক্ষেপে। শিবপ্পা অকারণ বাজে কথা বলতে ভালবাসেন না, সোজা চলে এলেন আসল কাজের কথায়। বললেন, "এই মুহূর্তে আপনি কাউকে খাওয়াবার কথা বলুন, দেখতে দেখতে একলা হাতে সব করে ফেলবে, এই একটি কথা আমি গর্ব করে বলতে পারি। বাকি সব আপনারা দেখে নিন।" তারপরেই হাতে তালি বাজিয়ে ডাক দিলেন, "কৃষ্ণা, এদিকে আয় তো মা।"

মা এবং ভাইবোনেদের পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করল কৃষ্ণা। শিবপ্পার একটা বিষয়ে বড় গর্ব ছিল, বললেন, "দেখুন আমার পরিবারে সবাই কালো, তাই ওদের নামও দিয়েছি সেই অনুসারে ; এ হল কৃষ্ণা, এর পরেরটি কালিঙ্গ, তারপর শ্যামলা আর ঐ কোলের ছেলেটি ঘনশ্যাম। এদের মধ্যে কৃষ্ণাই সবচেয়ে কম কালো।" শিবপ্পার ছেলেমেয়েরা সারি বেঁধে বসে গেল সতরঞ্চির ওপর। নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনেই ঘনশ্যাম মায়ের কোল থেকে হাত বাড়াতে শুরু করেছে বাপের দিকে। পাছে বাবাকে ছুঁয়ে দেয় এই ভয়ে শ্যামলা তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। মহিলাদের একটি ছোটখাট দল উঁকি মারছিলেন দরজার আড়াল থেকে তাঁদের মধ্যে সামনেই বেণুবাঈ। কৃষ্ণাকুমারী দেওয়াল ঘেঁসে পা মুড়ে বসেছিল মুখ নত করে। বেণুবাঈ দরজার পাশ থেকেই বলে উঠলেন, "দেখ বাপু, তুমি তো কৃষ্ণ, আর এটি কৃষ্ণা, এমন জুটি আমাদের তো খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার মা সকালেই এসে দেখে খুব খুশী হয়ে গেছে।" কিট্টী কিন্তু এ কথার কোন উত্তর দিল না। সবাই একেবারে চুপচাপ। অবশেষে দেসাঈজীই দু একটা প্রশ্ন করলেন।

"তোমার নাম কি ? কতদূর পড়েছো ? গান জান কিনা", এই সব প্রশ্ন। মেয়েটি একটি ভজন গেয়ে শোনাল। খুব মিষ্টি গলা না হলেও বেসুরো নয়। দেসাঈজী আর বেশী প্রশ্ন না করে কৃষ্ণাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। সবাই ভাবল দেখাপর্ব ভালভাবেই হয়ে গেছে। শিবপ্পা কিট্টীকে শুনিয়েই দেসাঈজীকে বললেন, "আমার যতদূর সাধ্য সেইভাবেই কাজ করব এবং 'বরদক্ষিণা' দেব এক হাজার টাকা।

"ভাল কথা, কিন্তু বিয়ে আমি এখন করতে চাই না," কথাটা কিট্টী এত নীচু গলায় বলল যে দেসাঈজী ছাড়া আর কারও কাছে তা পেঁছিল না। এই পরিবেশে আর কথা বাড়ানো উচিত বলে তাঁর মনে হল না। দরজার আড়ালে দাঁড়ানো গঙ্গব্বার দিকে ইশারা করে তিনি জলখাবার দিতে বললেন। সেদিনকার অনুষ্ঠান এইভাবেই শেষ হল এবং কিট্টীরও বাড়ি যাবার অনুমতি মিলল। হুড়মুড়িয়ে বাড়িতে ঢুকেই তালা

খুলে কিট্টী নিজের চেয়ারখানাতে এসে ধপ করে বসে পড়ল। বেশ বোঝা যাচ্ছে মা এবং দেসাঈজী মিলে এই ষড়যন্ত্রটি করেছেন। মা তো মূর্খ কিন্তু দেসাঈজীও কি কিছু বোঝেন না? কোনকালে উনি কি উপকার করেছেন সেই ভেবে বিয়ের ব্যাপারেও আমায় চুপ করে থাকতে হবে? তৎক্ষণাৎ ভেবেচিন্তে কিট্টী দেসাঈজীকে একখানা চিঠি লিখে ফেলল এবং কাশীর মায়ের ছেলেকে ডেকে চিঠিখানা স্বয়ং দেসাঈজীর হাতে দিয়ে আসতে বলে দিল।

শ্রীমান,

শ্রদ্ধেয় গোপন্নাজীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণজীর ভক্তিপূর্ণ নমস্কার। আপনি আমার বিবাহ স্থির করার জন্য চেষ্টা করছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনি বৃথা পরিশ্রম করছেন। অনুগ্রহ করে এ প্রচেষ্টা বন্ধ করুন। আমার বিবাহে রুচি হলে আপনাকে জানাব।

আপনার অনুগত
কৃষ্ণজী।

চিঠি পড়ে দেসাঈজী অপমানিত বোধ করলেন। চিঠি কাউকে না দেখিয়ে চুপচাপ তুলে রেখে দিলেন নিজের সিন্ধুকে। শিবপ্পাকে আরো দুদিন বাড়িতে রেখে তাঁকে দিয়ে গ্রহ শান্তির জন্য পূজো করালেন। গাঁয়ে ফেরার আগে শিবপ্পা সংশয় ভরে আবার একবার বিয়ের প্রসঙ্গ তোলায় দেসাঈ বললেন, "আরে এই অজুহাতে আমার বাড়িতে তোমার একবার আসা তো হল। এমনি ডাকলে পূজো পাঠ ছেড়ে তুমি আসতে কি?" কোনরকমে একথা সেকথা বলে শিবপ্পাকে তো ফেরৎ পাঠান গেল, গঙ্গব্বার সঙ্গেও এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হল না। গঙ্গব্বা বাড়িতে কদিন ধরে কিট্টীকে অনেক কথা শোনাল, "এইভাবে আরো তিন চার বছর কাটলে এরপর আর পাত্রী জুটবে না তোর" এই বলে ভয় দেখাবার চেষ্টাও করল। এই খিটিমিটি এড়াতে কিট্টী আরম্ভ করল রাত করে বাড়ি ফেরা। সব কথায় তার ছিল একটাই বাঁধা জবাব, "এখন বিয়ের ইচ্ছা নেই, আগে চাকরী পাকা হোক তখন দেখা যাবে।"

16. দেসাঈজীর দ্বিতীয় চেষ্টা

কিট্টী বড় চিন্তায় পড়েছে। রাঘপ্পা সেই যে একবার মায়ের সামনে বিয়ের কথা পেড়েছিল তারপর থেকে সে কথা আর তোলেই নি অথচ ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য জালে তাকে যেন জড়িয়ে ফেলছে। কখনও ভুলেও যদি রাঘপ্পার বাড়ির গলি দিয়ে কিট্টী কোথাও যায় তাহলেই দু'পাশের বাড়ি থেকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েরা বলতে থাকে 'ঐ

দেখ রত্নার বর যাচ্ছে।' দেওয়ালীর দিন অত সব কাণ্ডের পরও রাঘপ্পা কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেনি। দিন কেটেই চলেছে। তহ্‌সিলদারের সঙ্গে দহরম মহরম, জিলাদারের সঙ্গে দোস্তি, জায়গীরদার সাহেবের দত্তক নেওয়ার ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে রাঘপ্পা নানা রকম চালবাজি গল্প শোনায় কিন্তু রত্নার কথা কিছু বলে না। রত্নাও দেওয়ালীর দিনের ঘটনার পর বোধ হয় ভাবছে সে আর ছোটটি নেই, কিম্বা হয়ত মা বারণ করেছেন তাই সেও আর কিট্টীর সামনে আসে না। তাই কিট্টীর বেশ মন খারাপ। রত্না এদিকে দিন দিন যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠছে। প্রত্যেকদিন তাকে নতুন রকম লাগে, শুধু বেশভূষায় নয় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই যেন এসেছে পরিবর্তনের জোয়ার। সেদিন কিট্টীর সামনে দাঁড়িয়ে যে সাহস ভরে কথা বলেছিল সেই সাহস আজ রত্নার কোথায় ? আজকাল কিট্টীকে দেখলেই সে পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু ঐটুকু চকিতের দেখাতেই কিট্টীর চোখে পড়ে অনেক পরিবর্তন। তার বালিকার ফ্যাকাশে ওষ্ঠাধর এখন পাকা ফলের মত রসভারানত, চোখের দৃষ্টিতে নতুন আলো, গণ্ডে আর গ্রীবায় এসেছে হাতির দাঁতের মত মসৃণ শুভ্রতা। চোখে না দেখতে পেলেও কিট্টীর মনে এখন রত্নার ছবিটি স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে গেছে। কিট্টীর অশান্ত মন অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছে কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না। অবশেষে দেসাঈজীর বাড়িতে মেয়ে দেখার ব্যাপারটায় একটা ভাল অজুহাত পাওয়া গেল। একদিন পথে রাঘপ্পার সঙ্গে দেখা হওয়ায় কিট্টী বলেই ফেলল, "দেসাঈজী একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করছেন।"

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে রাঘপ্পা জিজ্ঞাসা করল, "কোন দেসাঈ ?"

"আমাদের বাড়ির কাছে সাদা বাড়িটায় থাকেন যিনি, বাহাদুর দেসাঈজী।"

"ও তাই নাকি" এই বলেই চুপ হয়ে গেল রাঘপ্পা।

কিট্টী আবার শুরু করল, "আমি ওঁকে বলে দিয়েছি এখন আমার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই।"

"ও, তা কখন বিয়ে করবে স্থির করেছ ?"

"না না, ওঁকে ঐ রকম বলে দিলাম আর কি," লজ্জা পেয়ে বলে উঠল কিট্টী।

"তা, আমি..." রাঘপ্পা কি বলতে চাইছিল কে জানে কিন্তু ঐ ভাবে অর্ধেক বাক্য উচ্চারণ করেই সে থেমে গিয়ে কিট্টীকে আরো কথা বলবার সুযোগ দিল এবং কিট্টী বলেই ফেলল, "না না আপনার চিন্তার কারণ নেই। আমি ঠিক করেই রেখেছি উনি যদি বেশী জোর করেন তাহলে স্পষ্টই বলে দেব যে আপনার মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকেই আমি বিয়ে করব না। উনি মাননীয়, গুরুজনস্থানীয় তাই সেদিন চুপ করে গেলাম।"

এই কথাগুলিরই প্রতীক্ষা করছিল এতদিন রাঘপ্পা, এতদিনে তার কৌশল সফল হতে চলেছে, তার মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

রাঘপ্পা জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক বলছ তো ?"

"কেন আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে ?"

"তা নয়, এ বিষয়ে গঙ্গব্বার কি মত ?"

"সে কথাও আমি ভেবেছি। মা দেসাঈজীর অনুরোধ ঠেলতে পারেন না। দেসাঈজীকে যদি রাজী করানো যায় তাহলে মাকে রাজী করাতে দেরী হবে না।"

রাঘপ্পা কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করল তারপর দেসাঈজীর নাম ঠিকানা, স্বভাব চরিত্র, তাঁর বন্ধুবর্গ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ভাল করে জেনে নিয়ে কাজে নামতে প্রস্তুত হল।

এবারে কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। দেসাঈজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তার। এমন কাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় যে দেসাঈজীর সঙ্গে পরিচিত। একলাও চলে যাওয়া যেত, কিন্তু গঙ্গব্বা হয়ত ইতিমধ্যেই তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে রেখেছে এই ছিল রাঘপ্পার আশঙ্কা। কাউকে সঙ্গে নিলেও মুস্কিল আছে, তার সামনে যদি, গঙ্গব্বার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে সেই সব পুরানো কথা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে রাঘপ্পার মান ইজ্জত একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। সবদিক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত রাঘপ্পা স্থির করল একলাই যাবে। কিট্টীর অফিসের সময়টা খেয়াল রেখে একদিন দুপুর তিনটে নাগাদ সে গিয়ে দেসাঈজীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল।

দেসাঈজী তখন সবে ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে দ্বিতীয়বার চোখ বোলাচ্ছিলেন সেদিনের কাগজখানায়। তিনিই উঠে দরজা খুলে বললেন 'ভিতরে আসুন'। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে জানতে পারি ?" রাঘপ্পা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ঢিপ করে এক দণ্ডবৎ প্রণাম করে ফেলল। এরকম নাটকীয় ভাবে পাদস্পর্শ করাটা দেসাঈজী বিশেষ পছন্দ করতেন না। শুধু গাঁ থেকে আসা কৃষকরা নয় চাকরী বা ঋণপ্রার্থী শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেও হামেশা এসে এইভাবে তাঁর পাদস্পর্শ করে থাকে। "আরে আরে, এ ভাবে যাকে তাকে প্রণাম করতে নেই," বলতে বলতে তিনি নিচু হয়ে রাঘপ্পাকে ধরে তুললেন এবং নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। রাঘপ্পা আবার নাটকীয় ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "রায় সাহেব, এ সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করার শক্তি শুধু আপনারই আছে, তাই তো আপনার শরণ নিতে এসেছি। আমার নাম বিন্দ্‌গোল রাঘপ্পা, আপনার প্রতিবেশিনী গঙ্গব্বা আমার বোন। (দেসাঈজীর মুখের অপ্রসন্ন ভাব রাঘপ্পা দেখেও দেখল না, কথা চালিয়ে গেল) আমার এবং গঙ্গব্বার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটেছে আজ দশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু ঈশ্বরের কি লীলা দেখুন, বোনের সঙ্গে আবার নতুন করে সম্পর্ক পাতাবার জন্যই আপনার মত মহান ব্যক্তিকে প্রণাম করার সুযোগ পেলাম। বিন্দ্‌গোলে থাকতে স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি যে একদিন পরিস্থিতি এইরকম দাঁড়াবে। মেয়েদের এখানে এসে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পারব ভেবেই এসেছিলাম আর তার থেকেই এই কাণ্ড", এই বলেই আবার এক দীর্ঘ-নিশ্বাস।

দেসাঈজী এবার ব্যাপার কিছুটা বুঝলেন। এসব সাধারণ সাংসারিক কথাবার্তার জন্য এত নাটকের কোন প্রয়োজন ছিল না। যাক, এ ব্যাপারের পরিণতি সম্পর্কে

নিজেকে সচেতন রেখে তিনি সব কিছু শুনতে এবং রাঘপ্পার নাটকীয় ধরনধারণকে সহ্য করে যেতে প্রস্তুত হলেন। প্রশ্ন করলেন, "কেন? এখন কি হয়েছে?"

"এখানে আসার পর হঠাৎ একদিন আমাদের কিট্টণার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হাজার হোক রক্তের সম্পর্ক তো? গঙ্গব্বা না হয় মেয়েমানুষ, নিজের জিদ কিছুতেই ছাড়বে না, কিন্তু ওর ছেলের সঙ্গে অন্তত আগের সম্পর্কটা বজায় থাকুক এই ভেবেই আমি তিন চারবার তাকে বাড়িতে ডেকে চা জলখাবার খাইয়েছি। একথা জানতে পারলে গঙ্গব্বা খুব বিরক্ত হবে জানতাম তবু থাকতে পারিনি কারণ আমার বাড়িতে ছেলে নেই। কিট্টণাকে দেখলেই মনটা কেমন করে ওঠে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কি হয়েছে তা এখন আর বলে লাভ কি, কিন্তু গঙ্গব্বা ছাড়বে কেন? অবশ্য আপনার মত মহানুভব ব্যক্তি শুনলে হয়ত বলবেন যা হয়েছে ভালই হয়েছে। ব্যাপারটা এই, কিট্টণা এখন আমার বড় মেয়ে রত্নাকে বিয়ে করতে চায়। ওকে মেয়ে দিতে যে আমার ইচ্ছা নেই তা নয় দেসাঈজী। কিন্তু আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে কিট্টণা এরকম একটা জেদ ধরে বসবে। এ তো গেল কিট্টণার দিক। ওদিকে সারা পাড়ায় এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে, রত্নার সখীরা কিট্টণাকে দেখিয়ে 'রত্নার বর' বলে হাসি ঠাট্টা শুরু করেছে, মেয়ের মাথাতেও কথাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাল করেই।

সত্যি কথা বলতে কি, এ বিয়েতে সবারই খুশী হওয়ার কথা, রক্তের সম্পর্ক তো বটে। কিন্তু গঙ্গব্বা আমাকে সন্দেহ করে, কেন তা জানি না। এমনিতে গঙ্গব্বা তো কঠিনহৃদয়া নয়, সে যে কতখানি উদার তা আমি ভাল করেই জানি। আমার বিয়ের সময় সে কত উৎসাহ ভরে ভোজের আয়োজন করেছিল, নিজে হাতে করে সমস্ত ব্রাহ্মণদের দু দু টাকা করে দক্ষিণা দিয়েছিল! কিন্তু ভাগ্যই খারাপ। ওরও দুর্ভাগ্য এবং আমারও। ওর নিজের যখন দুঃসময় শুরু হল তখন থেকেই সবাইকার প্রতি দেখা দিল একটা অদ্ভুত আক্রোশ, ওর সন্দেহ হতে লাগল এদের সবার জন্যই ঘটেছে ওর ভাগ্য বিপর্যয়। অবশ্য এর জন্য আমি ওকে দোষ দিই না। বড় বড় শক্ত সমর্থ পুরুষমানুষই সম্পত্তির শোকে পাগল হয়ে যায়, ও বেচারী অবলা স্ত্রীলোকমাত্র। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, স্বামী সব কিছু হারিয়েছে যে তার তো এ রকম অবস্থা হবেই। তবু ভাগ্যে আপনার মত মানুষ সান্ত্বনা ও ভরসা দেবার জন্য ওর কাছে ছিলেন, আত্মীয় স্বজন তো কিছুই করেনি। থাক, ভাগ্যের ওপর তো কারও হাত নেই। এই আমার অবস্থাই দেখুন না। এদিকে কিট্টী তো আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তারপর শুনলাম আপনি ওকে একটি মেয়ে দেখিয়েছেন। আপনার মত মহাশয় ব্যক্তি ওর মঙ্গলচিন্তা তো করবেনই, সেই কথা ভেবেই আমি নিজের বোনের কাছেও গেলাম না, সোজা আপনার কাছেই চলে এসেছি। ওদিকে আবার রত্না, মেয়ে এখনও কিছু বলেনি, কিন্তু আজ-কালকার সিনেমা নাটক দেখে দেখে সব মেয়েদের মাথাটি খাওয়া হয়ে যায়। যদি গঙ্গব্বার আপত্তিতে বা অন্য কোন কারণে এ বিয়ে না হয় তাহলে সখীদের টিটকারীতে

তার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে। লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না। নরম মন তার ওপর অল্প বয়স, কিছু না করে বসে। কি মুস্কিলে যে পড়েছি, ভগবানই ভরসা এখন।

তবু রাওসাহেব, এ সব সমস্যা আমি যা হোক করে সামলে নেব। আসল কথা হচ্ছে, কিট্টীর দায়িত্ব যখন আপনি নিয়েছেন তখন আমার মেয়েকে একবার আপনি দেখুন, যেমন ভাবে চান পরীক্ষা করুন। আপনার যদি পছন্দ হয় তবেই আপনি 'হ্যাঁ' বলবেন। তাছাড়া আরো একটা কথা, রক্তের সম্বন্ধ কখনও বদলায় না। গঙ্গব্বা আমার উদ্দেশ্যে যতই বিষ ঢালুক, কিট্টীকে দেখলেই আমার মনটা ভরে ওঠে, আমার যেন নাড়ীতে টান পড়ে। রত্না আমার সত্যিই রত্ন, শুধু আমার মেয়ে বলেই বলছি না...

এই সময় রাঘপ্পার নজরে পড়ল বেণুবাঈ দরজার অন্তরাল থেকে ওদের কথা শুনছেন। মুহূর্তমাত্র রাঘপ্পা এদিক ওদিক চেয়ে দেখেই আবার শুরু করল কথা। স্বামী এই বাক্যবাগীশের কথা শুধু শুনেই যাচ্ছেন দেখে আর থাকতে পারলেন না বেণুবাঈ, কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন, "কিট্টী যাকে খুশি বিয়ে করুক আমাদের কি যায় আসে, আমাদের কিছু দেবারও নেই নেবারও নেই। তবে গঙ্গব্বা অনেক দুঃখ পেয়েছে, বেচারীর ছেলে অন্ত প্রাণ, যা কষ্ট করেছে সে আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওর সাহস আছে তাই আজকের এ অবস্থায় এসে পৌঁছতে পেরেছে, এবার গঙ্গব্বা একটু সুখের মুখ দেখুক এই আমাদের ইচ্ছা।"

প্রথম কথাগুলো দেসাঈজীরও মনে হচ্ছিল যুক্তিসঙ্গত। যতদূর সম্ভব তিনি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না তাই বেণুবাঈ-এর একেবারে শেষ কথাটা তাঁর খুব পছন্দ হল না, বলে উঠলেন, "আমাদের কোন ইচ্ছাও নেই স্বার্থও নেই। গঙ্গব্বাই বা আমার কে, আর কৃষ্ণই বা আমার কে ? এ ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই নিজেকে জড়াতে চাইনি। আপনি গঙ্গব্বার সঙ্গে দেখা করে তাকে রাজী করান। বিয়ে যদি হয় আমি নিশ্চয় আশীর্বাদ করতে যাব।"

"রাওসাহেব, ছেলেটার মঙ্গল যদি কেউ করতে পারে তো সে আপনিই। আপনি না থাকলে বেচারী গরীব গঙ্গব্বা কোথা থেকে কি করত ?"

দেসাঈজী একবার উঠে বাইরে গেলেন কিন্তু রাঘপ্পা বেণুবাঈয়ের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেল, "আপনারা ছেলেটার জন্য কি না করেছেন, ছেলে তো নিজেই আমাকে সব বলেছে, তাছাড়া দেশশুদ্ধ লোক সবাই বলে। ছেলেটা তো আপনাদের ওপরই ভরসা করে আছে।"

দেসাঈজী এবার আর থাকতে না পেরে, উঠে সিন্দুক খুললেন এবং কিট্টীর চিঠিখানি এনে মেলে ধরলেন রাঘপ্পার নাকের সামনে। চিঠি দেখে রাঘপ্পা একটু হকচকিয়ে গেল বটে, কিন্তু পুনশ্চটুকু চোখে পড়তেই সামলে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ কিট্টী বলেইছিল দেসাঈজী আমার জন্য মেয়ে দেখছেন, কিন্তু আমার মন তো রয়েছে রত্নার

প্রতি, এ কথা ওঁকে বলতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু সাহস করে একদিন গিয়ে ওঁর আশীর্বাদ চেয়ে নেব। আপনাকে ও ভয়ও করে যেমন শ্রদ্ধাও করে তেমনি।"

এ রকম ছেলেভুলানো কথা দেসাঈজী ঢের শুনেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাগ চেপে শুধু বললেন, "এ চিঠির মানে যাই হোক না কেন গঙ্গব্বা যাতে সুখী হয়, সবাইকার মত আমিও সেটাই চাই।"

"তা কেন হবে না রাওসাহেব? ঈশ্বর আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলাবেন না। গঙ্গব্বার সঙ্গে আমি কেমন ব্যবহার করব আপনারা দেখবেন। আমি তার কাছে গভীরভাবে উপকৃত। কিছু করার উপায় নেই তাই চুপ করে থাকি। একটা কথা শুধু আপনাকেই বলছি। আমার দুটি মাত্র মেয়ে। বড়টিকে কিট্টীর হাতে দিয়ে গঙ্গব্বাকে কাছে টানতে চাই। এইটেই আমার একান্ত ইচ্ছা। ছোটটির এখনও সেয়ানা হতে পাঁচ ছ' বছর দেরী আছে, দু চার হাজার খরচ করে তারও ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেব তারপর কিট্টণাকে আমি দত্তক নেব এই আমার আন্তরিক বাসনা।

গঙ্গব্বার অবশ্য একটিমাত্র ছেলে কিন্তু 'দ্বায়মুষায়ণ' দত্তক নেওয়া চলতে পারে। এ রকম দত্তক আমি অনেককে নিয়েছি। ভগবান সাক্ষী করে বলছি এ কথার অন্যথা হবে না। নিজের বংশের রক্ত যার দেহে তাকে কি ঠকাতে পারি? আমার বার্ষিক আয় এক হাজার টাকা। এই দুই বিবাহে কিছু জমি যদি হাতছাড়া হয় তাহলেও বছরে সাত আটশ টাকা আয় থাকবেই। এ সবই কিট্টণাকে দিয়ে, আমরা যে কদিন বাঁচব ভগবানের নাম করব আর কিট্টণার ছেলেপিলেদের সঙ্গে খেলা করব এইটুকুই আমার এবং আমার স্ত্রীর একান্ত বাসনা। ছেলেটি এত ভাল, আর নিজেদেরই তো ছেলে। মৃত্যুর পর ওর হাতে জলপিণ্ড পাব এটা কত বড় ভরসা।

সব কথাই আপনাকে খোলাখুলি বললাম। এই রইল ছুরি আর এই রইল খরমুজা, এবার আপনার যেমন ইচ্ছা তাই করুন।"

সবাই স্তব্ধ হয়ে আছে দেখে রাঘপ্পা শেষ বাধাটি সরিয়ে দিতে উদ্যত হল।

"এখন যদি আপনি বলেন, এ সব কথা নিজের বোনকে বল গিয়ে, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে -তার বদলে বরং আপনি বলুন, "রাঘপ্পা তুমি খারাপ লোক, তোমার মেয়ে আমার পছন্দ নয়, তুমি লুপ্তপিণ্ড হয়েই মরো" তারপর আমায় ঘর থেকে বার করে দিন, সেও আমি সইব। কিন্তু আমার বোনকে বোঝানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনার মত গুরুজনরাই ওটা পারবেন। ভাই বোনে কি ঝগড়া হয় না? তখন আপনার মত বড়রাই তো মধ্যস্থ হয়ে সব মিটিয়ে দেন। এত লোকে আপনার কাছে এসে উপকৃত হয় আর আমাকে যদি শূন্য হাতে ফিরে যেতে হয় সে আমার পরম দুর্ভাগ্য।"

রাঘপ্পার তর্কের ফাঁদে পড়ে দেসাঈজী ছটফট করছেন, তাঁর মনে হচ্ছে যেন তাঁর পরীক্ষা চলছে। দুন্দুরু শিবপ্পার মেয়ে হলে কোন কথাই ছিল না। এখন কোন এক পক্ষে রায় দিতেই হবে, ওদিকে কিট্টীর ক্ষতি না হয় সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। কিট্টী যদি

বোকামী করে থাকে তার জন্য দেসাঈজী নিজের বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। 'লোকে কেন যে আমার কাছে এসে ধরে পড়ে, আমার নিজেরই কত ঝঞ্ঝাট' এই সব ভাবতে ভাবতে দেসাঈজী ভরমাকে পাঠিয়ে দিলেন গঙ্গব্বাকে ডেকে আনবার জন্য।

17. গঙ্গব্বা রাঘপ্পা

ভরমার কাছে যেটুকু খবর পাওয়া গেল তাতে মনে হল রাঘপ্পাই এসেছে, তাই গঙ্গব্বা দ্রুত পদে এসে হাজির হল কিন্তু দেসাঈজীর ঘরের বাইরের দেওয়ালেই ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। বেণুবাঈ ডাকলেন, 'গঙ্গব্বা ভেতরে এস' কিন্তু সে বসে রইল ওখানেই। এবার রাঘপ্পাও মুখ খুলল, ডেকে বলল, ''গঙ্গব্বা ভেতরে এস না, বাইরে বসে পড়লে কেন ছোট মেয়ের মত ?"

"আমি এখানেই ঠিক আছি ভাই, যার যেখানে থাকা উচিত তার সেখানেই থাকা ভাল। রাঘপ্পার চালাকীমারা কথাবার্তা গঙ্গব্বার সাফ জবাবের সামনে সর্বদাই হার মানত। বিশ্ববিজেতা রাঘপ্পারও বোনের সামনে এলেই কেমন ভয় ভয় করত। পরিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যে সিপাই তার চেয়ে টিলার আড়ালে দাঁড়ানো সিপাইয়ের হাতের অস্ত্রাঘাত বেশী ভয়ঙ্কর, সেই রকমই এখন দেওয়ালের ওপারে বসা গঙ্গব্বার বাক্যবাণ রাঘপ্পার কাছে তীক্ষ্ণতর বলে বোধ হচ্ছে। সে দেসাঈজীর কথাও অমান্য করে বাইরেই বসে আছে, সামনে এসে বসতে পর্যন্ত রাজী নয়। তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে। ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালে যদি মনটা একটুও নরম হয়ে যায় ? ওর রঙ বেরঙের কথার জালে আবার কিছুতেই ফাঁসা চলবে না এ কথা গঙ্গব্বা বাড়ি থেকে ভেবে এসেছে। তাই দেওয়ালের অন্তরালই উপযুক্ত স্থান বলে ওর মনে হচ্ছে।

দেসাঈজী এবার কাজের কথায় এলেন, বললেন, ''গঙ্গব্বা তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার যদিও ভালভাবে পরিচয় নেই তবে ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা নানারকম কথাবার্তা বলেছি। এ'র ইচ্ছা এ'র মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণর বিয়ে হয়। পরশু কৃষ্ণকে শিবপ্পার মেয়ে দেখানো হয়েছে এই শুনেই ইনি এসেছেন। কিন্তু তোমার মত না জেনে তো কিছু বলতে পারি না তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।" কথার মাঝেই রাঘপ্পা বলে উঠল, "ছি, ছি, গঙ্গব্বার আশীর্বাদ ছাড়া তো কিছু হতেই পারে না।"

তীক্ষ্ণস্বরে গঙ্গব্বা বলে উঠল, "আমার আশীর্বাদের আর দরকার কি ? তুমি তো তার মাথায় হাত রেখেই ফেলেছ।"

"ও সব কথা বাদ দাও গঙ্গব্বা। যাই হোক, তোমরা ভাই বোন তো বটে, আজ ঝগড়া করছ, কালই হয়ত একসঙ্গে এসে আমাকেই বলবে......। তোমাদের মনোমালিন্য এবার ভুলে যাও, আসল কথায় এস। তুমি কি মেয়ে দেখতে চাও ?"

"গোপন্না, শুধু শুধু এসব কথা কেন বলছ ? আমি সে মেয়েকেও দেখতে চাই না তার বাপকেও দেখতে চাই না। ওদের দেখে দেখে আমার আশ মিটে গেছে, এখন কবে আমার চোখ দুটো বন্ধ হবে তাই শুধু ভাবি।" দেসাঈজী মুখ নত করলেন। রাঘপ্পার মনে হল এবার ওর কথা বলার সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে সে শুরু করল,–

"গঙ্গব্বা, যা হয়ে গেছে সেকথা ভুলে যাও। আমি তোমার ছোট ভাই, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখো, আর কতদিন রাগ করে থাকবে ? বিনা কারণে এই দ্বেষ কেন পুষে রেখেছ ? পাথরও তো কখনও গলে।"

"হ্যাঁ ভাই রাঘু, আমার মন পাথরেই গড়া। তোমার টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তি, তোমার মেয়েমানুষ এসব দেখেও আমার মন গলছে না। আমি এতদিন ধরে এত কষ্টে কিট্টীকে মানুষ করেছি, এত বড়টি করে তুলেছি, একেবারে একলা, আগে পিছে কেউ ছিল না আমার। কারও পায়ে ধরেছি, কারও বাড়ি চাকরী করেছি, কাউকে অসুবিধায় ফেলেছি আবার কেউ বা আগ্রহ করে সাহায্য করেছেন, কি না করতে হয়েছে আমাকে। সে সব দিনে কখনও তোমার আমাকে মনে পড়েছে কি ? ভাইয়ের কর্তব্য কি করেছ তুমি ? কখনও বোন বলে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছ যে আমার খাওয়া পরার সংস্থান আছে কি না ? একদিনের জন্যও...... ? আজ ওর চাকরী হয়েছে তাই আমাকে মনে পড়েছে. এতদিন এ দয়া ছিল কোথায় তোর ?"

"গঙ্গব্বা তুমি তো শিকারী কুকুরের মত আমাকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিতে না, এঁটো পাতাও কখনও দেখতে দাওনি. আমাকে তো তুমি অচ্ছুতের মত দূরে সরিয়ে রাখতে।"

"তুমি কেন অচ্ছুত হতে যাবে ভাই ? অচ্ছুত তো আমি, যে নিজের সম্পত্তি খুইয়েছি। পয়সা থাকলে সবাই আপন হয় আর পয়সা না থাকলে কেউ কাছেও ঘেঁসে না। এই তো দুনিয়ার রীতি।"

"তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, অন্যের পয়সা আমাকে যেন গিলতে আসে, সত্যি বলছি।"

গঙ্গব্বা একেবারে চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল একথা শুনে। এতক্ষণ শুধু পরস্পরের প্রতি দোষারোপ চলছিল, এবার গঙ্গব্বা দেওয়ালের আড়াল ছেড়ে দরজার সামনে এসে চেঁচিয়ে উঠল,—"অন্যের পয়সা ! তোর নিজের পয়সা ছিল কবে শুনি ? আমি কি কিছু জানিনা ভেবেছিস ? সারা ক্ষেতখামার তো তোর বাঁধা পড়েছিল। আমরা গেলাম বরবাদ হয়ে, আর তুই ফিরে পেলি তোর জমি। রেখে দে তোর লম্বা চওড়া কথা।"

"গঙ্গব্বা একথা বলছ কেন ? আমি কি তোমার টাকা চুরি করেছি না লুট করেছি ? সব কথা ভেবে দেখ। তোমাদের দুর্ভাগ্যে আমি কষ্ট পাইনি এই কি বলতে চাইছ ?"

"আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তুইই। তুইই তো আমাদের দিয়ে জামিন দিইয়েছিলি, সেই হারামখোর বেঙ্কাকে বাড়ি থেকে ভাগিয়েছিলিও তুই। সেই সময় তুই কি জানতিস না যে এর ফলে বোনের গলায়ই ফাঁসি পড়বে। তোর জন্যই আমার ঘরের সোনা দানা ধূলোয় মিশে গেল, আমার স্বামীকেও খেয়েছিস তুইই। ওরে আমার ভাইরে! দুনিয়ায় ভাগীদার অনেকেই থাকে কিন্তু তোর মত আর একটা লোক প্রদীপ জ্বেলে খুঁজে বেড়ালেও বোধ হয় পাওয়া যাবে না।"

"একটু থামো গঙ্গব্বা। জানিনা আবার কবে আমাদের দেখা হবে। এ সব কথা আমি বহুদিন ধরে শুনছি। আজ দেসাঈজীও সাক্ষী আছেন, তোমার প্রত্যেকটি অভিযোগের জবাব আছে আমার কাছে। একবার সামনাসামনি দুজনেরই মন খুলে সব কথা বলা হয়ে যাক, মনে মনে গুমরে কোন তো লাভ নেই। প্রথম কথা, গঙ্গব্বা, আমি কি বেঙ্কটের জন্য জামিন হতে আপত্তি করেছিলাম ? আমি কি নিজে পিছিয়ে গিয়ে স্বামীরায়কে এগিয়ে দিয়েছিলাম ? তা তো নয় ? পরে যা ঘটল সেটা তো ভগবানের হাত, আমার তাতে দোষটা কোথায় ? আমি নিজে থেকেই জামিন দাঁড়াতে চেয়েছিলাম কিন্তু উকিল বলল তোমার নিজের ক্ষেত বন্ধক রয়েছে তুমি জামিন হতে পারবে না। তখন স্বামীরায় নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'কেন চিন্তা করছ ? আমি জামিন হব', এ সব কথা কি তোমার মনে পড়ছে না ? কুটুম্বের মান সম্মানের কথা ভেবেই তিনি সেই পাগলটার জন্য জামিন হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, আজ তিনি থাকলে লক্ষ টাকার লোকসানও তোমার গায়ে লাগত না আর আমার ওপরও এভাবে বিষ ঢালতে না। যেতে দাও, সে সব কথা ভেবে আর কি লাভ ? আমি তো ভগবানকেই দোষ দিই। আমার ভাগ্যই খারাপ।"

"দেখ ভাই এ সব মেয়েমানুষের মত কথাবার্তা ছাড়ো, এই রকম কথার জালে জড়িয়ে তুমি কতজনকে গিলেছ, একটা ঢেঁকুর পর্যন্ত না তুলে। সারা গাঁয়ের লোক সে কথা বলে, আমি আর কি বলব ? ওই সব কথায় আমি ভুলছি না।"

"একটু দাঁড়াও, কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও। আজ পরিষ্কার কথা হয়ে যাক, যা কিছু আমার বলার আছে সব তোমায় শুনতেই হবে। সব শুনে তুমি আমায় ভাই বলে স্বীকার কর বা ত্যাগ কর, যা তোমার ইচ্ছা। তোমাদের ডোবাবার জন্য বেঙ্কটকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি এটা তোমার ভুল ধারণা। তাকে তাড়িয়ে আমার লাভটা কি ? সেই আধ-পাগলটাকে আমি তাড়াব কেন ? কার পাপে সে পাগল হল কে জানে। সে রাত্রে সে আমার ঘরে শুয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু তার মানে এই নয় যে চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে তার খবরদারী করতে হবে। আমি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারি কি ? রাত দশটার সময় কিছুটা খাবার খেয়ে বলল, 'একটু ঘুরে আসছি'। বাস, আর ফিরলই না। তারপর কি হল মনে আছে ? স্বামীরায় একশ টাকা দিয়ে আমাকে পুণায় খুঁজতে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর তো এ সন্দেহ হয়নি যে বেঙ্কটকে আমিই সরিয়েছি। তুমি কেন এটাই ধরে নিয়েছ বুঝি না। স্বামীরায় আমাদের ভাইয়ের মান বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। সত্যি বলতে কি গঙ্গব্বা, বেঙ্কট আমার এবং তোমার দুজনকারই ভাই। আমি যদি বলি, সে তোমার ভাই বলেই স্বামীরায় তার জামিন হয়েছিলেন তাহলে? স্বামীরায় কি আমার শত্রু? আমার চোখের সামনে তিনি জামিনের কাগজে সই করেছেন। বেঙ্কট পালালে তিনি বিপদে পড়বেন, তাঁর বিপদে আমার বোনেরই প্রাণ-সংশয় হবে, এ সব কি আমি জানতাম না?"

এ সব কথা গঙ্গব্বা এত বিস্তারিত ভাবে জানত না। তার জীবনের ঐ অংশটার স্মৃতি বড় বেদনাময়। বেঙ্কট পালাবার পর তাকে খুঁজতে বহু জায়গাতেই লোক পাঠানো হয়। তাকে যখন পাওয়া গেল না, মাসখানেকের মধ্যেই সবাই রাঘপ্পাকে সন্দেহ করতে শুরু করে। বাইরের লোকে রাঘপ্পা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলত, কিন্তু বাড়িতে অসদ্ভাব ছিল না তাই সে সব কথার প্রতিধ্বনি বাড়িতে কখনও শোনা যায়নি। কিন্তু সংসারে যখন ভাঙন ধরল তখন বাড়ির আবহাওয়াও বদলে গেল সংশয় আর বিদ্বেষের বিষে। লোকের কথা আসতে লাগল গঙ্গব্বার কানে, ক্রমাগত নানা কথা শুনতে শুনতে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে বেঙ্কটকে রাঘুই ভাগিয়েছে যদিও এ বিশ্বাসের তেমন কোন জোরালো ভিত্তি ছিল না। ছ'সাত মাস পরে স্বামী মারা যেতে সে বিশ্বাস তার আরো দৃঢ়মূল হল। একবার তো গঙ্গব্বা রাঘপ্পা তার স্ত্রী আর সন্তান সবাইকার নামে তর্পণ পর্যন্ত করে ফেলেছিল। সে সব কথা মনে পড়ায় গঙ্গব্বা চুপ করেই রইল, তর্ক করতে পারছে না বলেই তার বিদ্বেষ পরিণত হল বেদনায়। আর বাদ বিবাদ করবার ক্ষমতা ছিল না ওর, পুরানো স্মৃতিতে অভিভূত গঙ্গব্বা চোখের জল ফেলতে ফেলতে কোনমতে বলে উঠল, "ওঁকে খেয়ে তবে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ।" রাঘপ্পার কথা এখনও শেষ হয়নি। একটা কথা সে বহুদিন ধরে বলতে চাইছে, সেটা আজ বলে ফেলবে। "গঙ্গব্বা তোমার কথায় আমার রাগ হচ্ছে না কারণ এসব নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি। সে সব কথা আবার নতুন করে বলে যদিও লাভ নেই তবু আজ কথা উঠেছে তাই স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভাল। স্বামীরায়ের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশী কষ্ট তুমিই পেয়েছ এটা ঠিক কিন্তু আমার দিকটাও শোন। তুমি তো বাড়ির মেয়ে, তাই বেঙ্কটের জন্য জামিন দাঁড়ানো আমারই কর্তব্য ছিল। সে পালিয়েছেও আমারই কাছ থেকে আর তারই জন্য আমার বোনের সংসার ভেঙে গেছে। তাই যেমন করে হোক বোনের ঋণ আমি শোধ করতে চেয়েছিলাম। এরই মধ্যে আচমকা চলে গেলেন স্বামীরায়। মনে হল যেন আমিই তাঁকে মারলাম—সেই অনুতাপে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, কতবার বলেছি, হে ভগবান আমার প্রাণ নিয়ে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দাও। তুমি যদি জানতে সে সব—যাকগে, তুমি জানবেই বা কি করে? তোমার নিজের ওপরই ছিল অসহ্য দুঃখের ভার। তোমার কোন দোষ নেই। শুধু দেসাঈজীর সামনে আমি এইটুকুই বলতে চাই যে আমাকেও তো লোকে চেনে জানে, অন্তত এই দুঃখ যাঁর দান সেই অন্তর্যামী তো জানেন।"

শেষের দিকে আবেগ যত বাড়ছিল রাঘপ্পার গলাও তত উঁচু হচ্ছিল। সে সব দিনের স্মৃতি মনে জাগছিল তারও। সে দিনের দুঃখ এত তীব্র যে তার স্মৃতি যে কোন মানুষের হৃদয়কে বেদনায় অভিভূত করে ফেলতে পারে। রাঘপ্পাও নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল। তার কথা শেষ হতেই বাইরে উপবিষ্ট গঙ্গব্বার কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। দেসাঈজী তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলেন, রাঘপ্পাও এল চোখ মুছতে মুছতে। গঙ্গব্বা এতক্ষণ কান্না চাপবার চেষ্টা করছিল কিন্তু দেসাঈজীকে দেখেই মাথার ঘোমটাটা লম্বা করে টেনে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে দৃশ্য দেখে রাঘপ্পারও চোখ জলে ভরে উঠল। তার কঠিন পুরুষহৃদয়ও পড়ল দুর্বল হয়ে, দু তিনবার তারও ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। মিনিট দুই কান্নাকাটির পরই অবশ্য সামলে নিল রাঘপ্পা এবং এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয় ভেবে আবার শুরু করল নাটক। মাটিতে পা মুড়ে বসে পড়ল ধপ করে তারপর চাদরখানা সামনে বিছিয়ে বলে উঠল, "গঙ্গব্বা আমার যা কিছু দোষ হয়ে থাকে মাফ করে দাও। যা হয়েছে সব ভুলে যাও, একবার অন্তত ছোট ভাই বলে ডাক আমাকে।"

পুরানো স্মৃতিতে বিভোর গঙ্গব্বা ভাইয়ের কথা শুনতে শুনতে কিছুটা নরম হয়ে এসেছিল কিন্তু রাঘপ্পার এই নতুন চাল তাকে আবার ফিরিয়ে আনল বর্তমানে। ভাইয়ের এসব লীলাখেলা সে অনেক দেখেছে। হুঁশ ফিরে পেয়ে মনের ভাবনাচিন্তাগুলোকে জোর করে ঢাকনা চাপা দিল সে। মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীসুলভ কাঁপুনী, কান্না, গদগদ স্বর সর্বকিছু সংবৃত করে উঠে বসল এবং আর একটি কথাও না বলে দরজা পার হয়ে নিজের বাড়ির পথে রওনা হল গঙ্গব্বা।

আসল প্রস্তাব সম্পর্কে গঙ্গব্বার সঙ্গে আলোচনা করা হবে দেসাঈজীর কাছে এই ধরনের আশ্বাস পেয়ে রাঘপ্পাও বিদায় নিল। দেসাঈজীর উপস্থিতির জন্য সেদিন তার কিছুটা কার্যসিদ্ধি হয়েছে বলা চলে। যতই কথার মারপ্যাঁচ খেলুক দেসাঈজী হাল না ধরলে সে জিততে পারবে না এটা রাঘপ্পা অনুভব করছে। একলা চেষ্টা করতে গিয়ে একবার তো বোকা বনে ফিরে আসতে হয়েছে।

গঙ্গব্বা যদিও কিট্টীর সঙ্গে কোন কথা আলোচনা করেনি কিন্তু কিট্টীর জানতে কিছুই বাকি ছিল না। আপিস ছুটির সময় বুঝে রাঘপ্পা টাঙ্গা নিয়ে গিয়ে মাঝপথেই কিট্টীকে ধরে সব শুনিয়েছে। ওকে ভাল করে বুঝিয়েছে গঙ্গব্বা বা দেসাঈজী কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন বলে "রাঘপ্পার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি আর বিয়েই করব না।" এরকম করে না বলতে পারলে কিট্টীর কথায় জোর থাকবে না এবং তখন এ বিয়েও হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

পরের দিন ভোর না হতে আবার গঙ্গব্বার ডাক পড়ল। গতকালের ভাবপ্রবণ পরিবেশ হাল্কা করার জন্য আজ দেসাঈজী খুব সাদাসিধে ভাবে একেবারে কাজের কথায় চলে এলেন। 'দেখ গঙ্গব্বা, এ সব ব্যাপারে আমাদের মত লোককে টেনে আনাটা ঠিক না। তবে আমার সামনেই এত কথা হয়ে গেল, তাই বলছি, তোমার যদি উচিত মনে হয় তো ভেবে দেখো, তোমার আপন ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে বা কত-

খানি হয়েছে তা নিয়ে আমাদের কিছুই বলার নেই। আমার মত মধ্যস্থ ব্যক্তির কাজ কেবল এইটুকু দেখা যাতে কিট্টীর মঙ্গল হয় এবং সেই সঙ্গে তুমিও সুখী হও। কথাটা যদি তোমার ঠিক মনে না হয় তুমি স্বীকার করো না, তাতে আমি মোটেও দুঃখ পাবনা— তোমার রাঘপ্পার কোন পুত্রসন্তান নেই এটা কি সত্যি ?" গঙ্গৱা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। দেসাঈজী বলে চললেন, "মনে হচ্ছে কিট্টীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে কিট্টীকে দত্তক নিতে চায়। এভাবে 'দ্বায়মুষায়ণ' দত্তক নেওয়া যায়। বলছিল বছরে সাত আটশ' টাকা আয় হবার মত জমিজমা আছে। যাক সে আমি খোঁজখবর করে জেনে নিচ্ছি, সে সব তো পরের কথা। তাছাড়া, রাঘপ্পা লোক কেমন সেটা প্রধান ব্যাপার নয়, তার মেয়েটি কেমন সেইটেই আসল। সে সম্বন্ধেও খোঁজখবর নিতে হবে। তবে এটাও ঠিক যে ছেলেপিলে বড় হয়ে যাবার পর সবসময় নিজের খুশিমত তাদের চালানো যায় না। এ যুগে ছেলেপিলের ব্যাপারে আমাদের ততখানি অধিকার আর নেই। শুনলাম কৃষ্ণ এই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে, তোমাকে বলেছে নাকি কিছু ?"

"ছি ছি, ও সমস্ত রাঘুর বাজে কথা।"

"যাই হোক, কৃষ্ণকে ডেকে আমি সত্যি কথাটা জেনে নিচ্ছি। তবে আমার মনে হচ্ছে তার বিশেষ প্রয়োজন নেই।" দেসাঈজী এবার চশমার খাপ থেকে কিট্টীর লেখা চিঠিখানা পড়ে শোনালেন গঙ্গৱাকে। গঙ্গৱা চোখ বড় বড় করে দেখল আর অসহায় ভাবে শুনল। 'এ চিঠির জন্য আমার ছেলেকে ক্ষমা করুন' কথাটা ওর মুখে এল কিন্তু বলতে পারল না। "যাই হোক", দেসাঈজী বলে চললেন, "রাঘপ্পার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের আর বিশেষ কিছু করবার স্বাধীনতা নেই। মেয়ে যদি মোটের ওপর চলনসই হয় এবং সংসারের কাজকর্ম চালাতে পারে তাহলে আর আপত্তি না করে মত দিয়ে ফেলাই তোমার পক্ষে ঠিক হবে। ধর, কাল যদি কৃষ্ণ বলে বসে সে তোমার কথাও শুনবে না, আমার কথাও শুনবে না, নিজের খুশিমত কাজ করবে, তখন ? তখন তুমিই মুস্কিলে পড়ে যাবে না কি ? শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ এখন তো আর কচি খোকাটি নয় যে তেল মাখিয়ে নাইয়ে ধুইয়ে দোলনায় শুইয়ে রাখবে ? ভাল করে ভেবে দেখ, আমরা, যতই যা হোক, পর ছাড়া কিছু নয়। ভবিষ্যতে কষ্ট পেলে তোমাকেই পেতে হবে, তাই খুব ভাল ভাবে চিন্তা করে কাজ কর। তাছাড়া সাংসারিক দিকটাও ভেবে দেখ—কিছু বরদক্ষিণা তো নিশ্চয় দেবে, তারপর দত্তকও নেবে বলছে।"

"তুমি তো উচিত কথাই বলছ গোপন্না, কিন্তু ঐ রাঘুর কথা আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"কোন কথাটা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বল ? তার জন্যও কোন উপায় বার করা যেতে পারে। আমি যা যা বললাম সেগুলো সম্বন্ধে তুমি একমত তো আমার সঙ্গে ?"

"এখন তো বলছে দত্তক নেবে, কিন্তু পরে যদি না নেয়? ওর কি কোন কথার ঠিক আছে? অন্যকে বিপদে ফেলাই ওর কাজ।"

"ও গড়বড় করবে বলছ? করুক দেখি! আমিও কিছু চুড়ি পরে থাকি না। বিয়ের পাকা কথার সময়ই দত্তাত্রেয়র মন্দিরে দশজনের সামনে শপথ করিয়ে নেব। তারপর যদি কথা না রাখে আমার এলাকায় ওকে শিক্ষা দেবার মত লোক আছে। থামের সঙ্গে বেঁধে চাবুক লাগাব তাহলে। কি ভেবেছে ও নিজেকে?" উত্তেজিত ভাবে কথা শেষ করলেন দেসাঈজী।

আর কি বলবে ভেবে পেল না গঙ্গব্বা। সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সসঙ্কোচে শুধু বলল, "গোপন্না, তুমি যাই বল, কিছুদিনের মধ্যেই কিট্টীকে রাঘু একেবারে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলবে এ ভয় আমার কিছুতেই যাচ্ছে না।"

"দেখ গঙ্গব্বা, ছেলে তোমার খোকা নয়। বিয়ে হোক চাই না হোক কিট্টী যদি স্থির করে সে রাঘপ্পার কথামতই চলবে, তাহলে তুমি কি তাকে আটকাতে পারবে? তুমি নিজেই ভেবে দেখ। আমার মনে হচ্ছে কিট্টী তাড়াতাড়িই বিয়েটা করতে চায়। এখন ওকে দিয়ে একটা শর্ত করিয়ে নিতে হবে যে বিয়ের পর বা দত্তক নেবার পর কিট্টী রাঘপ্পার বাড়িতে থাকবে না। নিজের বাড়িতে তাকে মা এবং স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে হবে। ওকে একথা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব। ও কথা রাখবার মত ছেলে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি এ বিয়েতে রাজী হয়ে গেলে তোমার সম্মান বাড়বে, কিট্টীও খুশী হয়েই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলবে। না হলে নিজের নিজের কর্মফল সবাইকেই ভুগতে হয়। আমাদের তরফ থেকে ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব সহজ করে নেওয়াই ভাল।"

শেষ পর্যন্ত দেসাঈজীর প্রয়াস সফল হল। বাপের বাড়ি আর সেখানকার জমি জায়গা দেখেনি গঙ্গব্বা সে আর্জ কতকাল হয়ে গেল। নিজের জন্মস্থান, যে মাটিতে সে ছোটবেলায় খেলে বেড়িয়েছে, যে ক্ষেতের অন্ন খেয়ে সে বড় হয়েছে সেই সব জায়গার কথা মনে পড়ে মনটা যেন ভরে উঠল, কেমন একটা প্রসন্নতা এল মনে। যে সব কথা নিয়ে এতদিন সন্দেহ করেছে সেগুলোর ভিত যেন আলগা হয়ে গেছে।

দেখে শুনে দেসাঈজীও সন্তুষ্ট। গঙ্গব্বার দ্বিধা কাটিয়ে দেবার জন্য তিনি বললেন,— "তোমার হয়ত মনে হচ্ছে এতদিনের শত্রুতা কি চট করে ভোলা যায়? কিন্তু ভোলাই উচিত, ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করাটা ঠিক নয়। বৌ বাড়িতে এলে তাকে আদর করতে হবে, সেটা তোমার কর্তব্য। তার বাপের ওপর রাগ আছে বলে তার ওপরও বিরক্ত হয়ে থাকা উচিত হবে না। তা যদি তুমি কর তাহলে আমরা আর তোমার সহায় থাকব না এও কিন্তু বলে রাখছি। অবশ্য আমি একথাও বলছি না যে রাঘপ্পার সঙ্গেও তোমায় সদ্ভাব রাখতে হবে। তুমি চাও তো তার বাড়ি যেও না, তার মুখও দেখো না, তাকে তোমার বাড়িতে ডেকো না। এসব কথা সময় মত স্পষ্ট করে বলে দেব। শুধু ছেলে আর বৌকে মাঝে মধ্যে তার বাড়ি যেতে দিও তাহলেই কোন গোলমাল হবে না।"

এই সব শুনে গঙ্গব্বা আর একটি কথাও বলল না। দেসাঈজীর এই অর্থপূর্ণ বক্তৃতার পর বলবার আর আছেই বা কি ?

বাড়ি ফিরে গঙ্গব্বা ঠাট্টার সুরেই কিট্টীকে প্রশ্ন করল, "কি রে, তুই নাকি রাঘপ্পাকে বলেছিস রত্না ছাড়া অন্য কাউকে বিয়েই করবি না ? সত্যি নাকি ?"

কিট্টী স্পষ্ট স্বরে জবাব দিল, "হ্যাঁ"। সে বুঝল দেসাঈজীর কৃপায় মস্ত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সেদিন ঠাকুরের সামনে আরো একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বেলে গঙ্গব্বা গোপন্নার দীর্ঘায়ু কামনা করল।

18. প্রস্তুতি

বিবাহের জিনিসপত্র কেনাকাটার তালিকা প্রস্তুত করার সময় ঘনিয়ে এল। গঙ্গব্বার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটা ওর ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসলে ওর সঙ্গে এ কাজের কোন সম্বন্ধই নেই। মেয়ে দেখতেও চাইল না সে, বলল 'যার দরকার সে তো দেখেছে, আমি আর কি করব দেখে ?" কিট্টীর সঙ্গে সে বিয়ে সংক্রান্ত কোন আলোচনাই করে না কিন্তু দেসাঈজীকে কি কি বলতে হবে তা ও ভেবে ঠিক করে রেখেছে। সে বলবে, বিয়েতে দু তরফেরই পুরো খরচ দিতে হবে রাঘপ্পাকে এবং দশজনের সামনে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কিট্টীকে কথা দিতে হবে যে সে কোন কারণেই শ্বশুরবাড়িতে বাস করবে না, নিজের বাড়িতেই থাকবে। রাঘপ্পাকে বরদক্ষিণা দিতে হবে এক হাজার টাকা।

এত সহজে বিয়েটা ঘটে যাবে এটা কিট্টী স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন সে নিজের সম্বন্ধে যা কিছু ভেবে এসেছে তা ছিল একেবারেই অন্যরকম। সামাজিক রীতিনীতি এবং মানবজীবনের সুখ, আনন্দ এ সব জিনিসগুলো সম্বন্ধে তার এতদিন বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। মায়ের ছত্রছায়ায় বড় হওয়ার ফলে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও তার সচেতনতার অভাব ছিল। কেউ তাকে কখনও বলেনি, "বাঃ তুমি তো বেশ চালাক ছেলে !" বরং "তোমার মা বহু কষ্ট করে তোমায় বড় করেছেন" সদাসর্বদা এই কথাটাই শুনতে অভ্যস্ত ছিল সে। শুনতে শুনতে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার আর সব অনুভূতি এতকাল চাপা পড়ে গিয়েছিল আর তারই ফলে বাঘ না হয়ে ছাগলের মতো বড় হয়ে উঠেছে সে (অবশ্য হুসেনকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চয় ওকে বাঘই বলবে)। মা অনেক উপকার করেছেন তা ঠিক কিন্তু তাই বলে কি সারাটা জীবন সেই কৃতজ্ঞতার বোঝা টেনে চলতে হবে ? সব মায়েরাই তো সন্তানকে যত্ন করে পালন করে থাকে। তার মা যদি এতই ভালবাসে তাহলে তার এই বাসনাটার পথে বাধা দিচ্ছিল কেন ? এতই

যদি স্নেহ তাহলে দেসাঈজীর কাছে যে হাজার টাকা জমা আছে তার থেকে কখনও একশ'টা টাকাও খরচ করে কিট্টীকে একটু ভাল জামা কাপড় করিয়ে দেয়নি কেন ? সেটুকু করলেও তো দশ বছরের স্কুল জীবন তাকে দুটি মাত্র সার্ট আর দুটি হাফপ্যাণ্ট পরে কাটাতে হত না। খাঁকি হাফপ্যাণ্ট পরে আপিস গিয়ে চাপরাশীদের কাছ থেকে পর্যন্ত বিদ্রূপ কুড়োতে হত না। চাকরী করেও এখনও আমার ধুতির অভাব ঘোচেনি। এত ভালবাসে মা, এ সব কি তার চোখেও পড়ে না ? ঐ হাজার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা খরচ করলেই কি আমার একজোড়া ভাল ধুতি কেনা যেত না ? একদিক থেকে দেখতে গেলে জীবনটা আমার এতদিন বৃথাই কেটেছে। এখন চাকরী করছি, এখন অন্তত আমায় একটা মানুষ বলে স্বীকার করবে তো ? কাছারিতে কত দৌড় ধুপ করে দু পয়সা রোজগার করে আনছি এখনও মা আমাকে পুতুলের মত নাচিয়ে নিজের অহঙ্কারকেই তৃপ্ত করছে—এই ধরনের সব স্বগতোক্তি সমস্তক্ষণই চলছিল কিট্টীর মনে—মা তুমি অনেক উপকার করেছ কিন্তু আমারও তো একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কি কোন দাম নেই ? এখনও কি আমি তোমার কোলের খোকা ?—সত্যি যদি আমায় ভালবাসতে তাহলে তুমি আমায় বাধা দিতে না মা, আমার জীবনের চেয়ে তোমার মনের বিদ্বেষেরই দাম বেশী তোমার কাছে। তুমি আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ এই কথাটাই ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে চাও সর্বদা—এই ধরনের সব বড় বড় অথচ স্বার্থান্ধ কথাবার্তা সমস্তক্ষণই মনে মনে বিড়বিড়িয়ে রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছিল কিট্টী কিন্তু বলে ফেলবার সুযোগ পেল না, তার আগেই চট করে বিয়েটা স্থির হয়ে গেল কাজেই স্বগতোক্তিও বন্ধ হয়ে গেল ধীরে ধীরে। এত সহজে কার্যসিদ্ধি হতে দেখে শুধু বিস্ময় আর আনন্দই নয়, মামার অসীম কর্মকুশলতার প্রতি শ্রদ্ধায়ও ভরে গেল ওর হৃদয়। নিজের মাকেও কয়েকদিন ওর দেবীর মত মনে হতে লাগল। মা অবশ্য কিট্টীর কৃতজ্ঞ ভাব লক্ষ্যও করছে না। যাই ঘটুক সবই সহ্য করতে হবে এইরকম একখানা ভাব নিয়ে, মুখ বুজে নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে কিট্টীর মনে নতুন নতুন চিন্তার উদয় হচ্ছে। ভাবছে, আরে ! আমার বিয়ে ? আমি গৃহিনী আনতে যাচ্ছি। অমন নারীরত্নকে এই বাড়িতে এনে তুলতে লজ্জা করবে না ? আমাদের এই দৈন্যদশা দেখে সে যদি ঠাট্টা করে ? সবাইকার কাছে হয়ত গর্ব করে বলেছে 'আমার স্বামী চাকরী করে', তারপর এখানে এসে আমাদের ভাঙা-চোরা হাঁড়ি কুঁড়ি দেখে চটে যাবে না তো ? ওর কাপড় চোপড়ের খরচ কি রকম কে জানে। ওকে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া ভাল যে কোনরকমে আগে মায়ের মন জয় করতে হবে। ও মেয়ে তো বোকা নয়, মাকে ও বশ করে নেবে দু চার দিনেই। দত্তকের কথাটা শুনেই মা বিয়েতে মত দিয়েছে, রত্নার রূপ দেখে নিশ্চয় খুব খুশী হবে। এখন যেমন পাঁচজনের সামনে 'আমার ছেলে' বলে দেখিয়ে গর্ব করে বউকেও নিশ্চয় সেইভাবেই সকলকে দেখিয়ে বেড়াবে।

মাঝে মাঝে নিজের আসক্তির তীব্রতা দেখে নিজেই ভয় পেত কিট্টী। ভাবত, আচ্ছা,

রত্নাকে বিয়ে করার জন্য এই যে আমি প্রায় ক্ষেপে উঠেছি এটা কি ঠিক? জিদ করে পাওয়া জিনিস যদি ভাল না হয় তখন টিটকারি শুনতে হবে। ভাল করে ভেবে চিন্তে জিদ ধরলেই বোধ হয় ভাল হত। সেই এক ভূতচতুর্দশীর দিনই ওকে ভালভাবে দেখেছি, তারপর থেকে যখনই দেখেছি তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে পড়েছে। এত উতলা হয়ে যে কাজ করতে যাচ্ছি তার পরিণাম কেমন হবে কে জানে। যাক্ গে, যা হবে তা হবে।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ—ইতরজনেরা তো মিষ্টান্ন পেলেই খুশী, যে আসলে বিয়েটা করতে যাচ্ছে তার কত সঙ্কট কে বোঝে!

দত্তক নেওয়ার কথায় কিট্টীও খুব খুশী। মামা মনে মনে এই স্থির করে রেখেছিল সে কিন্তু এতদিন কিছুই বুঝতে পারেনি। মামা মামী সত্যিই ওকে নিজের ছেলে মনে করে এটা জেনে সে পুলকিত। সেই ভূতচতুর্দশীর দিন রাঘপ্পা কত আগ্রহভরে বলেছিল 'এখানেই খেয়ে যাও, এটা কি তোমার বাড়ি নয়?' অসুস্থ চম্পক্কাও কোনরকমে উঠে এসে খাওয়ার কাছে বসে ঘি-এর বাটি ভরে দিয়েছিল, সেই সব ঘটনা এখন নতুন অর্থ নিয়ে প্রতিভাত হল ওর দৃষ্টির সামনে।

দুটো বড় সমস্যার কথা কিট্টী ভাবছিল। প্রথম, বিয়ের খরচ এবং দ্বিতীয়, রত্নাকে কিছু উপদেশ দেওয়া যায় কি ভাবে। গঙ্গম্বা দু দিকের খরচই মামার ঘাড়ে ফেলতে চায় এটা কিট্টীর একটু অনুচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু তার নিজেরও পয়সা খরচ না করে হোটেলে খাবার অভ্যাস হয়েছে কাজেই শেষ পর্যন্ত ওটা সে মেনেই নেবে ঠিক করেছে। তাছাড়া ওর বিশ্বাস মামা ওকে নিজের ছেলে মনে করে সব খরচ খুশীমনেই করবে। তাহলেও বিয়ের খরচের জন্য অন্তত পাঁচ সাতশ' টাকা ওদের থাকা উচিত। কাপড় চোপড়, গহনা, মেয়েপক্ষকে দেবার জন্য শাড়ি ইত্যাদি, তাছাড়া বন্ধুদের চা খাবার, পেয়াদা চাপরাশীদের বখশিস্ এই রকম কত খরচই তো আছে। বরদক্ষিণা তো পাওয়া যাবে বিয়ের দিন। সেই পর্যন্ত খরচ চলবে কি ভাবে? মা তো একেবারে চুপচাপ। এখন অন্তত রাগ দ্বেষ ভুলে এ সব আলোচনা করা কি উচিত নয় কিট্টীর সঙ্গে? কিন্তু কিট্টীকে যিনি খাঁকি হাফপ্যান্ট পরিয়ে আপিস পাঠাতে পেরেছেন তিনি কি আর এখন বদলে যেতে পারেন? এ বিয়েতে কিট্টী অপমানিত হলেই বা ওঁর কি এসে যায়? উনি বিয়ের অনুমতিটা দিয়ে ফেলেছেন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হয়ত বিয়ের সভায় শেষটা অপমানিত হতে হবে। মার বোঝা উচিত যে আমিও বড় হয়েছি, সব কথা আমারও জানা দরকার, এই সব ভেবে মাকে প্রশ্ন করল কিট্টী, "মা, বিয়ের খরচ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ কি?"

"তোমার মামা মেয়ে দিচ্ছে, সে খরচ করবে না?" বলে উঠল গঙ্গম্বা।

"তা তো করবে, তবে কতটা? ছেলের জন্য কাপড় চোপড়, খাওয়া দাওয়া এসবের জন্য খরচ করবে। কিন্তু কাপড় গহনা ইত্যাদি আমাদের কি কিছুই করবার নেই?"

"যে বিয়ে করছে তার এসব কথা ভাবা উচিত।"

"হ্যাঁ, তাই বল, সোজাসুজি বলে দাও তুমি কিছু করতে চাও না। যা করবার আমিই করব।"

"আমার বলার কি দরকার ? চোখে কি কিছু দেখতে পাও না, আমি করব কোথা থেকে ? তুমি রোজগার করছ, তুমি করো।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর কিট্টী ঢোঁক গিলে সাহস করে বলে ফেলল, "দেসাঈজীর কাছে শুনেছি হাজার টাকা রাখা আছে ?"

"হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে ? তুই কি পাগল হয়েছিস ? আসবে কোথা থেকে অত টাকা ? হাজার টাকা থাকলে আর এই রকম কাপড় পরে থাকি ? এধার থেকে ওধার সেলাই করা পরণের লাল শাড়ীটা দেখাল গঙ্গৱা।

কিট্টী চোখের আড়াল হতেই সেদিন দেসাঈজীর কাছে গিয়ে বলে এল গঙ্গৱা, কিট্টী এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় ওঁর কাছে কিট্টীর মার কোন পয়সাকড়ি জমা নেই।

ভাবী পত্নীকে দেখার আশায় কিট্টী ইতিমধ্যে বার পাঁচ ছয় মামার বাড়ি গেছে। প্রতিবারই চা জলখাবার খেতে হয়েছে কিন্তু রত্নাকে একান্তে একবারও পাওয়া যায়নি। এক ঝলক দেখা অবশ্য হয়েছে। রত্না আজকাল কাছা দিয়ে শাড়ী পরতে শুরু করেছে। মহবুবজান ওকে গন্ধর্ব ঢঙে কাছা দিয়ে শাড়ী পরতে শিখিয়েছিল কিন্তু রত্না এখনও ওটা ঠিক গুছিয়ে পরতে পারে না। কোনরকমে শাড়ীখানা জড়িয়ে সে এমনভাবে হাঁটছিল যে একদিন কিট্টীর হঠাৎ দেখে মনে হল, রত্না খোঁড়া নাকি ? ছাঁৎ করে উঠল বুকটা। সব কথা জেনে অবশ্য সন্দেহ দূর হল ওর। একদিন ওর মনে হল রত্না যেন একটু ট্যারা, আর একদিন মনে হল রত্না বোধ হয় একটু তোত্‌লা। মাঝে মাঝে ওর রূপ সম্বন্ধেও কিট্টীর মনে খটকা লাগত। বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর মনের খুশীতে রত্নার শরীরটি আরো ভরাট হয়েছে, রংটাও হয়েছে উজ্জ্বল, তাকে দেখতে লাগে যেন গৌরী, কিন্তু কিট্টীর সন্দেহ হতে লাগল ওর গায়ের রংটা খাঁটি কিনা, মহবুবজানের শেখানো প্রসাধনকলার গুণেই রঙের অত বাহার নয় তো ? ভেবে ভেবে শেষে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ভাবনা করাই ছেড়ে দিল কিট্টী।

অবশেষে একদিন নিভৃতে দেখা হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। কিট্টীর বার বার ঘোরাঘুরির আসল কারণটা বুঝে রসিক রাঘপ্পা স্ত্রীকে একটু টিপে দিয়েছিল। চম্পক্কার এসব ব্যাপারে বড় ভয়। একদিন দূর থেকে কিট্টীকে আসতে দেখেই চম্পক্কা রত্নাকে বলল, "তোর বর বোধ হয় তোকে কিছু বলতে চায়, আমি বাড়ির পেছন দিকেই থাকছি, তুই ভয় পাসনে যেন। বেশী কথা বলবি না, বলতে নেই। কানে কানে আরো কিছু উপদেশ দিয়ে সে চলে গেল খিড়কির দিকে। রত্না উঠানের পাশের ঘরে গিয়ে বসল খবরের কাগজখানা নিয়ে।

ভাবী পত্নীকে পাঠমগ্না দেখে আশা আর আশঙ্কায় ঘেমে উঠল কিট্টী। সরস কোন কথা চট করে মনে না পড়ায় জিজ্ঞাসা করল "বাবা বাড়ি নেই ?"

রত্না ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল যেন এতক্ষণ কিট্টীকে দেখতেই পায়নি, বলল "না।"

"মা কোথায় ?"

' পেছন দিকে নিমপাতা তুলছে।"

একলা দেখা হওয়ার উত্তেজনায় একটুক্ষণ কেউই কথা বলতে পারল না। তারপর কিট্টী প্রশ্ন করল, "আমার মাকে তুমি দেখেছ ?"

"না তো।"

"তোমার বাবা মা যাই বলুন না কেন আমার মায়ের মতো উদার হৃদয় দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি পাবে না।"

"নিজের মাকে সবারই ওরকম মনে হয়।"

"না না, আমার মা সত্যিই সাক্ষাৎ দেবী। এই বিয়েতে যে তিনি রাজী হয়েছেন এটা কতখানি মহত্ব তা কল্পনা করতে পার ?"

"না তো।"

"যখন আমাদের বাড়ি যাবে ওঁকে প্রসন্ন রেখো। তুমি তাঁর সেবা করলেই আমি খুশী হব।"

"তাহলে আপনার সেবা কে করবে ?"

"আমারও করবে ওঁরও করবে, কিন্তু ওঁর সেবাটাই আসল। উনি খুশী থাকলেই আমিও সন্তুষ্ট থাকব।"

"আমার যতদূর সাধ্য আমি করব।"

"শুধু আমাকে খুশী করার জন্যই বোধ হয় একথা বলছ ?"

"তাহলে তাঁকেও বলে দেবেন বৌকে কষ্ট দিয়ে যেন না কাঁদান।"

"কিট্টী একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল এবং বিরক্ত হয়ে বেশ জোর গলায়ই বলে উঠল, "হ্যাঁ, ওঁর সেবা করব, এই কথাটুকু পরিষ্কার বলতে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ সেবা করব" এইটুকু বলেই ফুঁপিয়ে উঠল রত্না, চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়েছে গালের ওপর, শাড়ীর আঁচল তুলে মুছে নিল।

"না না, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য বলিনি আমি, তোমার ভালর জন্যই......"

"কেন ? 'শাশুড়ির সেবা করো না' এই শিক্ষা দিয়েই কি আমার বাবা মা আমাকে পাঠাচ্ছেন ?" বলতে বলতে আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

কিট্টী ভাবল রত্নার তাহলে মায়ের সেবা করতে আপত্তি নেই। আমিই শুধু শুধু বোকার মত প্রশ্ন করে সরলমনা মেয়েটিকে অপমান করে বসলাম। খুশী মনেই সে এগিয়ে এল রত্নার চোখের জল মুছিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ মায়ের কানে কানে দেওয়া উপদেশ মনে পড়ল রত্নার, সে কয়েক পা পিছিয়ে চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিট্টীর আঙ্গুলে তখনও রত্নার অশ্রুর উষ্ণ স্পর্শ। আঙ্গুলটা তুলে সে ছোঁয়াল নিজের ওষ্ঠে।

কিট্টী এবার অন্য সব ব্যবস্থায় লাগল কোমর বেঁধে। তার মনে হচ্ছে, মায়ের কোন উৎসাহ না থাকলেও বিয়েটা ধুমধাম করেই হওয়া উচিত। মাসখানেক পূর্বে এক

ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে দালালীর কাজ করে থাকে। তার একটা কাজ করে দিয়ে কিট্টী কুড়ি টাকা পেয়েছিল। তারই দোকানে গেল সে।

সাদরে অভ্যর্থনা জানাল দোকানদার। দোকানে বসে বসে কিছুক্ষণ তার কাজকর্ম দেখল, কথা শুনল এবং একটু পরেই কিট্টী তার কাছে ধার চাইল হাজার টাকা। আশা করছিল হাজার চাইলে অন্তত চার পাঁচশ পাওয়াই যাবে। শেঠজী কিন্তু তারই দোহাই দিয়ে বলল, "সাহেব তুমি যে গুড় ট্রান্সপোর্টের লাইসেন্স দিয়েছ তাতেই তো এখন সব টাকা লাগিয়েছি। এক মাস অপেক্ষা কর, কিছু না হোক দু চারশ নিশ্চয় দিতে পারব।" এরপর ব্যবসায়ের নানা অসুবিধার কথা তুলল কিন্তু কিট্টীর কেমন অপমানিত মনে হল নিজেকে। শেঠজী অবশ্য আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করেনি, রুটি মাখন চা সবই খাইয়েছে। বিদায় নেবার সময় শেঠ জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবেন তো ?' কিট্টী জবাব দিল, "আপনাকে বাদ দিয়ে কি বিয়ে হতে পারে ?"

"নিমন্ত্রণ পেলে কিছু ভেট দিয়ে আসব, নাহলে আপিসে তো দেখা হবেই", বলেই হেসে উঠল শেঠজী। হাসিটা কিট্টীর মর্মে গিয়ে বিঁধল।

আরো দু একটা জায়গা ছিল কিন্তু তারাও যদি শেঠজীর মত কথা বলে ? ভেবে চিন্তে আর কোথাও গেল না কিট্টী কিন্তু টাকার সমস্যাটা মাথায় বোঝার মত চেপে রয়েছে। অবশেষে একদিন মরিয়া হয়ে দেসাঈজীর কাছেই গিয়ে সমস্যাটা তুলল।

দেসাঈজী বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকাকড়ির কি ব্যবস্থা হল জানবার জন্য আমিই তো তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম, তারপর মনে হল আগে জিনিসপত্রের তালিকা তো প্রস্তুত হোক। এবার আসল কথা খুলে বলা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিট্টী বলল, "গোপন্নাজী, এখন তো মাঁর অন্তত রাগটা কম করা উচিত। বিয়েতে কি কিছুই খরচপত্র নেই ? এ সম্বন্ধে কিছু তো আলোচনা করতে হবে ?"

"সে নিজে থেকে না বলে'তো তুমিই কথা তোল। কেন, মায়ের সঙ্গে এসব কথা বলতে কি তোমার লজ্জা হচ্ছে ?"

"বলেছিলাম, কিন্তু মা তো বলছেন তাঁর কাছে এক পয়সাও নেই। এই সময় তাঁর এ ধরনের কথায় আমার মনে খটকা লাগছে। সবাই বলে আমার বাবার প্রচুর টাকাকড়ি ছিল। সবই কি গেছে, কিছুই কি বাঁচেনি ? অন্তত এক হাজার টাকা তো..."

দেসাঈজী মুখভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত না করে বললেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, থাকলে নিশ্চয় দেবে। এখন যদি তোমার দরকার থাকে আমিও দু চারশ' দিতে পারি। পরে বরদক্ষিণা পেলে শোধ করে দিও।"

"আপনার মত গুরুজনই আমার ভরসা। আপনার কথায় কিছুটা সাহস হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পরিবারে তো এই একটাই বিয়ে হবে, এতেও যদি মা একেবারে কিছুই খরচ না করতে চায় তাতে কি আমার দুঃখ হয় না ? মায়েরই তো বেশী উৎসাহ হওয়া উচিত। অথচ তিনিই বলছেন এক পয়সাও নেই। এত ছিল, আর আজ হাজারটা টাকাও নেই, আমারই দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব ?"

' কিছু বেঁচেছে নাকি ? মাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো, জিজ্ঞাসা করতে আর লজ্জা কি ? সাহেব হয়েছ তো আপিসেই হয়েছ, বাড়িতে কি ?"

"আমার মা আপনার কাছে কিছু টাকা রেখেছেন কি ?" প্রশ্নটা কিট্টীর মুখের গোড়ায় এসে গেলেও উচ্চারণ করতে সাহস হল না। বিয়েটা দেসাঈজীর কৃপাতেই ঘটতে যাচ্ছে, ওঁর সামনে চোটপাট কথা বলাটা ঠিক হবে না।

কিট্টীর বিদায় নেবার সময় দেসাঈজী তাকিয়ায় ভাল করে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি, মেয়ে তুমিই নির্বাচন করেছ, তাই খরচও তুমিই করো, একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু এখনও আমাদের মনে এটুকু অহংকার আছে যে ছেলে আমাদেরই, এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আশা করি তুমিও সেইভাবেই চলবে ?"

কিট্টীর ধারণা ছিল না যে দেসাঈজীও এভাবে কথা বলতে পারেন। পয়সার ব্যাপারে সারা দুনিয়া একই রকম ভাবতে ভাবতে বিমর্ষ মনে বেরিয়ে এল কিট্টী, দুঃখ আরো এইজন্য যে আমার নিজের টাকাই আমায় অন্যের কাছে চাইতে হচ্ছে।

পাটিপত্রের সময় মেয়ে দেখানোর অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হল দেসাঈজীর বাড়িতেই। পাড়ার লোকেরা এলেন। গঙ্গব্বা মেয়ে দেখবে না বলে জিদ ধরে বাইরেই বসে রইল। তবু রত্না এসে যখন প্রণাম করল একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু সেই এক নজরেই গৌরী রত্নার রূপের দীপ্তি মনে ছাপ রেখে গেল ওর। মনে মনে খুশী হয়েই ভাবল গঙ্গব্বা, দেখতে সত্যিই সুন্দর আর সরলও মনে হচ্ছে। যেমনই হোক ভালই হয়েছে।

দেসাঈজীর সবরকম শর্ত রাঘপ্পা স্বীকার করে নিল মৃদু হাসিমুখে। দত্তকের কথা তুলতেই সে কুলদেবতা বেঙ্কটেশের নামে শপথ নিল। কিট্টীও কথা দিল দত্তক গ্রহণের পর সে আলাদা হয়ে যাবে না, মায়ের সঙ্গেই বাস করবে। পারিবারিক ব্যাপার এমন সবিস্তারে পাড়ার লোকের সামনে আলোচিত হওয়ায় এবং এভাবে পাঁচজনের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তাকে অবিশ্বাসের পাত্ররূপে চিহ্নিত করায় কিট্টী বেশ অপমানিত বোধ করছিল। কিন্তু এসব একেবারে অনাবশ্যকও নয়। যা হোক ভালয় ভালয় সব ব্যাপার চুকে গেল দেখে সে সন্তুষ্টও হল শেষ পর্যন্ত।

দিন এগিয়ে আসছে, টাকার চিন্তাও বাড়ছে। চঞ্চল স্বভাব, অস্থিরমতি, প্রায় ছেলে-মানুষ ভীতু ভীতু এই সাহেবটিকে টাকা ধার দিতে কোন পার্টিই রাজী নয়। সবাই কিছু না কিছু অজুহাত দেখাচ্ছে। তাছাড়া সবাই বুঝে গিয়েছিল কিট্টী চটলেও তাকে রুটি মাখন বা কৃষ্ণাপ্পার দোকানের দোসা খাইয়েই আবার খুশী করে দেওয়া যাবে। তার স্বভাবই ঐ রকম। কাজেই শেষ পর্যন্ত আপিসের ন্যায্য পাওনাটুকু ছাড়া আর কিছুই যোগাড় হল না কোথাও থেকে।

বিয়ের আর দু এক সপ্তাহ মাত্র বাকি। একদিন কিট্টী আপিসের টেবিলে কনুই দিয়ে দুহাতের ওপর মুখ রেখে বসে ছিল চুপ করে। জর্জ ওকে ডেকে নিয়ে গেল চা খেতে। আশ্চর্য হয়ে ভাবল কিট্টী জর্জ তো চারটের আগে চা খায় না কখনও, আজ নিজে

থেকে ওকে এই অসময়ে চা খেতে নিয়ে চলেছে কেন ? ক্যাণ্টিনের দিকে যেতে যেতে জর্জ কিট্টীর কাঁধে হাত রেখে ডাকল "এই !"

বহুদিন বাদে কিট্টীর চোখে জল এল। সে দুঃখ পেয়েছে, সহ্য করেছে, লাথি খেয়ে লোকের পায়ে ধরেছে কিন্তু এতদিনের মধ্যে চোখের জল ফেলেনি। এক ইংরেজ কবি বলে গেছেন, 'কাঁদবার জন্যও ঈশ্বরের দয়া চাই।'

জর্জ ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেদিন পাঁচশ' টাকা ধার দিয়েছিল।

19. সুরহারা মঙ্গলধ্বনি

বিয়েবাড়িতে মহবুবজানের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তার ওপর প্রসন্ন বলতে এখন শুধু বাড়ির যজমান। ভারী শাড়ী পরে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এদিক ওদিক করতে করতে চম্পক্কা এসে মাঝে মাঝে কথা বলছে বটে কিন্তু অসুস্থ শরীরে বিয়ের খাটাখাটুনি করতে করতে অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সে প্রতি কথায়ই রেগে উঠছে। সে যখন মহবুবের সামনে কাউকে ব'কে উঠছে তখন মহবুবের কেমন মনে হচ্ছে যেন কথাগুলো তাকেও শোনান হচ্ছে। বিয়েবাড়িতে সে কারও কাজেও লাগতে পারবে না, নিজেও অস্বস্তি বোধ করবে এই ভেবে মহবুব আগেই যজমানকে বলেছিল যে সে একেবারে অগ্নি প্রদক্ষিণের সময়ই আসবে কিন্তু রাঘপ্পা কোন কথা শোনবার পাত্রই নয়। সে জিদ করে রাগারাগি করে এমন কি পান সুপারি পর্যন্ত না নিয়ে অভিমান করে কথা আদায় করে ছেড়েছে যে বিয়ের অন্তত চারদিন আগে থেকে মহবুবকে আসতেই হবে। বিয়েবাড়িতে তার উপস্থিতি সবাইকারই অসুবিধার কারণ হবে এটা মহবুব আগেই আন্দাজ করেছিল কিন্তু প্রত্যেকটা দিনই এতখানি অসহনীয় হয়ে উঠবে এটা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। প্রতি মুহূর্তেই ছোঁয়া যাবার প্রশ্ন উঠছে। খেয়ে উঠে এ'টো পাতাটা ওকে নিজেই ফেলে আসতে হয়। জায়গাটা গোবর জল দিয়ে মুছতে হয়। একটা কিছু জিনিসের দরকার হলে বাড়ির মেয়েদের একঘণ্টা খোসামোদ করতে হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যাপারে ক্রমশই ওর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আচার বিচারওয়ালা মহিলারা তো ওকে রীতিমত ঘৃণার চোখে দেখছেন। মণ্ডপে তরুণী মেয়ের দল দুষ্টুমি করে যজমানের নাম নিয়ে ওর কাছে পানসুপারি চাইতে আসছে এবং তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিতামাশা চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। মহবুবজানের দিনে অন্তত বিশ কাপ চা খাওয়া অভ্যাস, সে জায়গায় দু তিন কাপও জুটছে না। যজমান যখন এদিকে আসে তখন অবশ্য এককাপ পাওয়াই যায় কিন্তু অন্য সময় সে নিজে চেয়ে খেতে পারে না। চা এর অভাব তাই সে তামাক দিয়ে পূরণ করতে চেষ্টা করছে। এছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হাতে কোন কাজ নেই।

বিয়েতে মহবুবের করার মত যেটুকু কাজ ছিল তা তো শেষ হয়ে গেল একদিনেই। বিয়ের মণ্ডপ সাজানোর কাজটা সে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়েছে। ছ সাত বছর পূর্বে সে শেষশায়ী নাটক কোম্পানীতে কাজ করত, এই সময় ঐ নাটকের দলটা এসেছে ধারবাড়ে, খবর পেয়েই মহবুব একটা টাঙ্গা নিয়ে গিয়েছিল দেখা করতে। কোম্পানীর মালিক পরমেশ্বর ভট্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে কিছু পরদা চেয়ে এনে বিবাহমণ্ডপটিকে সে সাজিয়েছিল রঙ্গমঞ্চের মত করে। রঙীন কাগজের বাহারী লেস্‌ও সে যোগাড় করে এনেছিল। তাছাড়া চিন্না রেড্ডি নামে এক আর্টিষ্টকেও ডেকে এনে যত্ন করে চা জলখাবার খাইয়ে তাকে দিয়ে রঙীন কাপড়ে তুলোর 'স্বাগতম্' লিখিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিল মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে। কাগজের পুষ্পগুচ্ছ, বাহারী লেস ইত্যাদি দিয়ে তোরণটি সাজিয়েছে নিজের তত্ত্বাবধানে। বিয়ের মণ্ডপ ঠিক কেমন হয় সে সম্বন্ধে মহবুবের বিশেষ ধারণা ছিল না কিন্তু মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল যথেষ্ট তাই বিবাহ-মণ্ডপটিকেও সে প্রায় রঙ্গশালার মতই সাজিয়ে তুলেছিল। যজমানও তার ইচ্ছায় কোন বাধা দেয়নি। বিয়ের কদিন আগে থেকেই পথচলতি মানুষও ভেতরে এসে মণ্ডপের সাজসজ্জা দেখে যাচ্ছিল এবং প্রত্যেকেই মহবুবের রুচির প্রশংসা করছিল। কিন্তু বিয়ের আগের দিন থেকেই অতিথি সমাগমও বেড়েছে এবং আহারাদি নিয়ে আচার বিচারের ঝঞ্ঝাটও শুরু হয়েছে, ফলে মহবুবকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। মণ্ডপের শোভা এবং মহবুবের কৃতিত্ব এখন আর কারও মনে নেই।

এরপর মহবুবের উপযুক্ত কাজ ছিল কনে সাজানো। রত্নাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শাড়ী পরিয়ে, নতুন নতুন ছাঁদে কবরী রচনা করে, কুমকুম চন্দনে ললাট অলঙ্কৃত করে মহবুব তার প্রসাধনকলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। বাড়ির বৃদ্ধাদের এসব বিশেষ পছন্দ নয় কিন্তু রত্না মহবুবক্কা ছাড়া কারও কাছে সাজবেই না। যতই বকুনি শুনুক জরীপাড় শাড়ী নিয়ে সে ঠিক মহবুবক্কার কাছেই গিয়ে হাজির হবে। উঠানের বাঁদিকের ঘরটি ছেড়ে মহবুব যেন কোথাও না যায় রত্না কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে। রত্না এলে মহবুবেরও মনে হয় বিয়েবাড়িতে সে তবু একটা কিছু কাজ করছে। রত্না চলে গেলে তার মনে হয় সব ফাঁকা, পান সুপারিও আর ভাল লাগছে না। রূপোর ডিবে খুলে চূণ বার করে মহবুব যখন তামাকের সঙ্গে মিলিয়ে খৈনী প্রস্তুত করে আর পানের বোঁটা ভেঙে মুখে দেয় তখন আশে পাশে অন্তত দশ বিশটা বাচ্চা ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে আর তাদের মায়েরা মহা বিরক্তিভরে চড়চাপড় লাগিয়ে তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় সেখান থেকে। এ সব ছাড়া শোবার জায়গা নিয়েও সমস্যা কম নয়। প্রথম দিন তো ক্লান্ত হয়ে যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। মহবুব কোথায় শোবে জিজ্ঞাসা করতে ওর লজ্জা করছিল। খিড়কির দিকে খোলা জায়গায় একটি ঝি শুয়েছে দেখে সেইখানেই নিজের চাদরখানা পেতে সবুজ রঙের শালখানা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল মহবুব। কিন্তু ভোরে উঠেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল রাঘপ্পার, ওর সবুজ শালখানা দেখেই চিনেছে সে। মহা ক্ষেপে রাঘপ্পা স্ত্রীকে বকাবকি আরম্ভ করে দেয়। সত্যি বলতে কি

পেছনদিকের উঠানে সে বেশ আরামেই শুয়েছিল কিন্তু রাঘপ্পার হুকুমে এখন তাকে বড় হলঘরে অন্য মহিলাদের সঙ্গে শুতে হচ্ছে এবং সহ্য করতে হচ্ছে তাদের বিরক্তি, অবজ্ঞা আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

কিন্তু এই সব কিছু গঙ্গব্বা সহ্য করে যাচ্ছে একটা বিশেষ কাজের কথা ভেবে। বিয়ের পর ফুলশয্যার ব্যবস্থাও রাঘপ্পার বাড়িতেই হয়েছে। কিট্টীর ভাড়াটে বাড়ি বড়ই ছোট তাই দেসাঈজী তাঁর বাড়িতেই ঐ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাঘপ্পার জিদের ফলে শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে ফুলশয্যা হবে এ-বাড়িতেই। মহবুবের একান্ত বাসনা ফুলশয্যার খাটখানি সে নিজে হাতে সাজাবে। ঐ দিনটির অপেক্ষায় সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। ফুলশয্যার ঘরে জ্বালবার জন্য বিশেষ ধরনের ধূপকাঠি প্রস্তুত করে নিজের ছোট বাক্সটিকে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে, সব কষ্ট সে মুখ বুজে সহ্য করে এখন প্রতীক্ষা করছে ঐ বিশেষ দিনটির জন্য।

অগ্নি প্রদক্ষিণের এখনও একঘণ্টা বাকি। এগারো রকম ফুলের অর্ধচন্দ্রাকার মালায় রত্নার খোঁপাটি সাজিয়ে দিল মহবুব, তারপর বাকি প্রসাধন সমাপ্ত করে ওকে একটু হাঁটিয়ে দেখল কেমন দেখাচ্ছে। আরো কিছু ক্রিয়াকর্ম বাকি আছে, তার জন্য রত্নাকে পাঠিয়ে দিয়ে মহবুব নিজের রূপার চূণের ডিবাটি বার করল। চারপাশের সোরগোল যেন ওর কানেই যাচ্ছে না। বাইরে সানাইয়ে বাজছে তখন তোড়ি রাগিণী। ধারবাড়ের শ্রেষ্ঠ সানাইওয়ালাকে এনেছে রাঘপ্পা, তোড়ির আলাপ বাজাচ্ছে বড় সুন্দর। বাইরের প্রাচীরের দিকে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে মহবুব পানে চূণ লাগাচ্ছিল আর মগ্নভাবে শুনছিল সানাই। তোড়ির কোমল আলাপ যেন নদীর স্রোতের মত ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছিল সারা আকাশ বাতাস। হঠাৎ কেমন বেসুরো আওয়াজ? চকিত মহবুব সুপারি না দিয়েই পানটা মুখে পুরে ফেলল। সানাই বেসুরো নয়, মণ্ডপ থেকেই কেমন যেন গোলমাল শোনা যাচ্ছে। কেউ যেন রেগে উঠে সানাই থামাতে আদেশ দিল। সানাই থেমে যেতে গোলমালটা এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। চূণের কৌটো ট্রাঙ্কে ভরে গলায় ঝোলানো চাবী দিয়ে বাক্স বন্ধ করল মহবুব তারপর পানের সঙ্গী খৈনীটুকু না খেয়েই বাক্সের গায়ে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার আঁচলটা অল্প টেনে আল্লার নাম স্মরণ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বাইরে।

সমস্ত লোক মণ্ডপের মধ্যে এক জায়গায় জমা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি যে হয়েছে মহবুব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এখান থেকে। একটি মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে স্‌স্‌ বলে ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল, অন্যেরা কেউ কিছু জানেই না। ইতিমধ্যে লোকের ভীড়ে পথ করে থমথমে মুখে এক বিধবা মহিলা বেরিয়ে এসে মণ্ডপের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেলেন। মহবুব চিনল, আগের দিন একেই কেউ গঙ্গব্বা বলে ডাকছিল অর্থাৎ ইনিই বরের মা। এই মহিলাই চম্পক্কার নামে তর্পণ করে ফেলেছেন। যজমানও ছুটতে ছুটতে এল তার পেছনে পেছনে, গঙ্গব্বার পথ রোধ করে নিজের মাথার পাগড়ী রাখল তার পায়ের কাছে। বরও ছুটে এসে বলল, "মা চলো

যেও না।" অনুনয় বিনয় চলতে লাগল। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকছিল না মহবুবের। পেছন থেকে জরীদার পাগড়ীধারী আর এক ভদ্রলোকও এসে দাঁড়ালেন ঘটনাস্থলে। তাঁর দিকে ফিরে হাত তুলে জোর গলায় গঙ্গব্বা কি সব বলতে লাগল। তার উঁচু গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিন্তু লোকজনের হট্টগোলে গঙ্গব্বার কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে মনে হল, গঙ্গব্বা কিছুটা শান্ত হয়েছে। চেঁচামেচি থামিয়ে সে বাইরের চবুতারায় গিয়ে বসল। তার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে মহিলারা নিচুস্বরে কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু গঙ্গব্বা কাউকে লক্ষ্যই করছে না, সে একেবারে চুপ। যজমানও সেই পাগড়ীধারীকে নিয়ে উঠানের পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক দেঁতো ভট্ট। মহবুব তার মুখ চিনত। গতকালই ওর কাছে এসে তামাক চেয়ে হাসি ঠাট্টা করে গেছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

"হবে আবার কি, তোমার যজমানের যেমন কাণ্ড।"

"কেন, কি হয়েছে ? কিছু বলুন না ? আসুন তামাক নিন।"

"ব্যাপার তো সবাই জানে। তোমাদের বাড়ির লোকটি হাজার টাকা বরদক্ষিণা দেবে লিখে দিয়েছিল। এখন প্রদক্ষিণের একঘণ্টা আগে বলছে এখনকার মত পাঁচশ' টাকা নাও। বাকি সামনের মাসে দেব। ও আর দিয়েছে। রাঘোবা ভরারীকে সবাই চেনে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তামাক খাইয়ে আরো অনেক কথাই জেনে নিল মহবুব। বিয়েতে খরচ বেশী হয়ে যাওয়ায় বরদক্ষিণার টাকা থেকেও যজমান খরচ করে ফেলেছে। অন্য কোথাও থেকে যে টাকা পাবার কথা ছিল তাও পাওয়া যায়নি। বাক্সে এখন মাত্র সাত আটশ' টাকা পড়ে আছে, তাই অন্যান্য খরচের জন্য কিছু রেখে রাঘপ্পা এখন বেয়ান এবং দেসাঈজীকে মোটে পাঁচশ' টাকা দিতে চাইছে। সে বলছে দত্তক নেওয়ার শপথ তো করা হয়েই গেছে, কাজেই সমস্ত সম্পত্তিই তো এখন আপনাদেরই। একমাস অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি ? কিন্তু আগে থেকেই মনোমালিন্য ছিল, তার ওপর প্রদক্ষিণের মাত্র একঘণ্টা আগে এই কথা বলায় ওঁদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। গঙ্গব্বা এখন এক তিলও ছাড়তে রাজী নয়, সে বলেছে এই মুহূর্তে এক হাজার টাকা গুণে দিলে তবেই ছেলে ঘুরবে, নয়ত নয়। বোকা কিট্টী গিয়েছিল মাকে বোঝাতে, গঙ্গব্বা ক্ষেপে গিয়ে ছেলেকে বলেছে, 'আমাকে বাদ দিয়েই তুই বিয়ে কর।' একলাই বিয়ের আসর ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। দেসাঈজী এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ভরসা দিয়েছেন তাই এখনও চলে যায়নি গঙ্গব্বা। যজমান ঘরের মধ্যে দেসাঈজীর সঙ্গে কথা বলছে। কি অবিবেচনা দেখ দিকিনি, রাঘোবা ভরারীর কাণ্ড... বিয়েতে বাধা পড়ল, কতখানি অপমান...... ।

মহবুবের সমস্ত পুঁজি ঢালতে হয়েছে ভাগ্নের মুদির দোকানে। নিজের খরচের জন্য পঁচিশটি টাকা এবং আশীর্বাদের জন্য একশ' টাকা মাত্র সে সঙ্গে এনেছে।

ঘরের মধ্যে দেসাঈজীকে বসিয়ে বলে যাচ্ছিল রাঘপ্পা, "রাও সাহেব, গঙ্গব্বা কি আমার

পর ? কিটুণা কি পরের ছেলে ? বোনকে ধাপ্পা দেবার ইচ্ছা আমার এতটুকুও নেই। বিয়ে শাদীর ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন। এই তো কালকেই আমাদের এক দেঁতো ভট্ট বলছিল, 'রাঘোবা তোমার বাড়ির বিয়ের ঘটা দেখে তো জামখণ্ডীর মহারাজের বিয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কি করি বলুন, হিসেবের চেয়ে বেশী খরচ হয়ে গেছে। কাল রাত্রে বাক্স খুলে দেখি মাত্র আটশ' দশ টাকা পড়ে রয়েছে। কিছু খোয়া যায়নি তো, ভেবে হিসাবের খাতা খুললাম, দেখি হিসাব তো ঠিকই আছে। এক পয়সা এদিক ওদিক নেই। অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা, তাই শুভকাজে একটু দরাজ হাতেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে, এই সবেতে খরচটা বেশী হয়ে পড়েছে। ভেবেছিলাম কাল রাত্রেই আপনার কাছে যাব, কিন্তু তখন রাত দশটা বেজে গেছে, শুধু শুধু আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানো হত, তাই শেষ পর্যন্ত আর গেলাম না। সকালবেলাই আপনাকে সব জানাচ্ছি, আমি কিছুই লুকোইনি।"

"তা তো ঠিক রাঘপ্পা, কিন্তু আপনার এবং গঙ্গবার মধ্যে হৃদ্যতা যখন নেই তখন বিয়েতে এত ধূমধাম না করে নিজের কথা রাখার চেষ্টাটা করা উচিত ছিল। গঙ্গবাকে তো কিছুমাত্র দোষ দেওয়া যায় না।"

"রাও সাহেব, নিপ্পন্নাকে পাঠিয়েছি বিন্দ্‌গোলে, হনুমন্ত গোলের জায়প্পা শেঠের কাছে পাঠিয়েছি রামকে। ন'টার লগ্ন যদি পার হয়েও যায় সওয়া এগারোটায় আর একটা শুভলগ্ন আছে। এই দু ঘণ্টায় আমি টাকাটা যোগাড় করে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত পেরে না উঠি রাওসাহেব, সওয়া এগারোটার লগ্ন বয়ে যেতে দেবেন না, অনুগ্রহ করে আর একবার আমায় বিশ্বাস করুন। আমি আপনার পায়ে ধরছি। দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক এই তো শুরু হল। ফুলশয্যা বাকি এখনও। কন্যাপক্ষের নাকের দড়ি তো সর্বদাই বরপক্ষের হাতের মুঠোয়। এই সব বড় বড় লোকেদের সামনে অন্তত আমায় বেইজ্জত করবেন না, যেমন করে হোক আজকের মত আমায় উদ্ধার করুন। আপনার মত মাননীয় সজ্জন ব্যক্তির এগিয়ে এসে আমার মান রক্ষা করা উচিত।"

রাঘপ্পা সম্পর্কে দেসাঈজীর মনে যথেষ্ট অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। একবার মনে হয়েছিল টাকাটা উনিই দিয়ে দেন, কিন্তু মনে সন্দেহ দেখা দিল। কিট্টীকে টাকা দেওয়া এক আর রাঘপ্পাকে দেওয়া আর এক ব্যাপার। রাঘপ্পা টাকা লুকিয়ে রেখে নাটক করছে এটাও অসম্ভব নয়।

এদিকে রাঘপ্পা যা কিছু বলেছিল তার অর্ধেকটাই মিথ্যে, কিন্তু কিছু পরিমাণ সত্যও ছিল। বাক্সয় মাত্র আটশ' দশ টাকা পড়ে আছে এটা সত্যি কথা, এটাও ঠিক যে কয়েক জায়গায় টাকা পাবার আশায় ও দরাজ হাতে খরচ করেছে। তবে খরচটা বেশী হয়ে পড়েছে এটা ও টের পেয়েছে দিন পনেরো আগেই। হনুমন্ত গোঁড়ের মামলায় মধ্যস্থতা করার দরুন কিছু টাকা ওর পাওনা ছিল বটে কিন্তু সেখান থেকে কিছু আদায় হবার আশা কম এটাও বোঝা গিয়েছিল। বিয়ের আর তিন চার দিন মাত্র বাকি।

দেসাঈজীর কাছে গঙ্গব্বার কিছু টাকা জমানো আছে এ খবরটা কিট্টীর মারফৎ রাঘপ্পার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কথাটা শুনেই ওর মনে হয় সময় বুঝে বলে দিলেই হবে টাকা ফুরিয়ে গেছে। যদি সম্ভব হয় পাঁচশ' টাকা কম করে ফেলতে হবে। কিট্টী ছেলে ভাল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু হাজার টাকার যোগ্য ছেলে নয় এটা তো মানতেই হবে। যদি গঙ্গব্বা নিতান্তই জিদ করে তাহলে দিতেই হবে। ব্যাপারটা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে লোকে গঙ্গব্বাকেই নিন্দা করে। যদি সম্ভব হয় তো পাঁচ দশ দিনের মধ্যে শোধ করার আশ্বাস দিয়ে স্বয়ং দেসাঈজীর কাছেই পাঁচশ' টাকা ধার নিয়ে নেওয়া যাবে। কিট্টীর নিজের হাজার টাকা ফেরৎ দিতে যদি দেসাঈজী কখনও গড়বড় করেন তাহলে এই পাঁচশ' টাকা আটকে ফেললেই হবে।

বিয়ের ধূমধামে মত্ত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কোনরকম সন্দেহ দেখা দেয়নি বটে কিন্তু গঙ্গব্বা কিছুতেই নিঃসংশয় হতে পারছিল না। প্রদক্ষিণের একদিন আগেই সে দেসাঈজীর বাড়ি গিয়ে কথাটা তোলে।

"গোপন্না, বরদক্ষিণার টাকা নিয়ে ও যদি কিছু গোলমাল করে আমি কিন্তু চুপ করে থাকব না বলে রাখছি।"

"বিয়ের আয়োজনে যে রকম ঘটা দেখছি গঙ্গব্বা, তাতে মনে হয় না হাজার টাকা দিতে ও গড়বড় করবে।"

"ওর ঐশ্বর্য কি আমি জানি না গোপন্না ? ওর অনেক আছে, খরচও করে যথেষ্ট। ইচ্ছা করলে নিজের মেয়েমানুষের পেছনেই কত পয়সা ঢালবে। কিন্তু আমার সঙ্গে ও ইমানদারী করবে এতটা ভরসা হয় না। সবসময় ওর চেষ্টা কি করে আমাকে অপমানিত করবে। দত্তক নেবার কথায় লোভে পড়ে আমি রাজী হয়েছি এই কথাই ও বলে বেড়াচ্ছে এখন। কিন্তু অপমান সহ্য করতে আমি রাজী নই। যদি কোন কথার নড় চড় করে তাহলে আমি সোজা বলব, কিট্টী তুই যদি আমার ছেলে হস তো এই মুহূর্তে মণ্ডপ ছেড়ে চলে আয়। তাতেও যদি সে না আসে আমি একাই চলে আসব, আমাকে বাদ দিয়েই বিয়ে হবে।"

গঙ্গব্বা যা যা বলেছিল ঠিক তাই ঘটছে। সেই কথা মনে করেই দেসাঈজী নিজে ধার দেবার কথা তুললেন না। তিনি রাঘপ্পার কথার জবাবে শুধু বললেন, "রাঘপ্পা এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে।"

রাঘপ্পা দেখল ব্যাপারটা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঋণ নেওয়ার কথাটা সে ইশারা ইঙ্গিতে তুলতে চেষ্টা করল, "রাও সাহেব, আপনি এত বিজ্ঞ লোক হয়ে একথা বলবেন না। দুজনে মিলেই কোন পথ বার করার চেষ্টা করতে হবে। দু জায়গায় তো টাকার চেষ্টায় লোক পাঠিয়েছি। আমার প্রার্থনা শুভকাজে বিঘ্ন ঘটতে দেবেন না। আমি তো সর্বদাই আপনার পায়ের তলায় রয়েছি, আপনি ছাড়া আমায় কে দেখবে ? কিছু একটা উপায় বলুন।"

এ রকম স্পষ্ট ইঙ্গিতে দেসাঈজী আরো কঠিন হয়ে উঠলেন, কোন কথা না বলে একেবারে চুপ করে বসে রইলেন। উপায় না দেখে রাঘপ্পা গিয়ে বোনকে উঠানেই আরো কিছুক্ষণ বসতে রাজী করল। সওয়া এগারোটার লগ্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হল গঙ্গব্বা। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গও এসে পৌঁছতে আরম্ভ করেছেন। মায়ের জিদ দেখে অপমানিত বোধ করে কিট্টী জর্জের সঙ্গে কাছের এক চায়ের দোকানে গিয়ে বসে আছে। নিমন্ত্রিতদের বসিয়ে রাঘপ্পা তাদের চায়ের ব্যবস্থা করার অজুহাতে রান্নার জায়গার দিকে সরে পড়ল। কিন্তু সেখানে রোরুদ্যমানা চম্পক্কা এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ইতিমধ্যে রাম জায়প্পা শেঠের কাছ থেকে সাইকেলে করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরে এসেছে, সে বেশ উঁচু গলায় বলে চলেছে, "শেঠজী বলল, কি করে পাঁচশ' টাকা আবার চেয়ে পাঠাল, এই তো পরশুদিনই তিনশ' টাকা নিয়ে গেছে। ছেলেখেলা পেয়েছে নাকি?" এরপর রাম জানাল শেঠজী রাঘপ্পাকেই ডেকে পাঠিয়েছে।

এতক্ষণে রাঘপ্পার মনে হল নিজের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। হনুমন্ত গৌড়ের কাছ থেকে তিপন্না যদি মোটরেও আসে তাহলেও তার আরো একঘণ্টা সময় লাগবে। জায়প্পা শেঠ তো ওকে গালাগাল দেবার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছে. এদিকে দেসাঈজীকেও কথার জালে ফাঁসানো গেল না। এই হট্টগোলের মধ্যে থেকে দশ মিনিটের জন্য বাইরে যেতে পারলে হয়ত কোন উপায় মাথায় আসবে এই ভেবে রাঘপ্পা শেঠজীর কাছে যাবার জন্য পাগড়ী আর কোট পরে ফেলল। কিন্তু মণ্ডপের দ্বার পর্যন্ত আসতে আসতেই দেখে একটা টাঙ্গা হুড়মুড় করে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। 'আল্লা' বলতে বলতে ভারী শরীর সামলে টাঙ্গা থেকে নামল মহবুবজান। সামনেই রাঘপ্পাকে দেখে প্রশ্ন করল, "কোথায় যাচ্ছেন?" নিজের অপমানের বিষয় মহবুবকে জানাবার ইচ্ছা নেই রাঘপ্পার। ওকে টাঙ্গা থেকে নামতে দেখে রাঘপ্পা খুশী হল এই ভেবে যে এ সব হৈ হল্লা তাহলে মহবুবের কানে যায়নি। কথা পাল্টাবার জন্য সেও জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গিয়েছিলে কোথায়?"

মহবুব বলল, "আগে ভেতরে আসুন", উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সে দ্রুতপদে অন্দরে চলে গেল। রাঘপ্পা বলতে যাচ্ছিল কাজ সেরে আসছি, কিন্তু মহবুব চলে গেছে দেখে সেও পেছন পেছন অন্দরমহলেই প্রবেশ করল। মহবুব সোজা নিজের ঘরে এসে বাক্স খুলে দশখানি দশ টাকার নোটের একটি গোছা বার করল তারপর ব্লাউজের মধ্যে থেকে একটি কাগজের প্যাকেট বার করে খুলে একবার দেখে নিয়ে তার সঙ্গে দশ টাকার নোটগুলি মিলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাঘপ্পা আসতেই তাকে বলল; "দিদিকেও ডাকুন একবার।" রাঘপ্পা একটু অবাক হয়ে একটা বাচ্চাকে বলল, চম্পক্কাকে ডেকে আনতে। তারপর শঙ্কিতভাবে মহবুবকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে? কি করে এসেছ?"

কোন উত্তর দিল না মহবুব। সে চম্পক্কার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে ভাবছিল কিছুদিন আগে চম্পক্কা যে ইঙ্গিত করেছিল তা পূর্ণ করে ঋণমুক্ত হবার দিন আজ

এসেছে। চম্পক্কা আসতেই মহবুব তার হাতে প্যাকেটটি সঁপে দিয়ে বলল, "দিদি এই আমার আশীর্বাদি, তুলে রাখো।" খামটা খুলে দেখে চম্পক্কা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। খামের মধ্যে চারটি একশ' টাকার নোট এবং দশ খানি দশটাকার নোট। রাঘপ্পার দিকে ফিরে মহবুব তার হাতে দিল বড় মাপের ধূপবাতির প্যাকেটটি। তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। রাঘপ্পা ক্লিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "মহবুব কি করে এসেছ সত্যি করে বল।" মহবুব হাল্কা সুরে বলল, "কেন আমি তো আশীর্বাদি দিচ্ছি, এ নিতে তো কোন বাধা নেই?"

ন'টা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় নেই কিন্তু মর্মবেদনায় রাঘপ্পার অন্তর ভরে উঠছে। লোভী চম্পক্কা কৃতজ্ঞতায় অনেক কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু সেই গাম্ভীর্যময় পরিবেশে সে সব কথার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাঘপ্পা বাইরে গিয়ে জোর গলায় ঘোষণা করল, "ন'টার সময় বর ঘুরবে।" সারা প্যাণ্ডেল গুঞ্জনে ভরে উঠল। দেসাঈজীর সামনে গুণে দেওয়া হল পুরো এক হাজার টাকা। চায়ের দোকান থেকে ডেকে আনা হল কিট্টীকে। চায়ের জন্য ফোটান জল রান্নাঘরেই পড়ে রইল। বেদীর কাছে শোনা গেল মন্ত্রোচ্চারণ, নিমন্ত্রিতেরা সবাই বেদীর চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালেন। সেই হৈ হট্টগোলে রাঘপ্পা মহবুবকে জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেল ঐ ধূপবাতি-গুলো সে কেন দিয়েছে, কি করতে হবে ওগুলো দিয়ে?

ভীড়ের মধ্যে মহবুব বেদী থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। তার একান্ত ইচ্ছা সবার মত সেও বরবধূর মাথায় আশীর্বাদি লাজবর্ষণ করবে, তার দৃঢ় বিশ্বাস আশীর্বাদি ঠিক বরবধূর মস্তকেই গিয়ে পড়া উচিত না হলে আশীর্বাদ সফল হয় না। কিন্তু তার পক্ষে ঐ ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তাছাড়া ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে আবার গোলমাল বাঁধতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল ভীড় সরে গেলে সবার শেষে সে আশীর্বাদি ছুঁড়ে দেবে। এই সময় ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তাই শুনেই সর্বদিক থেকে বরবধূর প্রতি হলুদ মাখানো চাল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল, বাজনা বেজে উঠল। মহবুবও আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজের হাতের আশীর্বাদি প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে দিল বরবধূর দিকে। কিন্তু ওর আশীর্বাদি পড়ল গিয়ে কাছের একটা ফাজিল মেয়ের মাথায়। মনটা বিষন্ন হয়ে উঠল মহবুবের। যাবার আগে সে যজমানকে ডেকে বলে যেতে চাইছিল ঐ ধূপবাতিগুলো সোহাগ প্রদীপের পাশে জ্বালিয়ে দেবার কথা কিন্তু এই ভীড়ে রাঘপ্পাকে খুঁজে পেল না সে। ওদিকে টাঙ্গাওয়ালা বহুক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে উঠেছে, লাজবর্ষণের সময়ই সে ভেতরে উঁকি ঝুঁকি মেরে মহবুবকে খুঁজতে শুরু করেছে। তাকে দিয়েই নিজের বাক্স আর বিছানাটা গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে মহবুব নিঃশব্দে চলে গেল, বিয়েবাড়ির হৈ চৈতে কেউ তাকে লক্ষ্যও করল না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে জলখাবারের জন্য ডাকতে গিয়ে চম্পক্কা কোথাও খুঁজে পেল না তাকে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিয়েবাড়ির সানাইয়ের সুর ছাপিয়ে পাড়া মুখরিত করে এক ব্যাণ্ড-পার্টি হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল বাড়ির সামনে দিয়ে। বাইরের চবুতারায় বসে আড্ডা দিচ্ছিল এক দেঁতো ভট্ট, একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পড়তেই সে হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসে রাঘপ্পার হাতে দিল। অন্যমনস্কভাবে কাগজখানার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে শেষের দিকে এসে হঠাৎ চোখ কপালে উঠল রাঘপ্পার।

"শ্রীকুলদেবতা প্রসীদতু"

শ্রীশেষশায়ী নাটক কোম্পানী, হুব্বলি, ক্যাম্প ধারবাড়, আপনাদের মনোরঞ্জনার্থে উলবি বসবেশ্বরের মেলায় নিম্নলিখিত নাটকগুলি পরিবেশন করিবে।

আজ হইতে	তিনদিন	—	বেঙ্কটেশ পারিজাত
পরবর্তী	,,	—	গুলেবকাওলী
,,	,,	—	রুক্মিণী হরণ
,,	,,	—	গান্ধী টুপী সিঙ্গল চায়
,,	,,	—	'সাথ রহুঙ্গা' নাটক।

বিঃ দ্রঃ — (1) অনুষ্ঠান সূচীতে প্রয়োজনে পরিবর্তন হইতে পারে। (2) পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচী পরে ঘোষিত হইবে। (3) 'ওয়ানস্ মোর' বলিলে দ্বিতীয়বার গাওয়া গায়কের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে।

হুব্বলির প্রসিদ্ধ গায়িকা মহবুবজান মিরজকর এই সব নাটকের নায়িকাচরিত্রে অভিনয় করিবেন। এই মেলা উপলক্ষেই তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে ধারবাড়ের রসিকবৃন্দের সম্মুখে তাঁর মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছেন। কলারসিক জনগণ এ সুযোগ হাতছাড়া করিবেন না।

স্থান—বসবেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে থিয়েটারের নিজস্ব শিবির।

—পরমেশ্বর ভট্ট, অধিকারী, শেষশায়ী নাটক কোম্পানী।

——

রাঘপ্পা পড়তে পড়তে ঘেমে উঠল। এমনটা ঘটতে পারে সে কল্পনাও করেনি। মহবুবের বয়স হয়েছে শরীরও এখন ভারী হয়ে পড়েছে তার ওপর হেঁচ্‌কির অসুখ আছে। নাটকে অভিনয়ের শক্তি এখন আর নেই তার। ছ'বছর পূর্বে এই কোম্পানীতেই কাজ করত মহবুব। রাঘপ্পা নানা কারণেই তার অভিনয় করা বন্ধ করিয়েছিল। হুব্বলির পশুমেলায় একবার একটানা দশ এগারো রাত্রি নাটকে অভিনয় ও নাচ গান করে মহবুব ঘুম আর বিশ্রামের অভাবে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন নাটকের শেষে বমি করে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তারপর টাইফয়েডে একমাস শয্যা নিতে হয়েছিল। অধিকারী পরমেশ্বর ভট্টের স্বভাবটা বড় অদ্ভুত। দিলদরিয়া মেজাজ তার, দলের লোকজনকে খাওয়াতে দাওয়াতে ভালবাসে। দলের ভাল শিল্পীদের শুধু যে নিজের সঙ্গে বসিয়ে চর্বচোষ্য

খাওয়ায় জোর করে তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপানও করায় যথেষ্ট। নাটক শেষ হবার পর প্রতি রাতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে চলে আড্ডা এবং পান ভোজন। ফলে শিল্পীরা বিশ্রাম আর ঘুমের সময় পায় না কিন্তু অধিকারীর ধারণা এইভাবেই সে শিল্পীদের রাতের পর রাত অভিনয় চালিয়ে যাবার উৎসাহ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। দলে পড়ে মহবুবকেও একটু মদ্যপান করতেই হত এবং কখনও কখনও পানের মাত্রা বেশ বেশীই হয়ে পড়ত। তারপর শুরু হত নিশ্বাসের কষ্ট ও হেঁচকি। এই সব ব্যাপার দেখে শুনে রাঘপ্পা নিজের শিল্পরসিক মনকে শক্ত করে মহবুবের অভিনয় করা বন্ধ করে দেয়। এর পর কেটে গেছে ছ'টি বছর, মহবুব মোটা হয়ে পড়েছে, সে শক্তিও তার আর নেই। এখন এই পাঁচশ' টাকার জন্য সে কি নিজের প্রাণ দিতে বসেছে?

কাজকর্ম সব ফেলে রেখে রাঘপ্পা তৎক্ষণাৎ টাঙ্গা ডেকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলল থিয়েটারের মালিক পরমেশ্বর ভট্রের সঙ্গে দেখা করতে। পরমেশ্বর তখন বসে বসে মহবুবের মুখে পদ্মাবতীর পার্টের রিহার্সাল শুনছে। এ নাটক মহবুবের বহুবার করা, তবু ছয় বছরের অনভ্যাসে একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছিল। এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় বলে ফেলছিল। যেখানে পর পর অনেক অনুপ্রাস আছে সেখানে উচ্চারণও আটকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। প্রম্প্‌ট করে এ সব অসুবিধা সামলে নেওয়া যায়। মহবুব পার্ট মুখস্ত করে ফেলে চটপট, কিন্তু তার মানে বিশেষ বুঝতে পারে না। তাই একটা শব্দের জায়গায় অন্য শব্দ বলে ফেলে। পরমেশ্বর ভট্ট মহবুবের এসব দুর্বলতার সঙ্গে পরিচিত, তাই সে ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত নির্দেশ দিয়ে পার্ট পড়াচ্ছিল মৃদুস্বরে। ভাল শিল্পীকে চিৎকার করে রিহার্সাল দিতে হয় না। মাত্র তিন চার ঘণ্টায় মহবুব অনেকটা ঠিক ঠাক করে নিয়েছে। বাঁকা সিঁথি আর ফুলদার শাড়ী পরা মহবুবের মুখে এরই মধ্যে ষ্টেজের পদ্মাবতীর ছায়া ফুটে উঠছে।

রাঘপ্পা সোজা এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। এককালে পরমেশ্বর ভট্ট রাঘপ্পাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং ভয় দুইই করত। মহবুবকে দিয়ে যদিও কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও রাঘপ্পা যদি বলে, 'মহবুব বাড়ি ফিরে চল' তাহলে সব কিছু উল্টে যেতে পারে। দরকার হলে সে মহবুবকে আটকাতে কোর্ট কাছারি পর্যন্ত যেতে পারে এটা জানা ছিল পরমেশ্বর ভট্টের, তাই সে সমাদর করে রাঘপ্পাকে বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু ক্রুদ্ধ রাঘপ্পা মোটেই বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গর্জে উঠল, "ভট্ট, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। এখন মহবুব তোমার খপ্পরে পড়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু আবার যদি ওকে মদ খাইয়েছ তো দুদিনে তোমায় এ শহর থেকে দূর করে দেব আর তোমার তাঁবু উড়িয়ে দেব বলে রাখছি।"

আগের বার মহবুব যখন অসুখে পড়ে রাঘপ্পা তোড়জোড় করে ভট্টর লাইসেন্স রদ করিয়ে দিয়েছিল। এবার অন্তত মহবুবজানকে জবরদস্তি টেনে নিয়ে গিয়ে নাটকের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে না এতেই ভট্ট নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। সে তাড়াতাড়ি

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে ভাই রাঘপ্পন্না[1] এ তুমি কি বলছ? মহবুবজান তো তোমারই, তুমি যেমন আজ্ঞা দেবে তাই হবে। ও চাইলেও দেব না তো? তুমি যেমন বলবে ঠিক সেই ভাবেই কাজ করব।"

"ও যেটুকু নিজে থেকে খাবে সেটুকুই দিও, কিন্তু সামনে বসে জোর করে মদ গিলিয়েছ এ খবর যদি শুনি তো এমন শিক্ষা দেব যে তোমার চিরকাল মনে থাকবে।" মহবুবের সঙ্গে কথা বলার বা তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাবার হিম্মৎ ছিল না রাঘপ্পার, সে আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহবুবের উপস্থিতিতে বিয়েবাড়িটা বেশ জমজমাট ছিল, এখন সে চলে যাওয়ায় বিয়ে-বাড়ির আকর্ষণ যেন কমে গেল। রসিক ভট্ট আর ফাজিল ছেলেদের হাসি তামাশা করার মত কেউ রইল না। মেয়েদের চোখের সামনে গায়ের ঝাল ঝাড়বার মতও রইল না কেউ। শুদ্ধাচারিণী বিধবারা পর্যন্ত বলতে লাগলেন, "ও যখন ছিল সারা মণ্ডপ যেন ভর ভরন্ত লাগত, এখন সব একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে, আহা বেচারী!" বিয়ের কনেও শাড়ী পরতে পরতে বার বার স্মরণ করছে মহবুবকে। তরুণী মেয়েরা মহবুবের মিশুক স্বভাবের প্রশংসা করলে চম্পক্কার নিজেকে কেমন অপমানিত মনে হচ্ছে। রাঘপ্পার তো কোন কাজেই আর উৎসাহ নেই। তার কেবলই মনে হচ্ছে সে কি ভেবেছিল, আর কি হয়ে গেল। তার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম আর গর্বের কেন্দ্রমণি ছিল মহবুব। তার অভাবে রাঘপ্পা যেন নিজেকে শক্তিহীন বোধ করছে। রাত্রে ঘুমোতেও পারল না ভাল করে। বিবাহমণ্ডপ একেবারেই যেন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

20. কিট্টীর সংসার

নতুন বউ এল, ভরে উঠল ঘর। গঙ্গব্বা আদর করেই বধূকে বরণ করে তুলল। নিজের মনের নৈরাশ্য যতদূর সম্ভব বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না সে, দেসাঈজীর উপদেশ মনে রেখে চলতে চেষ্টা করল। বধূর ছোটখাট ত্রুটি চোখে পড়লে সে প্রথম প্রথম নিজের মনকেই চোখ রাঙাত, ভাবত রাঘপ্পাকে দেখতে পারি না তাই বোধ হয় তার মেয়েরও দোষ দেখছি। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের পরিস্থিতি যেমন বদ্‌লাতে লাগল গঙ্গব্বারও ভাবনা চিন্তায় দেখা দিতে লাগল পরিবর্তন। ইদানীং তিন চার বছর ধরে কিট্টী মায়ের সম্পর্কে বড় উদাসীন হয়ে পড়েছিল, বাড়িতে কথাবার্তা বিশেষ বলতই না। কিন্তু বউ এসে তার খুব মুখ ফুটেছে, সারাদিনই দুজনে গল্প চলেছে অথচ মায়ের প্রতি স্পষ্ট উপেক্ষা। এ অভিজ্ঞতা গঙ্গব্বার পক্ষে নতুন। মাস দুয়েকের মধ্যেই দেখা গেল কিট্টীর ওপর বউয়ের

[1]অন্না—বড় ভাই

প্রভাব যথেষ্ট। গঙ্গব্বার মনে হতে লাগল বউয়ের জন্যই বাড়িতে কিট্টী আজকাল কথাবার্তা বেশী বলছে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া বড় কঠিন। ওর মনে হচ্ছে যেন একটা মূল্যবান জিনিস ও হারিয়ে ফেলেছে তাই সবকিছু খালি খালি ঠেকছে। নানারকম দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে মনে। বউকে কাছে টানবার জন্য একটা উপায় খুঁজে বার করল গঙ্গব্বা। কয়েকদিন বউকে সঙ্গে নিয়ে পুরানো বান্ধবীদের বাড়ি বেড়াতে যেতে আরম্ভ করল। কিন্তু তাতেও একটা মুস্কিল দেখা গেল। রত্নার বাবার সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্ন করলেই রত্না ভুল বোঝে এবং বেশ বিরক্ত হয় এটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। দরজা পার হতে না হতেই চাপা মন্তব্য কানে আসে, 'বউ বেশ তেজী' 'বউ দজ্জাল আছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সব শুনে রত্নার মেজাজ যায় আরো চড়ে। এই ধরনের নানারকম ছোটখাট তিক্ততা গঙ্গব্বাকে অসুখী করছিল। বাড়িটা অত্যন্ত ছোট, একটিমাত্র শোবার ঘর ও রান্নাঘর। রান্নাঘরে তিনটি পিঁড়ে জোড়া দিয়ে নিজের বিছানা পাতে গঙ্গব্বা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে কিট্টীর ঘরের পাশে শোয়া ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে গঙ্গব্বার।

সামান্য কথা নিয়েও সংসারে খিটিমিটি বাধছে আজকাল। নিজের মায়ের কাছে অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনে শুনে রত্না গঙ্গব্বাকে অতি ভয়ঙ্কর জীব বলেই কল্পনা করে রেখেছে। তাই তার সম্বন্ধে রত্নার মন প্রথম থেকেই ভয় আর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এই কুরূপা বৃদ্ধা পাঁচশ' টাকার জন্য তার বিয়ে পণ্ড করে দিতে চেয়েছিল, এর সম্বন্ধে রত্নার মত তরুণী মেয়ের ভাল ধারণা হবে কোথা থেকে ? প্রথম প্রথম গঙ্গব্বা কোন উপদেশ দিলেই তার উলটো অর্থ করে রত্না মনে মনে জ্বলে উঠত কিন্তু মুখ ফুটে বলত না কিছু। কারণ বিদায়ের সময় জলভরা চোখে চম্পক্কা শিখিয়ে দিয়েছিল 'শাশুড়ী যাই করুন না কেন তুমি জবাব দেবে না'। মায়ের এ উপদেশটা ভুলতে অন্তত কিছুটা সময় দরকার। গঙ্গব্বা মিষ্টি করে কিছু বললেও রত্নার মনে হয় বিদ্রূপ করছে না তো ? সব কথার মধ্যেই ব্যঙ্গ আবিষ্কার করে সে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। যখন আপাত দৃষ্টিতে গঙ্গব্বার কথায় খারাপ কিছু চোখে পড়ে না তখনও রত্নার মনে হয় আসলে বোধ হয় কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারেনি, তাতে তার ভয় আরো বেড়ে যায়। ফলে গঙ্গব্বা যাই বলুক না কেন রত্না সর্বদা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুরে উত্তর দেয়।

"রত্না নতুন শাড়ীটা পরে বাসন মাজতে বোস না।"

"ছেঁড়া শাড়ী পরে বাইরে বসে বাসন মাজব, ঠিক আছে, কাল থেকে তাই হবে।"

"রত্না, নুনের পাত্রটা এদিকে রেখো না।"

"যেখানে বলবেন সেখানেই রাখব, ঘরের মাঝখানে রেখে দিচ্ছি।"

"রান্নাঘরে বসে চুল বেঁধোনা রত্না, খাবারে চুল পড়বে।"

"বাইরে উনি বসে রয়েছেন। ওখানে বসেই যদি বাঁধতে বলেন তো তাই বাঁধছি।"

এই ধরনের কাটা কাটা কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হতে লাগল অসন্তোষ আর

সন্দেহ এবং তারই ফলে বধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে ব্যবধানও বেড়েই চলল দিন দিন। গঙ্গব্বা প্রথম থেকেই ওকে 'মা' ডাকতে বলেছিল কিন্তু রত্না ওকে একটিবারও 'মা' বলে ডাকেনি, এমন কি পিসিও বলে না। ডাকবার দরকার হলে কাছে এসে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, "চ্যাড়শ কুটব না অন্য কিছু কুটব ?" অথবা "উনুনে আগুন দেব ?" ইত্যাদি। এত জোরে বলে যেন প্রশ্নটা যাকে করা হচ্ছে সে কানে কালা।

এই ভাবেই যে বিষের স্রোত অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে তা মাঝে মাঝে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে যে কেউ তাকে আটকাতে পারে না।

গঙ্গব্বা একদিন সহজভাবেই বলল, "কিট্টণা, বাজারে নতুন ঝিঙে উঠেছে একদিন আনিস তো, তরকারী রাঁধব।"

কথাটা শুনেই স্বামী স্ত্রীতে চোখাচোখি হল। আগের দিন রাত্রে রত্নাও স্বামীকে ঠিক এই কথাই বলছিল। ওর বাপের বাড়িতে প্রায়ই ঝিঙের তরকারী হয়, ও নিজেও রাঁধতে পারে, খেতে খুব ভাল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিট্টী গঙ্গব্বার কথার কোন উত্তর দিল না। রান্নাঘরে জানলা নেই, রাত্রে খুব গরম হয় কিন্তু তবু গঙ্গব্বা দরজার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে উনুনের পাশে নিজের বিছানা পাতে। কিন্তু অত দূর থেকেও সেদিন শোবার ঘরের ফিস ফিস আলাপ তার স্পষ্ট কানে এল, "আস্তে কথা বলো, দরজার ফুটো দিয়ে সব কথা শোনে।"

সারা রাত ঘুম এল না গঙ্গব্বার। সকালে উঠেই রাত্রে রান্নাঘরে দারুণ গরম হয় এই কথা বলে গঙ্গব্বা কাশীর মায়ের ঘরে রেখে এল নিজের বিছানাপত্র। 'রাত্রে তো বাড়িছাড়া করল এবার দিনের বেলা কপালে কি আছে দেখো' এই মন্তব্য শুনতে হল, দুঃখ পেল গঙ্গব্বা কিন্তু দেসাঈজীর উপদেশ স্মরণ করে চুপ করেই রইল। নিজের মনকে বোঝাল সে, নখ কখনও মাংস থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না।

রত্নার মধ্যে তার মায়ের সদ্‌গুণগুলি ছিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাপের স্বভাবেরও কিছু কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল সে। সাধারণত সে সব গুণ তার চাল-চলনে প্রকাশ পেত না বটে কিন্তু প্রয়োজনে সেই গুপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করতে পিছপা হতো না রত্না। সেদিন রাত্রেও শোনাবার মত ফিসফিস্ স্বরে ও কথাটা সে ইচ্ছা করেই বলেছিল। স্বামী কিছু বুঝতে পারল না অথচ তার লক্ষ্যভেদ হল ঠিকই। মনে মনে সে বেশ খুশী হয়ে উঠল. এই ভেবে যে শাশুড়ীর সঙ্গে মোকাবিলা করার মত কূটবুদ্ধি ভগবান তাকে দিয়েছেন। গঙ্গব্বাও অনেক বাড়ির বউদেরই হালচাল দেখেছে কাজেই ব্যাপারটা তার কাছে খুব অপ্রত্যাশিত নয়। শুধু এই ভেবেই তার দুঃখ হল যে তার বউটিও আর পাঁচটা বাড়ির বউএর মত ঐ একই ধাঁচের। কিন্তু সে দুঃখও তাকে নিজের মনেই চেপে রাখতে হবে, মুখ ফুটে বলে কোন লাভ নেই।

কাশীর মায়ের বাড়ি শুতে গিয়ে দেখা দিল আর এক নতুন সমস্যা। গঙ্গব্বার ভোর পাঁচটায় ওঠা অভ্যাস। বাড়িতে এসে ডেকে ডেকে দরজা খোলাতে আধ ঘণ্টা লেগে যায়। সাতসকালে দরজা খুলে দেবার জন্য উঠতে হয় বলে কিট্টী গজ গজ

করে। ওদিকে দরজা ধাক্কা দেবার আওয়াজে আশেপাশের প্রতিবেশীরা জেগে উঠে হাসাহাসি করে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে এমন কথা বলে যা গঙ্গুবার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে। সাদাসিধে লক্ষ্মণবাঈ সতাবাঈ হয়ত বলে বসল "বউ এলে শাশুড়ীদের এই দশাই হয় গঙ্গুবা !"

বউ যদি ওর বাধ্য হত তাহলে এসব হাসি ঠাট্টা গঙ্গুবাও হাল্কামনেই উপভোগ করত। কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম তাই গঙ্গুবার খুবই বিরক্ত লাগে এসব কথা শুনে। অবশেষে কিট্টীকে বলে একদিন সে এই ব্যবস্থা করল যে রান্নাঘরে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবী নিয়ে সে শুতে যাবে। কয়েকদিন এই ব্যবস্থায় শান্তিতেই কাটল কিন্তু একদিন চাবীটা গেল হারিয়ে। কোথায় পড়ে গেছে খুঁজে খুঁজে সারা হল গঙ্গুবা কিন্তু চাবী পাওয়া গেল না। ভাল তালাটা ভাঙতে সময় লাগল চার ঘণ্টা। গঙ্গুবার এমনিতেই মন খারাপ তার ওপর রত্নার সামনে কিট্টী দু চারটে কড়া কড়া কথা শোনানোতে ওর চোখে জল এসে গেল।

বধূর সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যে রেষারেষি চলছিল তা এবার ঝগড়ায় পরিণত হতে শুরু হয়েছে। রত্না কখনও চোটপাট উত্তর দেয় কখনও কোণে বসে কান্না শুরু করে দেয়। এরই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল ফিরেছে সন্ধ্যায়। গঙ্গুবা একবার ভেবেছিল কথাটা কিট্টীকে বলবে, কিন্তু দেখল সন্ধ্যাবেলা কিট্টী বউ এর সঙ্গেই টাঙ্গায় করে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরছে। সুতরাং বাপের বাড়ি যাবার ব্যবস্থাটাও পাকা হয়ে গেল। স্বামীকে হাত করতে পেরেছে বলে সব ব্যাপারেই জিত হতে লাগল রত্নার। পালপার্বণে পাড়া-প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করতেও রত্নার আপত্তি। একদিন কিট্টীই জোর করে তাকে দেসাঈজীর বাড়ি পাঠাল হলুদ কুমকুমের অনুষ্ঠানের জন্য বেণুবাঈকে ডেকে আনতে। বেণুবাঈ লুকোছাপার মানুষ নন, তিনি সোজাসুজি রত্নাকে প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁরে তুই নাকি শাশুড়ীর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছিস ? এটা কিন্তু ভাল কথা নয়। সে বেচারী অনেক দুঃখ পেয়েছে, ওঁকে তুই মায়ের মত ভক্তি করবি।" রোজগারী স্বামীর পত্নী রত্না একথায় অপমানিত বোধ করল। পরের বার বেণুবাঈ যখন পান ফুলের জন্য ডেকে পাঠালেন কিট্টী হাজার বলা সত্ত্বেও রত্না আর গেল না ও বাড়ি। পাড়ার কারও সঙ্গে সে কথা বলে না। কিট্টী কিছু বলতে গেলে নিজের মায়ের শেখানো কথা শুনিয়ে দেয়, এ পাড়াটা ভাল নয়। চাকরী করে এমন বাড়িতে থাকলে লোকে হাসে। আমাদের সবাই তাচ্ছিল্য করে, অন্য পাড়ায় বাড়ি দেখো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন রত্না সীমা ছাড়িয়ে গেল। আঙ্গুল মটকে বলল, "স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা দেখে কেউ কেউ হিংসায় জ্বলে মরছে।" সে রাত্রে গঙ্গুবা ফলটুকুও মুখে তুলল না। কিট্টী বউয়ের গায়ে হাত তুলল। সারা রাত কাঁদল রত্না। স্বামী সান্ত্বনা দিতে গেলে বলে উঠল, "পিসি বলেছে আমি স্বামীকে যাদু করে বশ করেছি সেই জন্যই তো আমি ঐ জবাব দিয়েছি।" কিট্টী কি করে এ ঝগড়ার ফয়সলা করবে ভেবে পেল না। দুজনে চলেছে দুই মুখে, কেউ নিজের কথা থেকে একচুল নড়বে না। গঙ্গুবা ছেলের কাছে

রত্নার নামে নালিশ করে করে গলা শুকিয়ে ফেলছে, রত্না দু কথায় তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিচ্ছে, "আমি বিন্দ্‌গোল রাঘপ্পার মেয়ে আমাকে কি আপনি প্রাণধরে বিশ্বাস করতে পারেন !" এরপর কান্নার অস্ত্র প্রয়োগ করেই সে জিতে যায়। কোন মীমাংসা করতে না পেরে বোকার মত বসে থাকে কিট্টী। মা এতকাল ধরে তার কত উপকার করে এসেছে সে সম্পর্কে পত্নীকে বক্তৃতা শোনায় কিট্টী, কিন্তু রত্না পট করে জবাব দেয়, "আমার বাপ মার প্রতি শত্রুতার কথা মনে রেখে এখন আমার ওপর ঝাল ঝাড়ছেন।" তোমার মাকে দিয়ে আমার প্রাণটা নেবার জন্যই তো আমায় বিয়ে করেছ, তাই করতে বল না পিসিকে। তুমিও ওঁর সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে আমার পুকুরে ডুবে মরা ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না।"

কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি যাই চলুক না কেন মনে মনে গঙ্গব্বা এক কঠিন শপথ নিয়েছে আর সেই কথা মনে রেখেই সে নিজেকে সংযত রাখে। নিত্যকার এই কলহবিবাদ, ধাপ্পাবাজি, দুঃখ বেদনা সবকিছু যেন সমুদ্রের ওপরকার তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত, তার তলায় জল একেবারে স্থির। যাই ঘটুক না কেন কিট্টীকে ত্যাগ করা চলবে না এই ছিল তার অন্তরের শপথ। যতই কষ্ট দিক, বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য যতই কৌশল করুক এ বাড়ি কিছুতেই ছাড়া চলবে না। কিট্টীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে মান থাকবে কোথায় ? তাছাড়া, ছেলেকে কোলে নিলে ছেলে যদি দুরন্তপনা করে পালাতে চায় মা কি তাকে মাঝপথে কোল থেকে ফেলে দেয় ? এখন রাঘপ্পার দত্তক নেবার কথা আছে, এই সুযোগে রাঘপ্পা পুরানো শত্রুতার শোধ নিতে চাইবে, তাকে সে সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। ঐ দুর্বলচিত্ত ছেলের মঙ্গল মা ছাড়া আর কেউ দেখবে না সেইজন্যই হাজার কষ্ট সহ্য করেও থাকতে হবে কিট্টীর কাছে কাছে। গঙ্গব্বা ভাবে, 'আজ যদি আমি কিট্টীকে ত্যাগ করি তো কালই রাঘপ্পা ওকে গিলে খাবে।'

21. দেসাঈজীর সুখ দুঃখ

প্রায় দু বছর হয়ে গেছে দেসাঈজী বড় ছেলেটিকে বোম্বাইয়ে বি. কম. পড়তে পাঠিয়েছেন। সবচেয়ে ছোট পুরুষোত্তম এখনও বালক। ইংরেজী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ছেলেটি বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এরই জন্য দেসাঈজী আরো দু বছর ধারবাড়ে থাকা স্থির করেছেন। কিন্তু গ্রামের থেকে যে রকম সব খবর আসছে তাতে এ সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত না বদলাতে হয়। এখন তিনি মাঝে মাঝে একথাও ভাবছেন যে পুরুষোত্তমকে অচ্যুতের কাছে বোম্বাইতে পাঠিয়ে, নিজেরা গ্রামে ফিরে গেলে কেমন হয়। এই সব চিন্তায় দিন কেটে যাচ্ছে। শহরের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর একেবারে সমস্ত পাঠ উঠিয়ে গ্রামে গিয়ে বসবাস করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু গ্রাম থেকে নিত্য নতুন সমাচার এসে পৌঁছচ্ছে, বসন্তের সম্বন্ধে এবার যাহোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে।

গ্রাম থেকে দশ পনেরো দিন অন্তর বসন্তরাও সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর পাওয়াই যায়, কিন্তু তা ছাড়াও আরো অনেক খবর থাকে যা দেসাঈজীর কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। তবে কানে না এলেও দেসাঈজী কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারেন। গাঁ থেকে আসা বৃদ্ধ কৃষাণ পিতার সামনে পুত্র সম্পর্কে যেটুকু বলা যায় সেইটুকুই বলে। দেসাঈজীও নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী গাম্ভীর্য বজায় রেখে যা শোনার শুনে যান তারপর নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্যে বক্তার ঘাটতিটুকু পুরো করে নিয়ে যা বোঝবার বুঝে ফেলেন। কৃষাণরা বলেছিল বসন্তরাও গ্রামের মস্তান ছেলেদের জুটিয়ে তাস খেলে সময় কাটায়। বসন্তের বন্ধুবর্গের নাম শুনেই দেসাঈজী অনুমান করছেন শুধু তাস নয়, সঙ্গে সঙ্গে মদ্য-পানও চলছে নিশ্চয়। গ্রামে যাবার কিছুদিন পর থেকেই বসন্তরাও গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে তাদের নিজেদের থেকেও বেশী মাথা ঘামাতে শুরু করে দেয়। গ্রামবাসী মাত্রেই নিজের নিজের গাই বলদ সম্পর্কে বিশেষ গর্বিত। তাদের দেখাদেখি বসন্তও বলদদের প্রতি বিশেষ রকম প্রেম দেখাতে শুরু করল, তাদের পনেরো দিনে একবার করে ধারবাড়ের লাইনবাজারের পেঁড়া আনিয়ে খাওয়াত সে। আদরের এই বিশেষ পদ্ধতি তারই নিজস্ব আবিষ্কার। ক্ষেত খামার সম্পর্কেও তার নজর কম নয়। ফসল কাটার সময় মাঝে মাঝে রাত্রে মাঠেই শুতে যেত। একদিন খুব ভোরে পাশের ক্ষেতের ছেলেটা ওর ক্ষেত থেকে পাঁচ ছ'টা জোয়ারের ডাঁটি ভেঙেছিল। সেই অপরাধে তাকে চৌপালে ধরে এনে চাবুক পেটা করেছে। বসন্তরাওয়ের এই ধরনের অতি উৎসাহের ফলে গ্রামে বিদ্বেষ আর কলহের সূত্রপাত হচ্ছে। দেসাঈজীর কানেও এসে পৌঁছয় এসব খবর। আজকাল বসন্তরাও সম্পর্কিত খবর শুনলেই দেসাঈজীর ভয় হয়, মনে হয় আরো বিস্তারিত ভাবে সব সত্যি কথা জানতে পারলে হয়ত তিনি সহ্য করতে পারবেন না। বসন্ত সম্পর্কে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেইজন্যই ওকে সংশোধন করতে বা ওর কুকীর্তিগুলি সামলাতে গ্রামে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। উনি নিজে যা জেনেছেন তার সামান্য অংশমাত্র জানিয়েছেন স্ত্রীকে। দেসাঈ জানেন আসল সত্যের এক দশমাংশও যদি বেণুবাঈ শোনেন সেটুকুও তিনি সইতে পারবেন না। তাই 'গানের দল গড়েছে' না বলে, বলেছেন 'অনেক বন্ধু জুটিয়েছে।' 'ক্ষেত পাহারা দিতে গিয়ে কাউকে চাবুক মেরেছে' না বলে. বলেছেন 'ক্ষেত খামার দেখাশোনা করছে।' সরলমনা বেণুবাঈ তাই শুনেই সুখস্বপ্ন দেখছেন ছেলের সম্বন্ধে। সম্প্রতি যা খবর পাওয়া গেছে তা বেশ আশঙ্কাজনক। বসন্তরাও শুধু যে বাড়িতে রাখা ফসলের বস্তা বিক্রী করেছে তাই নয় ভাঁড়ারও প্রায় খালি করে এনেছে। তার যে দুচারটি শকুনির মত মিত্র জুটেছে তাদের ঘর ভরে উঠছে দিন দিন। গ্রামের কিছু কিছু সজ্জন দেসাঈজীর ভয়ে, দাম কম হওয়া সত্ত্বেও বসন্তর কাছে শস্য কেনেন নি। ফলে বসন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করছে। এ খবর দেসাঈজীকে না জানিয়ে উপায় নেই। স্ত্রীকে অবশ্য দেসাঈ এত কথা কিছুই বললেন না। কেবল ফসল কাটার দেখাশোনা করতে যাচ্ছেন জানিয়ে গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পরিস্থিতি কতদূর শোচনীয় হয়ে উঠেছে তা বাইরের লোকের বুঝতে হয়ত দেরী লাগবে, কিন্তু দেসাঈ বসন্তকে খুব ভাল করেই চেনেন তাই ব্যাপার বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। গ্রামে পার্টিবাজি শুরু হয়ে গেছে। রাম গৌড় একজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক। এঁর বড় ছেলেটি মুলকী পরীক্ষা পাশ করেছে। তারই সঙ্গে ম্যাট্রিক ফেল বসন্তের টক্কর চলেছে। দুজনেরই কিছুটা বই পড়া বিদ্যে আছে পয়সারও অভাব নেই। দুজনেই সম্ভ্রান্ত কৃষাণ। প্রথমটা মর্যাদার লড়াই শুরু হয়েছিল এখন তা রীতিমত বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। ওদের পাড়ার দল জড়ো করে বৈলাট[1] গাওয়ার প্রস্তুতি করতেই এদিকে বসন্তের মস্তান বন্ধুরা তাকেও উসকানি দিয়েছে, গৌড় যদি বৈলাট গাওয়ায় তোমার তো তাহলে নাটক নামানো উচিত। তখনই পাশের গাঁয়ের যাত্রার দলের নায়ককে বাড়িতে ডেকে এনে মহড়া শুরু হয়ে গেছে। ভাগবত অপ্পন্না ভট্ট সারারাত নাটকের অভিনেতাদের গান শেখাচ্ছে। অষ্টপ্রহর ধিন তা ধেই ধেই-এর জ্বালায় কান ঝালাপালা, রাত্রে ঘুমের দফা শেষ। রেষারেষি করে আরম্ভ করা এই সখের নাটক থেকে এখন আরো নানা রকম শাখা প্রশাখা পল্লবিত হতে শুরু করেছে। দেসাঈজী এসে পৌঁছতে বাড়ির হৈ হট্টগোল হঠাৎ থমকে থেমে গেল। বসন্তও পালিয়ে বেড়াতে লাগল বাপের সামনে থেকে। দেসাঈজী সদরে থাকলে বসন্ত থাকে খিড়কির দরজায় আর দেসাঈজী পেছন দিকে গেলে বসন্ত পালায় বাড়ির সামনের দিকে। বসন্তের নাটকের দলের চ্যালাচামুণ্ডারা দেসাঈজীকে দেখেই ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে তাই প্রথমটা মনে হয়েছিল সে পর্ব বুঝি শেষ হল। কিন্তু দু তিন দিনের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল গলির মোড়ের কুখ্যাত ভূতুড়ে বাড়িটায় পুরোদমে রিহার্সাল চলেছে নাটকের। দেসাঈজী ডেকে পাঠালে বসন্ত সামনে আসে না, যে চাকর ডাকতে যায় তাকে তেড়ে জবাব দেয়, 'যেতে পারব না বলে দে গিয়ে।' চাকর কিন্তু ফিরে গিয়ে সেকথা বলে না। দেসাঈজীর ভয়েই হোক বা নিজের বিবেচনাতেই হোক সে গিয়ে জানায়, 'এখনি আসছেন বললেন, হুজুর।' নয়ত বলে, দেখাই পায়নি কিংবা ডাকা হচ্ছে শুনে পেছন দিক দিয়ে কোথাও বেরিয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এক একবার দেসাঈজীর মনে হয় ছেলেকে ধরে নিয়ে আসতে হুকুম দেন কিন্তু ভবিষ্যতে এই ছেলেই গ্রামে বাহাদুর দেসাঈ হয়ে বসবে তাই এতটা কড়া হওয়া ভাল দেখায় না এই ভেবে চুপ করে যান। এভাবে ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা ছেড়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন। ভাগবত অপ্পন্ন ভট্টকে ডেকে পনেরোটি টাকা তার হাতে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। ওদিকে অপ্পন্ন ভট্ট বিদায় হয়েছে শুনেই রামন্না গৌড়ের বাড়ি শুরু হয়ে গেল উৎসব আর বসন্ত জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল অপমানের জ্বালায়। এবার সে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। অনুমতি না নিয়ে ফসল বিক্রী করার জন্য দেসাঈজী ছেলেকে যথেষ্ট বকাবকি করলেন কিন্তু শেষকালে অপ্পন্ন ভট্টকে আবার ডাকার অনুমতিও

---

[1] কারও নামে যশগাথা গাওয়া, মহীশূরে প্রচলিত গান।

দিলেন। ফসল বিক্রীর দরুন কিছু টাকা তখনও বসন্তর কাছে ছিল সে টাকাও বসন্তর হাতছাড়া হল না। নিজের রেয়তদের ডেকে আদায়পত্র উসুল করে তাদেরই বলে দিলেন বসন্তের ওপর নজর রাখতে। দিন পনেরো গ্রামে কাটিয়ে ধারবাড়ে ফিরে এলেন দেসাঈজী। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল একটি চিঠি।

শ্রী

বুধবার, তাং ২৩

ক্ষেম বোম্বাই

তীর্থরূপ চরণারবিন্দে শ্রীঅচ্যুতের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। আমি কুশলে আছি। আমি কমার্স কলেজ ছেড়ে দিয়েছি এবং অন্য বিষয় পড়তে আরম্ভ করেছি। আমার মনে হয় কলেজে পড়ে কোন লাভ নেই এইজন্যই ছেড়ে দিয়েছি। আপনাকে এতদিন জানাতে পারিনি এজন্য ক্ষমা করবেন। অন্য কাজ শিখতে শুরু করেছি কিন্তু নতুন করে আরম্ভ করার জন্য টাকা পয়সার কিছু অসুবিধা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে অবিলম্বে একশ' টাকা পাঠিয়ে দেবেন। অন্য সব কুশল। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। ছোট ভাইদের কুশল সমাচার জানাবেন। ইতি

অচ্যুত।

ঠিকানা—দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিল,
লালবাগ।

দেসাঈজী এ চিঠির অর্থ বুঝতে পারলেন না। কলেজ ছেড়ে দিল কেন? নিজেই তো আর্টস্ পড়ে কোন লাভ নেই বলে কমার্স পড়তে গিয়েছিল। এখন লিখছে কলেজে পড়েই কোন লাভ নেই। নতুন কাজটা কি ধরনের? এই নতুন ঠিকানাই বা কোথাকার? আটা পেষাই-এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? আরো কি বোকামী করে বসেছে কে জানে। বোম্বাই শহরের কত রকম কাণ্ডকারখানা কাগজে বেরোয়। দেসাঈজী স্থির করলেন স্বয়ং গিয়ে দেখে আসবেন কি ব্যাপার। টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে নিজে দু তিনদিন পরে বোম্বাই রওনা হয়ে গেলেন। বাড়িতে বলে গেলেন, 'অচ্যুতকে দেখতে যাচ্ছি।'

বোরিবন্দর স্টেশনে নেমে প্রথমে দেসাঈজী লালবাগ না গিয়ে কমার্স কলেজের হোস্টেলেই গেলেন। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা হতেই অচ্যুতের সব খবর পাওয়া গেল।

লবণ সত্যাগ্রহ।

দুজন বন্ধুকে নিয়ে কলেজের সামনে পিকেটিং করার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ অচ্যুতকে একবার সাবধান করে দেন। দ্বিতীয় দিন সে সুপারিনটেনডেণ্ট্‌কে জানায় যে সে গ্রামে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁকে কোন উপদেশ দেবার সুযোগই দেয়নি অচ্যুত। 'আমি বাড়িই যাচ্ছি, অন্য কোথাও নয়' এই বলে সে হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছে। ওর অন্য দুই বন্ধু দুদিন জেল ভোগের পর ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেয়ে গেছে। কলেজে এবং হোস্টেলেও আবার জায়গা পেয়েছে। অচ্যুত ক্ষমা ভিক্ষা না করায় তাকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে আবার কলেজে এসেছিল কিন্তু সরকার থেকে ইতিমধ্যেই আদেশ এসেছে তাকে যেন আর কলেজে স্থান না দেওয়া হয়। আজ প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেল অচ্যুত হোস্টেল থেকে নিজের বিছানা ও জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। দেসাঈজী অচ্যুতের দুই বন্ধুকে ডেকে তাদের কাছেও শুনলেন ঐ একই কাহিনী। তারা জানাল জেলে তাদের বহু অনুনয় সত্ত্বেও অচ্যুত ক্ষমা চাইতে রাজী হয়নি, নিজের জিদ সে কিছুতেই ছাড়বে না। বর্তমানে সে কোথায় আছে তা এরাও জানে না। দেসাঈ একথাও শুনলেন যে অচ্যুত তার বন্ধুদের কোনরকম চিঠি-পত্র লিখতে বিশেষভাবে নিষেধ করে গেছে। বিনীতভাবে তিনি সুপারিনটেনডেণ্ট্‌কে প্রশ্ন করলেন তাঁকে খবরটা জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়নি কেন? সুপারিনটেনডেণ্ট জবাব দিলেন, 'যতদূর মনে পড়ছে চিঠি তো লেখা হয়েছিল। আমি নিজে ড্রাফট করেছি, প্রিন্সিপ্যাল সই করেছেন।' রেজিস্টার খুলে দেখা গেল সরকারী রিপোর্ট আসার পরই চিঠি লেখা হয়েছে। তবে সে চিঠি গেল কোথায়? কৌতূহলী দেসাঈ নিজেই এবার রেজিস্টারখানা দেখলেন, দেখা গেল তাঁর নামটা ঠিকই আছে কিন্তু ঠিকানায় ধারবাড়-এর জায়গায় লেখা হয়েছে ধারীওয়াল। সে চিঠি নিশ্চয় এতদিনে ধারীওয়ালে ঘুরে ফিরে অবশেষে ডেড্‌ লেটার অফিসে আশ্রয় লাভ করেছে।

কাকে আর দোষ দেবেন দেসাঈজী? তিনি সুপারিনটেনডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন এখন ক্ষমাভিক্ষা করলে কি আবার কলেজে তাকে নেবার কোন আশা আছে? সোজাসুজি উত্তর দিতে সাহস হল না সে ভদ্রলোকের। সরকারী রিপোর্ট তো অচ্যুতের বিপক্ষেই, কিন্তু ভাল ছাত্র বলে সুপারিনটেনডেণ্ট ও প্রিন্সিপ্যাল দুজনেই তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। 'একটু অপেক্ষা করুন' বলে সুপারিনটেনডেণ্ট টেলিফোনে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। ফোন শেষ করে সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, অচ্যুতের এ্যাটেন্‌ডেন্স বড় কম আছে। আজকাল এ সব ব্যাপারে সরকার ভয়ানক কড়া কারণ অনেক ছাত্রই ক্ষমা চাইবার পরও আবার আন্দোলনে ভিড়ে যায়। অচ্যুতের সম্বন্ধে আমাদের সবাইকারই অনেক আশা তাই স্পেশাল রেকমেণ্ডেশন করিয়ে ওকে আবার ভর্তি করে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু ওকে লিখে দিতে হবে যে ভবিষ্যতে আর কখনও আন্দোলনে যোগ দেবে না।

কলেজে অচ্যুত সবাইকার কাছে কতখানি প্রিয় এটা জেনে দেসাঈজীর মনে যথেষ্ট গর্ব এবং আনন্দ হল বটে কিন্তু চিন্তা দূর হল না। অচ্যুত জেলে গিয়েছিল সে খবর যদি ধারবাড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কি হবে? এই ছেলেই আসল বাহাদুর দেসাঈ নামের যোগ্য, কিছুতেই সে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি একথা মনে করে পিতার বুক গর্বে ফুলে উঠল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও হল যথেষ্ট। বিদায় দেবার সময় সুপারিনটেনডেণ্ট দেসাঈজীকে বললেন অচ্যুতের মত ভাল ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে দেখে তিনি এবং প্রিন্সিপ্যাল দুজনেই কষ্ট পাচ্ছেন। দেসাঈজী কোন রকমে ক্ষমাভিক্ষাসূচক পত্র লিখিয়ে আনতে পারলেই তার পরের ব্যাপার ওঁরা সামলে নেবেন।

দেসাঈজী সেখান থেকে সোজা চললেন লালবাগ। লালবাগে একটি টাঙ্গা নিয়ে খুঁজে বার করলেন 'দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিল।' দুপুর একটা বাজে। লালবাগে বাড়ি খুঁজে বার করা সহজ কাজ নয়। আধ মাইল জুড়ে তো আটা কল আর ফ্যাকটরির পাঁচিল তারপর ভাঙাচোরা কিছু ঘরবাড়ি ও চালাঘরের ঘন বসতি। অবশেষে এক ডাক-পিয়নের সাহায্যে দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিল পাওয়া গেল।

টিনের ছাতওয়ালা একটা বাড়ি, বাইরে গুজরাতি হরফে বড় বড় করে লেখা 'দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিল।' পাশেই তুলোর কারবার চলে তাই টিনের খাঁজে খাঁজে তুলোর আঁশ জড়ানো। সমস্ত জায়গাটাতেই একটা পুরনো আর অপরিষ্কার ছোপ। ভেতরে কোন খরিদ্দার নেই, একটা বিদঘুটে চেহারার লোক একলা বসে মাছি তাড়াচ্ছে। লোকটার মাথাটা ত্রিকোণাকৃতি, টিয়াপাখীর মত নাক, ড্যাবা ড্যাবা লাল চোখ, কপালের ওপর শিরাগুলো উঁচু হয়ে রয়েছে, সব মিলিয়ে বেশ অদ্ভুত দর্শন। দেসাঈজীর মনে হল লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছেন। পূর্বদেশীয়দের মত হাতকাটা বাণ্ডি আর হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি পরণে, কিন্তু পোষাকে কোথাও এতটুকু ধুলো ময়লার চিহ্নমাত্র নেই। বোম্বাইয়ের এই নোংরা পাড়ায়, আটার কলের মধ্যে লোকটার কাপড় জামা এমন ধপধপে ফরসা রয়েছে কি করে কে জানে। অদ্ভুত লোকটার এটাও একটা বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। এটার জন্যই ওকে পুরোপুরি পূরবৈয়া ভাইয়া বলা যাচ্ছে না। লোকটাও দেসাঈজীকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। একটু রূক্ষস্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?"

"এখানে বাহাদুর দেসাঈ নামে কেউ থাকে কি?"

"আপনি কে? তার গুরুজনস্থানীয় কেউ কি?" পরিষ্কার কানাড়া ভাষায় কথা শুনে দেসাঈজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। লোকটির চেঁচিয়ে কথা বলা অভ্যাস।

"হ্যাঁ, সে আছে কোথায়?"

"এই তো এখনি চলে গেল, এতক্ষণ তো এখানেই ছিল, এই তক্তাটা মেরামত করছিল। করে রেখে চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

"প্রেসে গেছে। ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত আমার এখানে থাকে তারপর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত প্রেসে।"

"কোন প্রেসে থাকে জানেন কি ?"

"সে সব আমি জানি না।"

একে চটানো ঠিক হবে না ভেবে দেসাঈজী লোকটাকে একটু তুষ্ট করার জন্য বললেন, "আপনার নাম কি ? কোথাকার লোক আপনি ?"

লোকটা কিন্তু এতে আরোই চটে গেল, ঝাঁঝিয়ে উঠল,

"আমি কিছুই জানিনা।"

"তার সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে ?"

"সাতটার সময় আসবেন, সাতটায়। না না, সাড়ে সাতটায় আসবেন, ততক্ষণে এসে যাবে, রাত্রে আমার এখানেই শোয়।"

ছেলের খোঁজ তো পাওয়া গেল, রাত্রে আবার এলেই হবে। দেসাঈজী বললেন, "আমি তবে এখন চলি।"

কিন্তু লোকটা এত চট করে ওঁকে ছাড়ল না।

"সন্ধ্যায় আসবেন, এসে দেখা করে চলে যাবেন। শোবার জায়গা এখানে কেবল ওর মতই আছে। বাড়তি লোকের শোবার জায়গা নেই। শোবার ব্যবস্থা আপনার নিজের করতে হবে। কোথাও জায়গা দেখে নেবেন, আর......।"

লোকটার কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু দেসাঈজী চুপচাপ চলে গেলেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা তো হবেই। অচ্যুত বসন্তের মত পালিয়ে বেড়াবে না তা উনি জানেন। এতক্ষণ ভাবনাচিন্তায় ক্ষুধাতৃষ্ণা মনেও ছিল না, এখন মনে হল বেশ জোর ক্ষুধা পেয়েছে। বাসে করে ফোর্টে নিজের হোটেলে এসে খাওয়া দাওয়া করলেন দেসাঈজী। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আবার এসে হাজির হলেন লালবাগে। সাতটায় দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিলের কাছে পৌঁছে সামনের এক ইরানী হোটেলে এক কাপ চা নিয়ে বসলেন। চায়ে চুমুক দেওয়ার কথা ভুলে সোজা সামনের পথের দিকে নজর রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন দেসাঈজী।

প্রায় সাড়ে সাতটার কাছাকাছি খদ্দরের কুর্তা পাজামা ও টুপীধারী অচ্যুতকে দেখা গেল। পায়ের চটিটা ছেঁড়া, তাই পা ঘসটাতে ঘসটাতে ঢুকল এসে আটাকলে। ছেলেকে চিনতে দেরী হল না, কিন্তু মনে হল সে যেন অনেক বদলে গেছে। ঢিলা ঢালা কুর্তা পরলেও বাপের চোখ দিয়ে অনুভব করলেন তিনি, ছেলে অনেক রোগা হয়ে গেছে। ওর পেছন পেছন ঢুকলেন দেসাঈজী। কথাবার্তার টুকরো কানে এল, "পাট্টাটা ঠিকমত কাজ করছে তো ?"

"তো তো তোমার বাবা এসেছেন।"

"কে ?"

দেসাঈজী পেছন থেকে হাত রাখলেন ছেলের কাঁধে।

চৌপাটির বালির ওপর বসে অনেক রাত পর্যন্ত কথা চলল বাপ আর ছেলেতে। ক্ষমাভিক্ষা করার কথা কয়েকবার মনে এলেও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না দেসাঈজী। ছেলের কথাই শুনলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। নিজের বীরত্বের কথা বলতে অচ্যুতের লজ্জা করছিল। বাবা তো রাগারাগি না করে সব কথা মন দিয়েই শুনছেন। দেশ-প্রেমের এই আন্দোলনে ভেসে অচ্যুত এখন এ সব ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না, লজ্জা পেলেও সে সব কথাই বলল বাবাকে। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ, দাণ্ডী যাত্রা এসব খবর কাগজে যত বেরোচ্ছে জনগণের মধ্যে অসন্তোষও ততই ছড়িয়ে পড়ছে। ওদের কলেজের ছেলেরাও এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী। রাজনৈতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় যে কোন ধরনের আন্দোলনেই ছাত্রেরা সবসময় সামনে থাকে। সব কলেজের মত কমার্স কলেজেও পিকেটিং হয়। একদিন পিকেটিং খুব জোর হয়েছিল। তাতে যারা অংশ-গ্রহণ করেছিল তাদের কড়াভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়, ফলে সংগঠন ভেঙে গেল। কমার্স কলেজের মত ছোটখাট কলেজে একে অন্যের নামে লাগাবে ভাঙাবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আন্দোলন ভেতরে ভেতরে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। রোজ কোন প্রকারে কলেজ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস অচ্যুতের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। তাছাড়া কলেজ বন্ধ করিয়ে দিলে অনেক ছাত্রই বাইরে এসে তারপর সিনেমা হলে গিয়ে ঢোকে নয়ত বাড়ি ফিরে যায় এটা আরোই অন্যায়। সেইজন্য অচ্যুত ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করছিল। দেশভক্ত ছাত্রেরা তর্ক তোলে যে স্বয়ং গান্ধীজীই ছাত্রদের স্কুল কলেজ ছেড়ে সত্যাগ্রহ করতে বলেছেন কিন্তু অচ্যুতের মতে, যে সব ভীরু ছাত্র পরে শুধু ঝামেলাই বাড়াবে সেরকম ছেলেদের গান্ধীজী সত্যাগ্রহের ডাক দেন নি। যারা সত্যি সত্যিই সত্যাগ্রহের গুরুত্ব বোঝে সেই রকম ছেলেদেরই এতে যোগ দেওয়া উচিত। কমার্স কলেজে অবশ্য তেমন ছেলে দু চারটির বেশী নেই কিন্তু অন্য সব কলেজ থেকে শত শত ছাত্র শোভাযাত্রা করে সমুদ্রের তীরে গেছে ও লবণ তৈরী করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য জেলে যাবার পর ক্ষমা-ভিক্ষা করে ছাড়া পেয়ে যায় কিন্তু যারা কারাদণ্ড ভোগ করেছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এরা সবাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।

"ডিগ্রিটা কোনরকমে নিয়ে নাও, তারপর যত খুশি রাজনীতি করো। তা তুমি কি স্থির করেছ লেখাপড়াটা ছেড়েই দেবে ?"

"কলেজে যদি আবার ভর্তি হবার অনুমতি পাই তাহলে কোর্সটা সম্পূর্ণ করব।"

"তাঁরা তো তোমাকে নিতে রাজীই আছেন। আমি সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।"

"তবে...... ?"

"কিন্তু তুমি ক্ষমা চাইছ সেটা লিখে দিতে হবে।"

"কিন্তু ক্ষমা কেন চাইব বাবা ?" আরো কিছু বলতে লজ্জা পাচ্ছিল অচ্যুত, বাবার সামনে দেশপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তার পক্ষে কঠিন। সে সর্বদা অনুভব করে বাবা

অর্ধশিক্ষিত হলেও তাঁর বুদ্ধি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের সামনে তার নিজের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি কত অসম্পূর্ণ ও দুর্বল। ধারবাড়ে যখন ছিল তখনও বাবার সঙ্গে কথাবার্তা তার কমই হত। বরং মায়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব ছিল বেশী। আজ বহুদিন পরে দেখা হয়েছে, ইতিমধ্যে ওর বয়স বেড়েছে কিছুটা, একবার জেল থেকে ঘুরে এসেছে ফলে ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ হয়েছে খানিকটা তারপর বাড়ি থেকে এত দূরে বাবাকে কাছে পেয়েছে এইসব নানা কারণে অচ্যুত আজ অনেক কথা বলেছে। ওর কথা শুনে, গান্ধী টুপী পরা, গোঁফের রেখা দেখা দেওয়া ছেলের মুখ দেখে দেসাঈজী অনুভব করলেন ছেলে তাঁর বড় হয়ে গেছে। অচ্যুত ততক্ষণে মাথা নত করে ফেলেছে। ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করে দেসাঈজী বললেন, "যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে তাহলে না হয় থাক।" কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর আবার দেসাঈজী প্রশ্ন করলেন, "এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

"এখন বম্বে গেজেট কাগজে কাজ করছি। কাগজটা নতুন। ওদের একজন সাব এডিটরের সঙ্গে জেলে আলাপ হয়েছিল। ওখানে রোজ তিন ঘণ্টা কাজ করি।"

"কাজটা কি?"

"সহ সম্পাদকের কাজ। পঁচিশ টাকা করে দিচ্ছে। দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। ঐ কাগজের প্রেসও পাশেই, সেখানে প্রেস চালানোর কাজও শিখছি।"

"আর আটাকলে কি কর?"

"ওখানে কাজ কিছু নেই। লোকটির সঙ্গে জানাশোনা আছে ওর ঘরে থাকি তাই মাঝে মাঝে কলের কাজটাজও করে দিই। মেশিন একবার বিগড়োলেই তো হয়ে গেল।"

"এ সব শিখতে কতদিন লাগবে?"

"আপনার কি মত এ বিষয়ে? এখানে থেকে খবরের কাগজের কাজ করতে পারি। কাগজটা তো বলতে গেলে নিজেদেরই, চাকরী ঐ রকম, নামেই। এখানে যারা কাজ করে সবাই ঐ ভাবেই করছে।"

অচ্যুত এইটুকু বলেই চুপ করল। দেসাঈজীও সেই ভাবেই উত্তর দিলেন, "সে তো ঠিক, কিন্তু তুমি যদি এখানেই থাকবে তাহলে বাড়ি ঘর ক্ষেত খামার কে সামলাবে? এদিকটাও তো তোমার ভাবা উচিত।"

"তাহলে আমি এখন কি করব?" মন যা চাইছে সেটা অচ্যুত বাবার মুখ থেকেও শুনতে চাইছিল। দেসাঈ একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন,

"এখানে কাজকর্ম শিখে নাও, তারপর ধারবাড় থেকে একখানা কাগজ বার করতে পার।"

"সেই আশাতেই তো আমি ছাপাখানার কাজ শিখছি।"

"ছাপাখানার জন্য খরচপত্র কি রকম লাগবে কিছু ভেবেছ কি?"

"নতুন কিনলে তো, তিন সাড়ে তিন হাজার লাগবেই তবে বুকওয়ার্কিং এর জন্য একটা ছোটখাট মেশিন আমাদের প্রেসেই রাখা আছে। আমাদের সম্পাদক প্রায়ই বলেন

ওটা রেখে কোন লাভ নেই। আমি ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, ওটা বিক্রী হতে পারে। সে তো বলল খুব বেশী হলেও ওটার দাম হাজার টাকার বেশী হবে না।"

"যন্ত্রটা খারাপ নয় তো ?"

"না না, পুরানো হয়ে সেটা আরোই ভাল চলছে।"

দেসাঈজী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ছেলেকে বললেন, "তুমি এখন দু এক বছর এখানেই কাজ শেখো। এখন তোমার বয়স অল্প, এরই মধ্যে স্বাধীনভাবে একখানা সংবাদপত্র চালানো তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সেটা উচিতও হবে না। দু চারজন অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে কাজ করতে করতে তোমার নিজের অভিজ্ঞতাও বাড়বে এবং তোমার কাগজও ভাল চলবে। যা তা করে কাগজ বার করলে চলবে না। সব নিয়ম কানুন ভাল করে শিখে নাও। অভিজ্ঞতা বাড়লে তোমার লেখার ভাষাও হবে ওজনদার, অন্য সব বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। এই সব কারণেও পড়াশোনাটা শেষ করা প্রয়োজন ছিল। এখানের কাজে যখন তোমার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস জন্মাবে তখন ধারবাড় চলে এস। প্রেসের ব্যবস্থা করা যাবে। বাড়ির পেছন দিকটাতেই প্রেস বসানো যেতে পারে। ওখানকারই কলেজে ভর্তি হয়ে ডিগ্রিটাও নিয়ে নাও। তারপর চাও তো কাগজ বার কোর।"

অচ্যুত খুশী হল, কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করতে সে রাজী নয়। বলল, "এখানেই আর্টস কোর্সে সামনের বছর ভর্তি হয়ে যাব।"

"দু তিনটে কাজ একসঙ্গে সামলাতে পারবে ? এদিকে কাগজের কাজ, প্রেস তার ওপর পড়াশোনা।"

"সে আমি ঠিক পারব।"

"এখানকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর, এত বেশী পরিশ্রম করা উচিত হবে না।"

"না না, প্রেসের কাজ তো এই পাঁচ ছ' মাসেই অনেকটা শিখে গেছি। সামনের জুন মাস থেকে কলেজের পড়া ছাড়া খবরের কাগজের কাজটাই শুধু থাকবে।"

দেসাঈজী কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, বললেন, "সামলাতে পার যদি তো ভালই। কিন্তু তোমার মা তোমার জন্য সর্বদাই চিন্তিত থাকেন। তুমি তো এখন কেবল প্রেস আর আটার কলের কথাই ভাবছ।"

বড়লোকের ছেলে হয়েও অচ্যুত এখন গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত দরিদ্রনারায়ণের সেবক, তাই মাঝে মাঝে সে মনের মধ্যে গভীর শূন্যতা অনুভব করে। তার বলিষ্ঠ তরুণ দেহ আর দৃঢ় হৃদয়ের মধ্যে কোন এক কোণায় যেন কিছুটা স্ত্রীসুলভ কোমলতা ভরা ছিল। ক্বচিৎ কখনও অচ্যুতের ব্যবহারে তার প্রকাশ ঘটত। কিন্তু সে প্রকাশও ছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের। সে যে ধনীর ঘরে জন্ম নিয়েছে এই জন্যই অনেক সময় লজ্জিত বোধ করত অচ্যুত। কখনও বা ছেলেমানুষের মত বাবা মার জন্য মন কেমন করে উঠত তার। সে যে পথে চলেছে তাতে মা বাপের সামনে নৈতিক দিক থেকে সে হয়ত অপরাধী হয়ে পড়ছে এ চিন্তাও তাকে পীড়িত করত। মাঝে মাঝে

ওর মনে হয় এই বিশাল কর্মচঞ্চল বোম্বাই শহর যেন অগণিত মানুষের অরণ্য। এই অরণ্যের মধ্যে সে একেবারে একাকী নিঃসঙ্গ। অজস্র মানুষের ভীড়ের মধ্যেও এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে বোম্বাই ব্যাধি নাম দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাধি যেদিন চাড়া দেয় অচ্যুত সেদিন সারাদিন নিজের ঘরের কোণে মাথা মুখ ঢেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। হোস্টেলে ওর বন্ধুরা ওকে এইভাবে শুয়ে পড়তে দেখলে চাদর ধরে টানাটানি করত, ঠাট্টা করে বলত বড়লোকের ছেলেদেরই এই সব ব্যাধি হয়। অচ্যুতের নিজেরও মনে হয়, 'কথাটা বোধ হয় সত্যি। গরীবের ছেলেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে হয়, বাবা মার কথা ভেবে মন খারাপ করার তারা সময়ও পায় না। আমারও ঐ রকম শক্ত হওয়া উচিত।' তাই তো সে এখন কঠোর দৈহিক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে দুর্বল মনকে জয় করার চেষ্টা করছে। বাবা মার সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনাও অন্য কাজের মধ্যে ভুলে থাকতে চাইছে। কিন্তু অন্য ছেলেদের মুখে যখন তাদের মা বাবা ভাই বোনেদের কথা শোনে তখন নিজের মনকে সামলে রাখা ওর পক্ষে কঠিন হয়। আটার কল আর প্রেসের কাজে নিজেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রেখে সে মনের অস্থিরতা জয় করতে চেষ্টা করছে, এই সূত্রেই প্রেসের ফোরম্যান এবং আটা-কলের ঐ অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ মায়ের কথা মনে পড়ে আবার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

দেসাঈজী দেখলেন অচ্যুত কেমন যেন দিশাহারা শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। ওর মনের দুর্বলতার খবর তিনি জানেন। অসতর্ক হয়ে আজ অচ্যুতকে মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন তিনিই। সে যখন কমার্স পড়ার জন্য বোম্বাই আসতে চায় তখন দেসাঈজী অনুমতি দিতে দ্বিধা করেন নি এই ভেবে যে এতে অচ্যুতের একলা থাকার অভ্যাস হবে। কথা ঘোরাবার জন্য দেসাঈজী এবার জিজ্ঞাসা করলেন. "আটাকলের লোকটা দেখছি বেশ কন্নড় বলতে পারে ?"

"হ্যাঁ, ওর বাড়ি ধারবাড়েই। বহুকাল ধরে এখানে আছে। আধপাগলা লোক, কিন্তু মানুষটা ভাল। আটাকলের মালিক ওকে খুব বিশ্বাস করেন। ওকে ওখানে থাকবার জন্য ঘরও দিয়েছেন।"

"তোমার সঙ্গে ওর আলাপ হল কোথায় ?"

"ট্রেনে একবার আমি একটা কন্নড় উপন্যাস পড়ছিলাম। বইটাতে আমার নামের পাশে ধারবাড় লেখা ছিল। লোকটি বসেছিল সামনেই, জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ধারবাড়ের লোক ?" আমি "হ্যাঁ" বলাতে, বলে উঠল, "আমারও বাড়ি ধারবাড়ে। আমার আটার কল দেখতে আসুন একদিন।" ঐ কলটা ওর প্রাণের চেয়ে প্রিয়। বাইরেটা অত নোংরা কিন্তু কলটাকে ও প্রতি সপ্তাহে খুলে সমস্ত পরিষ্কার করে তেল দেয়। প্রতি পূর্ণিমায় ষোড়শোপচারে যন্ত্রটাকে পূজো করে। ওটাই ওর সর্বস্ব। মালিকের বাড়িতে প্রতিবার পিতৃপক্ষের সময় ওকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। বেশ সুখেই আছে।"

"যাদের বেশী বুদ্ধি আছে দুঃখ তো তাদেরই। এরকম লোকের আর দুঃখ কি ?" এসব লোক তো ঈশ্বরের মত এই কথাই উনি বোঝাতে চাইছিলেন।

"মনে হচ্ছে লোকটিকে কোথাও দেখেছি। ওর নামটা কি বল তো ?"

"বিন্দ্‌গোল বেঙ্কট রায়।"

"বিন্দ্‌গোল রাঘপ্পার কোন আত্মীয় কি ?"

"তা তো জানি না, তবে একবার বলেছিল বটে ওর এক ভাই আছে।"

বসন্তের কাণ্ডকারখানাও দেসাঈজী সংক্ষেপে অচ্যুতকে জানালেন। যে হোটেলে উনি উঠেছিলেন সেখানে এসে দুজনে খাওয়া দাওয়ার পর আরো ঘণ্টা দুই কথাবার্তা হল। দেসাঈজী ছেলেকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে উপদেশ দিলেন। পরের দিন অচ্যুত বাবাকে মালাবার হিল এবং বম্বের আরো সব দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখাল। ভাল হোটেলে খাওয়া দাওয়া হল। সন্ধ্যাবেলা বিদায় দিতে হল বাবাকে। দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল অচ্যুত যেন টেরই পায়নি। এখন আবার সেই বিচ্ছেদ......সেই নিঃসঙ্গ একক জীবন।

দ্বিতীয় পর্ব

22. অম্লমধুর অভিজ্ঞতা

তারুণ্য আর প্রৌঢ়ত্বের মাঝখানে বিবাহ যেন একটা সেতু। বিয়ের পর যে লোক বদলায় না তাকে অসম্পূর্ণ মানুষ বলতে হবে। নতুন নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ প্রথম প্রথম দু চার বছর রঙীন স্বপ্ন দেখায়, তারপর ক্রমশ নানা রকম মিঠে কড়া অভিজ্ঞতায় স্বপ্নেরও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু তখনও মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে, ভাবে এখন যদি সহ্য করে যাই তবেই তো ভবিষ্যতে আসবে সুখের দিন।

কিট্টী নিজের পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ছিল। এই গণ্ডি অতিক্রম করবার বা চারপাশের পাঁচিল পার হয়ে আরো উঁচুতে মাথা তুলবার কোন ইচ্ছা ওর মধ্যে ছিল না। নিজের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই কি হওয়া উচিত আর কি উচিত নয় তাই নিয়ে চিন্তা করত সে। বিয়ের পরের প্রথম দিনগুলির উন্মাদনা কেটে যাবার পর জেগে থাকে শুধু দেহের তৃষ্ণা। তারপর দেহও যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনও জেগে থাকে মানুষের মন। মনের বন্ধনই তখন দম্পতিকে পরস্পরের কাছাকাছি টেনে আনে। এই আকর্ষণ আরো বেড়ে ওঠে সন্তানের আবির্ভাবে। সন্তান যেখানে আসে না সেখানেও সেই অভাব বোধের বেদনাতেই স্বামী স্ত্রী পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসে।

বিয়ের পর পাঁচ বছর কেটে গেছে এখনও কিট্টীর সংসারে আসেনি কোন শিশু। দেহের তৃষ্ণা এখন দিনে দিনে রূপান্তরিত হয়েছে সন্তানতৃষ্ণায়। মনের বেদনা ছাপ ফেলেছে কিট্টীর মুখে। রত্নারও মনে দুঃখ কম নয়। সে মাঝে মাঝে বলে,

"আমার বন্ধুরা সব এখন দুটো করে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমন যে মন্দা মেয়ে গোদাবরী তারও বিয়ে হয়েছে, দুটো ছেলেও হয়ে গেছে।" গোদাবরী বাপের বাড়ি এলেই তার বাচ্চাদের নিয়ে রত্নার সঙ্গে দেখা করতে আসে। গোদাবরীর ছেলেরা মোটেও সুদর্শন নয়। তাদের দেখলে রত্নার মনে একই সঙ্গে ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রেম, আশা সব কিছুই উছলে ওঠে।

সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় কিট্টীর মন এখন কিছুটা ঠাকুর দেবতার দিকে ঝুঁকেছে। ভগবানে বিশ্বাস তার কোনকালেই বিশেষ ছিল না কিন্তু এখন দেশভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভক্তির কিছু কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে। মাও নাতি নাতনির আশায় উৎসুক হয়ে আছেন। এইভাবে একটি শিশুর আকাঙ্ক্ষায় পরিবারের তিনটি মানুষ আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। এই রকম সময়ে ঘটল একটি বিশেষ ঘটনা।

কিট্টীদের বাড়িতে যে সব দেবদেবীর মূর্তি ছিল তার মধ্যে ওর বাবার পূজা করা একটি কালো রঙের শালগ্রাম শিলাও ছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে সেটি রাখা

থাকত একটি বাক্সের মধ্যে। অন্য কয়েকটি বিগ্রহ নিত্যপূজার জন্য বাইরে রাখা থাকত। উপনয়ন হয়ে যাবার পর থেকে এই নিত্যপূজার কাজটি কিট্টীই করে আসছে। নবরাত্রির সময় একবার করে সমস্ত বিগ্রহগুলি বাইরে বার করে মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে পূজার পর আবার যথাস্থানে তোলা হত। শালগ্রাম শিলাটি সম্বন্ধে কিট্টীর মনে কেমন একটা ভয় ছিল। শিলাটির রং আকৃতি এবং তার গায়ের রেখাগুলি দেখলেই কিট্টীর মনে জাগত একটা ভয়ের শিহরণ। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে এই শিলাটিকে মা একটা বিশেষ মর্যাদা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে তাই এর একটা গভীর প্রভাব ওর মনেও দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল।

একদিন এই শালগ্রাম শিলাটি খোয়া গেল। ব্যাপারটা ঘটল এইরকম—বেণীহল্লের রেলওয়ে পুলের ওপর দিয়ে কিট্টী যাচ্ছে, মাথায় তার বিগ্রহের বাক্স, লাইনের ওপর দিয়েই চলেছে সে, হঠাৎ দেখে পেছনে ট্রেন আসছে। কিট্টী ছুটতে শুরু করল কিন্তু ট্রেনের সঙ্গে কি পাল্লা দেওয়া যায় ? তার ওপর মাথায় বিগ্রহের বাক্স। পুলের দু পাশের কাঠের স্লিপার ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, তার ওপর দাঁড়াবার জায়গা খুব কম। অনেকক্ষণ ছুটেও পুল আর শেষই হয় না, শেষে কিট্টী ঠাকুরের নাম স্মরণ করে একটা স্লিপারের ওপরেই কোনরকমে সরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ওর পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে, ভয়ে কিট্টীর নিশ্বাস বন্ধ, সারা শরীর ঘেমে উঠেছে, ভাবছে ঠাকুর খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এমন সময় দেখে গার্ডের গাড়িটা পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে জর্জ, হেডক্লার্ক জোশী, তহসিলদার, দেসাঈজী সবাই দাঁড়িয়ে গার্ডের সঙ্গে। জর্জ গার্ডের হাত ধরে বারণ করছে কিন্তু গার্ড কোন কথা না শুনে হাতের ডাণ্ডা দিয়ে কিট্টীর পিঠে দিলেন এক ঘা। গাড়ি তো চলে গেল কিন্তু সামলাতে গিয়ে কিট্টীর হাতের বাক্স খুলে দেবদেবীরা সব টুপটাপ করে পড়ে গেলেন বেণীহল্লের জলে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল কিট্টী, মুঠোর মধ্যে ধরা পড়লেন শুধু শালগ্রাম। কিট্টী শালগ্রামকে কষে মুঠোয় ধরে বলল, যাক শালগ্রাম তো বাঁচানো গেছে তাহলেই হল। কিট্টী তাড়াতাড়ি শিলাটি পকেটে পুরতে গেল কিন্তু হাতের মধ্যে শালগ্রাম যেন নড়ে উঠলেন। 'আরে এটা জ্যান্ত নাকি ?' মুঠো খুলে দেখতে গেল কিট্টী। শালগ্রাম ওর হাতের মধ্যে ছটফটিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে ধরলে কেন ? এতদিন কি আমার পূজো করেছ ? ছেড়ে দাও আমাকে, নালায় পড়লে রোজ অন্তত একটু জল তো পাব।' কিট্টী আবার মুঠো বন্ধ করে শিলাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল কিন্তু শালগ্রাম এক লাফে ছিটকে পড়লেন ওর হাত থেকে, হাতে লেগে রইল শুধু হিমশীতল স্পর্শ। সারা শরীর কাঁপছে ঠক ঠক করে, দরদর করে ঘাম ঝরছে, গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে, এই অবস্থায় ঘুমটা ভেঙে গেল কিট্টীর। সেই আওয়াজে রত্নারও ঘুম ভেঙে গেছে, সে ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ে আছে স্বামীর দিকে। 'খারাপ স্বপ্ন দেখেছি', বলে কিট্টী উঠে টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখল, রাত দুটো বেজেছে। স্ত্রীকে সবিস্তারে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলে অবশ্য লাভ নেই কিছু। ভয়ে এখনও কিট্টীর কাঁপুনী থামছে না। দরজা খুলে সে মাকেও ডেকে তুলল।

মায়ের সঙ্গে কতকাল কিট্টী মন খুলে কথা বলে নি। মা রাগ করবে ভেবে স্ত্রীর সঙ্গেও আজকাল কথা কমই বলত। কিন্তু আজ মার ঘুম ভাঙিয়ে স্বপ্নের কথা বলল সবিস্তারে। রান্নাঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভীতমুখে. রত্নাও শুনল সব। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনটি মন আজ এক হয়ে গেছে। গঙ্গবাও বহুকাল পরে আজ মন খুলে কথা বলল। ছেলের ভয় দেখে সাহস দিয়ে বলল, "কিট্টনা তুই ভয় পাসনে বাবা, শালগ্রামই তো আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান। যতদিন উনি ছিলেন, কত শ্রদ্ধা করে পূজো করতেন। তারপর, পূজোয় যদি কিছু দোষ ত্রুটি ঘটে যায় সেই ভয়ে আমি ওঁকে তুলে রেখেছিলাম। ঠাকুর রাগ করেন না। মনে যদি ভক্তি থাকে তাহলেই ঠাকুর শান্ত থাকেন। ভয় পাসনে, এখন তুই বড় হয়েছিস তাই ঠাকুর তোকে জানিয়ে দিলেন, "এবার তুমি আমার পূজা করো।" এ তোর অনেক পূর্বপুরুষের পুণ্যের ফল। তোরা ছেলেমানুষ, শালগ্রামকে ভুলতে পারিস, আমি কি করে ভুলব। ওঁ'র কৃপায়ই একদিন সম্পত্তি ছিল আবার দুর্দিনেও উনিই রক্ষা করেছেন। তোর পূজোর শেষে প্রতিদিন আমি একটি করে ঘি-এর প্রদীপ জ্বেলে দিই। শালগ্রাম যদি কুপিত হয়েও থাকেন, বেশী কুপিত নিশ্চয় হননি।"

"তুমি ঐ প্রদীপটা বুঝি শালগ্রামের নামেই জ্বালাও?"

মা মাথা হেলিয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ'।

এ সব কথা শুনে ভীতিকাতর রত্নার মনেও কটুভাষিনী বুড়ি শাশুড়ী সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল। কিট্টীর তো মনে হল মাই ওকে রক্ষা করেছেন। এতকাল ধরে কুলধর্ম ও কুলাচার নিষ্ঠাভরে রক্ষা করে এসেছেন বলে মাকে ওর এখন সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবীপ্রতিমা বলে মনে হচ্ছে। সেই দিন প্রাতেই শালগ্রাম শিলা বাক্স ছেড়ে নিজের পুরানো তাম্রপাত্রটিতে এসে অধিষ্ঠিত হলেন এবং গঙ্গবাও সংসারে মাতৃদেবীর সম্মানে হল পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা।

কাছারি যাবার আগে ভক্তিভরে শালগ্রাম শিলার পূজো করে কিট্টী প্রার্থনা জানায়, "ঠাকুর আজ যেন কাজে ভুল চুক না হয়, আমার বুদ্ধি ঠিক থাকে। আমার খাতির যেন না কমে, পকেটে যেন দু চার পয়সা আসে ঠাকুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আবার শালগ্রামের প্রসাদী নির্মাল্যের তুলসীপত্রটিও পকেটে ভরে কাছারি নিয়ে যায়। দেবতাদের মধ্যে শালগ্রাম, পরিবারের মধ্যে মা এবং কাছারিতে জর্জ কিট্টীর কাছে সমানভাবে পূজনীয় হয়ে উঠেছে। কিট্টীর বিয়ের চার পাঁচ মাস পরেই জর্জও বিয়ে করেছে, তার একটি ছেলেও হয়েছে। জর্জ সব সময়েই অত্যন্ত ধীর ঠাণ্ডা। কিট্টী অল্পেতেই অধীর চঞ্চল হয়ে পড়ে তাই জর্জের স্থৈর্য দেখে কিট্টী অনেক সময়েই যথেষ্ট ভরসা পায়। বাড়িতে মা যেমন শালগ্রামের সামনে প্রদীপ জ্বালাতে ভোলে না একদিনও, আপিসে জর্জও ঠিক তেমনি নিজের বাঁধা নিয়ম ছেড়ে একচুল নড়ে না। সে বিকেলে কোনদিন দু বার চা খায় না, কাজ না করে কারও কাছে পয়সা নেয় না, কখনও আশা হারায় না এবং কাউকে অযাচিত উপদেশ দিতে যায় না। কিট্টীর মত লোকেরা ঐ

ধরনের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাদের আদর্শবোধ কিট্টীদের ধারণার বাইরেই থেকে যায়। নীতিশাস্ত্রের জন্ম কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে জ্ঞানীরা অনেক কথা বলেছেন। সামাজিক জীবনের প্রয়োজনেই যদি নীতির জন্ম হত তাহলে বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নীতির প্রয়োজন হত না। 'যদা যদা চরতি শ্রেষ্ঠ' নীতিবোধের উৎপত্তি সেইখানেই। কিছু মানুষ আছেন যাঁদের নীতিপথে চলার জন্য যত্ন করে কিছু শিখতে হয় না। অন্তরের মহত্বের গুণে সহজভাবেই তাঁরা সুনীতি পালন করে চলেন। দুর্বল অস্থিরচিত্ত লোকেরা এঁদের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্থৈর্য দেখে অনেক শিক্ষালাভ করে, বুঝতে শেখে স্থৈর্যের মধ্যেই আছে সুখ আর শান্তি। আবার কোন কোন বোকা অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে ভেবে বসে হয়ত সন্ধ্যায় একবারের বেশী দুবার চা খেলেই মহা অনর্থ। কোন নীতি বা নিয়মের পেছনে যে আদর্শবোধ আছে সেটি বোঝার চেষ্টা না করে, যে সেই নিয়ম মেনে চলছে তাকেই অন্ধ ভাবে ভক্তি করার থেকে শুরু হয় ব্যক্তি-পূজা। কিট্টীর মত সাধারণ মানুষরা এইভাবে মাকে ভক্তি করে তার সব কিছু দেখেই মুগ্ধ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নিতান্ত ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ভেবে দুঃখ পায়। তবে এইসব লোক যদি ঠাকুর দেবতায় অখণ্ড বিশ্বাসী হয় তাহলে সেদিক থেকে এরা কিছুটা মানসিক স্থৈর্য লাভ করতে পারে।

জর্জ নিজের অজান্তেই কিট্টীকে আত্মসমীক্ষার পথে ঠেলে দিচ্ছিল। একটা বড় স্টেটমেণ্ট কিট্টীকে সেদিন বাড়ি যাবার আগে শেষ করতেই হবে। ছুটির সময় জর্জ এল ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিট্টী হেসে বলল, "জর্জ আমি লিখে যাচ্ছি তুমি এটা পড়ো। আমাকে একটু সাহায্য করো যদি তাহলে কৃষ্ণাপ্পার দোসা খাওয়াব।" একটু হেসে জর্জ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করল। শেষ হল যখন দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে। সাতটা বেজে গেছে ঘড়িতে। কাজটা শেষ হল বটে কিন্তু কিট্টী সমস্যায় পড়ে গেল। জর্জ সন্ধ্যাবেলা কিছু খায় না। এদিকে ওরই জন্য জর্জের এতটা সময় নষ্ট হল। তাছাড়া কিট্টী দোসা খাওয়াবার কথা বলে রেখেছে কাজেই এখন জর্জকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো উচিত। ও জর্জের সঙ্গেই হাঁটতে শুরু করল। মিশন কম্পাউণ্ডের কাছে এসে মোড় ঘুরল জর্জ, কিট্টী ওকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি শুরু করেছে কিন্তু জর্জ কিছুতেই রাজী নয়। কিট্টী বেশ দুঃখ পেল মনে। বুঝতে পেরে জর্জ বলল "বাড়িতে স্টিফেন আমার জন্য বসে আছে, এখন হোটেলে গেলে বড় দেরী হয়ে যাবে।"

কিট্টীর মনে হল সারা সংসার যেন ওকে অপদস্থ করার জন্যই ফন্দী এঁটেছে। মেজ ছেলে স্টিফেনের অসুখ একথা তো জর্জ ওকে আগে বলেনি। হাসিমুখে দেড়ঘণ্টা ধরে জর্জ কিট্টীর কাজ করে দিল অথচ প্রতিদানে ওকে দোসা খাওয়ানোও গেল না, বিমর্ষভাবে এইসব ভাবতে লাগল কিট্টী।

একবার ক্রিস্‌মাসের সময় জর্জের বাড়ি গিয়েছিল কিট্টী। জর্জ যে রকম তৎপরতার সঙ্গে সারার হুকুম পালন করছিল দেখে ওর মনে হয়েছিল জর্জ একেবারে স্ত্রৈণদের শিরোমণি। ওদের বাড়িতে স্ত্রীই সর্বেসর্বা। কিট্টী মনে মনে বেশ একটু তৃপ্তি নিয়ে

ভেবেছিল 'জর্জ তো দেখছি একেবারে জরু কা গুলাম'। কিট্টীর বাড়িতে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই উলটো। বিয়ের প্রথম উন্মাদনা কেটে যাবার পর রত্নাও এখন আর পাঁচটা বউয়ের মত অনুগত পত্নীই হয়ে গেছে। কিন্তু রত্নার অসুখ করলে কিট্টীর বড় ভাবনা হয়, কিট্টী তখন আপিসেও মন দিয়ে কাজ কর্ম করতে পারে না। সারার যখন বাচ্চা হল, কিট্টী সাইকেল নিয়ে ঊর্ধশ্বাসে সদর হাসপাতালে গিয়ে দেখে জর্জ ওয়েটিং রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পাশের ওয়ার্ড থেকে সারার কাত্‌রানি শোনা যাচ্ছে, কিট্টী অস্থির হয়ে উঠল তাই শুনে, কিন্তু জর্জ পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বসে রইল কাগজে মনোনিবেশ করে।

23. কিট্টীর সফর

অথকেন প্রযুক্তোঽয়ম্ পাপং চরতি পুরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।।

মানুষ নিজে থেকে না চাইলে তাকে পাপকার্যে অনুপ্রেরিত করতে পারে এমন কোন শক্তি আছে কি ? এ প্রশ্ন মানুষ করে আসছে সেই ত্রেতাযুগ থেকে। এর উত্তর যাই হোক না কেন, অন্যায় কাজ করে যার মনে অনুতাপ দেখা দেয় তাকে মোটের ওপর ধর্মাত্মাই বলা উচিত। ট্যুরএ বেরিয়ে যে সরকারী অফিসারের পা পিছলায় না তিনি হয় ধর্মরাজ আর নয়ত গণ্ডমূর্খ। তখনকার দিনে রেভেন্যু বিভাগের কর্মচারীরা ট্যুরএ বেরোলে তাঁদের অবস্থাটা হত অনেকটা ব্যারাক থেকে ছুটি পাওয়া সৈনিকের মত। বাড়ি থেকে দূরে এসে প্রতিদিন চলত ভূরিভোজন, তারপর দোর্দণ্ড প্রতাপে নিজের ক্ষমতা দেখাবার অখণ্ড সুযোগ, খোসগল্প সব মিলিয়ে ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়। স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠত। তাছাড়া অধস্তন কর্মচারী পিয়ন, গোঁড়, কুলকর্ণী সব চাকরের মত সমস্তক্ষণ চারদিকে ছুটোছুটি করছে। এই রকম নিরঙ্কুশ আরামের সময় যদি একজন সমঝদার ক্লার্ক সঙ্গে থাকে তাহলে কি না ঘটতে পারে ?

এবারকার সফরে জোশী রামরায়ের সঙ্গে এসেছে কিট্টী। রামরায়ের সফরের বেশ নাম আছে। তার প্রবল পরাক্রম রেভেন্যু বিভাগের রেকর্ডে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। একবার গোচারণের মাঠে গ্রামের একটি স্ত্রীলোককে জরিমানা করা হবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। স্বয়ং তহ্‌সিলদারকে একবার চৌপালে বসিয়ে রেখে নিজে পেছনের ঘরে চালিয়েছিল প্রেমলীলা। রামরায়ের সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শোনা যেত। মাঝে মাঝে রাত্রে তাস খেলতে বসে তার বন্ধুরা তার কীর্তিকলাপ নিয়ে হাসাহাসি করলে সে জবাব দিত, "আরে তোমাদের কীর্তিকলাপও আমার ঢের জানা আছে, শোনাব নাকি দু একটা গল্প ?" নিজের সম্বন্ধে ঐ সব কাহিনী শুনে সে কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করত না।

কথায় কথায় কিট্টীও একদিন রামরায়কে ঠাট্টা করে কিছু বলে, কিন্তু কিট্টীর মত এক নিতান্ত জুনিয়র কর্মচারীর মুখে হাসি তামাশা রামরায়ের সহ্য হল না। চট করে কিট্টীর দিকে ফিরে সে জবাব দিল "ওহে কৃষ্ণজী অন্যকে দেখে তোমার হিংসে হচ্ছে কেন? তোমার তো খেলেও হজম হবে না। হাটে হাঁড়ি ভাঙব নাকি?" কিট্টী শুধু বলল, "ওসব ব্যাপার আপনারই সাজে।" এবার সবাইকার সামনে রামরায় বলে বসল, "আরে আমি জানি, তুই তো পুরুষই ন'স।" তাসখেলুড়েরা হেসে উঠল হো হো করে। রামরায়ের কথাবার্তা এই রকমই। কিট্টীর মনে হল সে নিঃসন্তান তাই রামরায় এরকম ইঙ্গিত করছে। মুখ তার গম্ভীর হয়ে উঠল। আর একজন ক্লার্ক হেসে বলল, "এত তাড়া কিসের রামন্না, ছেলেপিলে হওয়ার সুখ যে কত তা তো জানা আছে। দু চার দিন মৌজ করতে দাও না বাবা। একবার শুরু হলে তো ও তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে বোধ হয়।" আর একজন বলে উঠল "ওহে কৃষ্ণ, নিজের শ্বশুরকে দেখে শেখো একটু। বুড়ো হতে বসেছে এখনও রস কমল না, তুমি তো দেখছি তাঁর নাম ডোবাবে।" জোশী রামরায় কিন্তু কিট্টীকে শুধু কথার প্যাঁচে কাবু করেই ক্ষান্ত হল না। তার অন্য মতলবও ছিল। যে সব ক্লার্ক রামরায়ের সঙ্গে কাজ করেছে তারা কেউই নিজেরা ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কাজেই রামরায়কে কিছু বলতে এলেই উল্টে সেও এদের সম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে দিত। কিট্টী সম্বন্ধেও রামরায় তার অন্তরঙ্গ মহলে বলেছিল, "ছোঁড়ার বড় বাড় বেড়েছে, ওকে এবার একটু শায়েস্তা করতে হবে।"

শায়েস্তা সে করেও ছিল।

সেই বীভৎস অভিজ্ঞতা কিট্টী সারা জীবনে ভুলতে পারবে না। সে নিজে আজও বুঝতে পারে না সে রাজী হয়েছিল কেন? সেই অসহ্য নোংরামি দেখেও সে পিছিয়ে আসেনি কেন? সে রাঘপ্পার জামাই সেই অহঙ্কার দেখাতে? না বাড়ি থেকে দূরে সফরে আসার প্রভাবে অথবা রামরায়ের টিট্‌কারির জবাব দিতে? কিংবা তার নিজের মনেও হয়ত কৌতূহল ছিল। বার বার নিজেকে সে প্রশ্ন করেছে কেমন করে সে এ কাজ করতে পারল? সেই গোপনীয়তা, ভয়, নোংরামি, তীব্র ঘৃণা সব কিছু তার যতবার মনে পড়ে সারা শরীর যেন শিউরে শিউরে ওঠে। কথাগুলো এখনও থেকে থেকে কানে বাজে, "কৃষ্ণজী তুমি আগে ঘুরে এসো, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি" মনে পড়লেই ও থু থু করে থুতু ফেলতে থাকে। কাগজপত্র দেখতে দেখতেও ও থু থু করতে থাকে, অন্য ক্লার্কেরা ভাবে ব্যাপার কি? কিন্তু সেই নোংরামির চিন্তাও অসহ্য ওর কাছে। রামরায়ের চেলাদের মধ্যে ওর নাম হয়ে গেল 'থু কুলকর্নী।'

সেটা ছিল ক্যাম্প ওঠাবার দিন। এত সব কীর্তি যাঁরা করে বেড়ান সেই সব কেরানীর দল এদিকে কিন্তু আচার বিচার মেনে চলেন। ঠিক হয়েছিল ঘি-এ ভাজা পকোড়া খেয়ে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষিত হবে। রামরায় গৌড়কে ডেকে বেশ ডাঁট দেখিয়ে বলল,

"গৌড়জী, আজ ভাল মাখন চাই। এক বাড়ি থেকেই আনবে কিন্তু, দালালের মত দশ বাড়ি ঘুরে গরু, মোষ, ছাগল গাধি সব রকমের মাখন মিশিয়ে এনে হাজির করো না যেন, তাহলে তহসিলদার সাহেব খেতেই পারবেন না। এ তো তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।" তার কথামত গৌড় নিজের বিশ্বস্ত কৃষাণের বাড়ি থেকে মাখন আনিয়ে দিয়েছে। তবনপ্পার বাড়ির মাখন গ্রামের মধ্যে নামকরা। মাখন উনুনে চড়ানো হয়েছে, সুন্দর গোলাপী রঙের গরম ঘি প্রস্তুত হল দেখতে দেখতে। রামরায় বলল, এত ভাল ঘি সারা সফরের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় নি। যাবার আগে এই মাখনওয়ালা গৌড়কে দুটো টাকা বখশিস্ দেওয়া উচিত। এই সময় লচ্চপ্পা বলে উঠল, 'রামন্না, এই ঘিতে দু একটা অম্বাডি পান ফেলে দিলে খাসা হয়।' কিন্তু দেখা গেল অম্বাডি পান আগের দিনই ফুরিয়ে গেছে। একটি হরকরা পাঠানো হল পান আনতে, সে বেচারা সারা গ্রাম খুঁজে অম্বাডি পান না পেয়ে কালো পানই নিয়ে এল শেষ পর্যন্ত। আগে জানা থাকলে পাশের গ্রাম থেকেও আনানো যেতে পারত কিন্তু এখন ঘিটা বেশ টগবগ করে ফুটছে। রামরায় হাঁক দিয়ে বলল, 'দাও দাও কালো পানই দিয়ে দাও। আমার আর কি।' প্রত্যেকেই বলতে শুরু করল 'আমার জন্য একটা' 'আমার জন্য একটা' এই করে করে ঘিতে পঁচিশ ত্রিশখানা পানপাতা ফেলা হয়ে গেল। ঘি-এর সুগন্ধের সঙ্গে পানের সুগন্ধ মিশে সমস্ত চৌপাল ভরে উঠল। এতক্ষণে উনুন থেকে নামল ঘি-এর হাঁড়ি। ঘিয়ের তেমন জেল্লা নেই আর, ফেনা জমেছে ওপরে। আরে! সারা ঘিয়ের রং একেবারে সবুজ।

রামরায় বলল, "ঘিয়ের আর দোষ কি, অন্তত শ'খানেক পান ওতে ফেলা হয়েছে তো!"

লচ্চপ্পা চিৎকার করে বলল, "ব্যাটা মাখনে বিষ মিশিয়ে দেয়নি তো?"

শুনেই রামরায় গলা ফাটিয়ে হাঁক দিল "ডাকো ব্যাটাকে।" হরকরা সামনে আসতে তাকে হুকুম হল,

"যে মাখন দিয়েছে তাকে এবং তার সঙ্গে গৌড়কেও ডেকে আনো।"

সে বেচারা খেতে বসেছিল, খাওয়া ফেলে ছুটে এল। গৌড় তো আগেই এসে পৌঁছেছে। জেরা শুরু করল রামরায়, "কি হে, নাম কি তোমার?"

"আমার নাম তবনপ্পা, সাহেব।"

"এই গ্রামেই থাকা হয়?"

"হ্যাঁ, সাহেব।"

"তোমার ক্ষেতের ট্যাক্স এবার বেশী ধরা হয়েছে নাকি?"

মাখন খেয়ে খুশী হয়েছে তাই সাহেব বোধ হয় ট্যাক্স কম করে দেবে ভেবে তবনপ্পা বলে বসল,

"হ্যাঁ সাহেব।"

"তাই তুমি আমাদের বিষ খাওয়াবে ঠিক করেছ?"

তবনপ্পা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "সে কি কথা সাহেব ?"

রামরায় মহা খাপ্পা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বিষ, একদম বিষ। তোর বউয়ের...... মরবে ঐ বিষ খেয়ে। এক্ষুনি পাগলা কুত্তাকে খাইয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। মাখনে বিষ মিশিয়ে তুই সব অফিসারদের একসঙ্গে মারবি ঠিক করেছিলি—বল সত্যি কথা, বদমাস কোথাকার !—দেখ এসে এই হাঁড়ির মধ্যে।"

তবনপ্পা ছুটে এসে হাঁড়ির মধ্যে চেয়ে দেখল, ঘিয়ের সবুজ রং দেখে সেও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, "আরে, বাপরে এ কি হয়েছে ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সাহেব ?"

"তা আর বুঝবি কি করে ? তুই তো মহা বিশ্বাসী লোক তাই না ? সরকারী অফিসারদের বিষ খাওয়াতে এসেছে, অফিসারদের মেরে কি তুই রাজা হবি ? বেশ কথা। কদিন জেল খাটলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। লক্ষ্মণরাও নালিশ লিখে নাও, এর স্টেটমেণ্টও নিয়ে নাও। পুলিশের চাটিল সাহেবও এখানেই আছেন। গৌড় সাহেব আপনাকেও সাক্ষী দিতে হবে।"

"ওরে বাপরে, আমাকে কেন জেলে যেতে......?"

"গৌড় সাহেব, ও কি করেছে ওকে বুঝিয়ে দিন।" গৌড় তবনপ্পাকে বুঝিয়ে দিলেন জমির ট্যাক্স বেশী ধার্য করায় তবনপ্পা অফিসারদের বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করেছে, এই ফৌজদারী মোকদ্দমা তার বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে। তবনপ্পা বেচারা দিশাহারা হয়ে রামরায়ের পায়ে পড়ল। রামরায় আঙ্গুলের ইশারায় গৌড়কে জানাল পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। তবনপ্পা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। বাড়ি থেকে দশটি টাকা এবং আরো দু জায়গা থেকে দশ টাকা ও পাঁচ টাকা সংগ্রহ করে কোনমতে পঁচিশটি টাকা এনে রামরায়ের পদতলে নিবেদন করল। রামরায় গম্ভীরভাবে বললেন, "শুধু জরিমানা দিলেই হবে না তবনপ্পা। নিজের কুলদেবতার নামে শপথ নাও এ কাজ আর কখনও করবে না। তবনপ্পা বুকের ওপর দু হাত রেখে শপথ করল এবং মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পেয়েছে ভেবে চটপট সরে পড়ল সেখান থেকে। গৌড় সাহেবকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সমস্ত কর্মচারী তবনপ্পাকে আশীর্বাদ করতে করতে পেট ভরে সেই ঘি-এর তৈরী খাবার খেলেন। পঁচিশ টাকাটা ভোজনদক্ষিণা হিসেবে ভাগাভাগি করে নেওয়া হল। কিট্টী পেল তিন টাকা। লজ্জার বাধা তো আগেই ভেঙেছে, যথা লাভ ভেবে সে বেশ চুপচাপ টাকাটা ভরল পকেটে।

শহরে ফিরে এসে রামরায় কিট্টীর পিঠ ঠুকে তারিফ করে বলল, "না, তুমি সত্যিই মরদ বটে। প্রথম বার ট্যুরে বেরিয়ে আমরাও এত গভীরে নামতে পারিনি। তুমি তো রেকর্ড ব্রেক করেছ হে।" অন্যেরাও বলতে লাগল, "তোমার মত হিম্মৎ কারও নেই।"। কিট্টী ভেবেছিল অন্যেরা যা করছে সেও তাই করছে, কিন্তু এখন বুঝছে অন্যদের চেয়ে অনেকদূর বেশী এগিয়েছিল সে। কাজে ভুল করে বা দোষ করে বকুনি খেলেও কিট্টীর মনে সর্বদা এই গর্ব ছিল যে আপিসে এক জর্জ ছাড়া অন্যদের চেয়ে সে অনেকগুণে ভাল,

তার নীতিবোধ তাকে এতদিন রক্ষা করেছে। কিন্তু সে গর্ব করার অধিকার তার আর নেই এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে। নৈতিক দিক থেকে রামরায়ের চেয়েও সে নিচে নেমেছে একথা এখনও সে মন থেকে মানতে পারে না কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। তার চারপাশে সর্বদা যে সব নীতিবোধহীন কর্মচারীদের দেখছে তাদেরও হয়ত মনে মনে একটা নিজস্ব নীতিবোধ আছে। তার ক্ষেত্রেও কি সে রকম কিছু থাকতে পারে না ? প্রশ্নটা সব সময় ওর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু উত্তরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রত্নার কাছে যেতে ভয় করছে ওর। মার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করছে। এ কথাও মনে হচ্ছে ওর হাতের পূজা শালগ্রাম নেবেন কি ? জীবনে যেন সুখ নেই। রাত্রে ঘুম হয় না, ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস ওর বেড়েছে আজকাল। প্রায়ই সে চুপচাপ নিজের মনে বসে থাকে। সে মৌনতা ভঙ্গ করে কেউ যদি কথা বলতে যায় তাহলে সে হঠাৎ অসম্ভব রেগে ওঠে।

কাছারিতে ওর বীরত্ব কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। এর আগেও অনেকে ' রামরায়ের মতলবের শিকার হয়েছে কিন্তু কেন কে জানে তাদের নিয়ে এত হৈ চৈ হয়নি। কিট্টীর নৈতিকতা সম্বন্ধে বেশী গর্ব ছিল, বয়সও অত্যন্ত কম তাছাড়া তার অন্তরের অনুতাপ মুখে ফুটে উঠেছিল। এই সব কারণেই বোধ হয় লোকে তার সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠল। জর্জের কানে এসব কথা পৌঁছেছে কিনা কে জানে ভেবে কিট্টী বেশ অশান্তি ভোগ করছে। ওর মনে হতে লাগল অন্যের মুখ থেকে শোনার আগে ও নিজেই যদি জর্জকে সব খুলে বলে তাহলেই সব দিক থেকে ভাল হবে। তাছাড়া মনের কথা বলবার জন্য সংসারে ওর জর্জ ছাড়া আর কেই বা আছে ? একদিন কিট্টী জর্জের কাছে মন উজাড় করে সব বলে ফেলল। ওর সেই সময়কার মানসিক অবস্থা যতদূর সাধ্য স্পষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টা করল। সারা আপিসশুদ্ধ লোক জানলেও জর্জ এ পর্যন্ত কিছুই শোনে নি। কিন্তু তার এই অসহ্য মানসিক কষ্টের কোন সান্ত্বনা জর্জের কাছে ছিল না। উপদেশ দেবার বিদ্যাও জানে না জর্জ। সে নিজের নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে অন্যের সামনে শুধু আদর্শরূপে থাকতে পারে। তাকে দেখে যে যতটা পারে শিখুক। কিট্টীর মনের কষ্ট জর্জ বুঝল কিন্তু সে মুখে কেবল এইটুকুই বলতে পারল, "নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো।"

24. দেসাঈজীর সঙ্গে বিবাদ

পান সাজতে সাজতে হঠাৎ হাত থামিয়ে রাঘপ্পা কিট্টীকে বলল, "এই সব লোক-দেখানো মহৎ ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দেওয়াই উচিত। পয়সার ব্যাপারে চুপ করে থাকা কোন কাজের কথা নয়। এখন মান যদি যায় তো তোমারই যাবে, দেসাঈয়ের কিছুই যাবে আসবে না। তোমার নিজের টাকা নিয়ে চেপে বসে রয়েছে। যৌতুকের টাকাটা

পর্যন্ত ওরই হাতে। এই ভাবে চললে সবটাই ওর ভোগে লাগবে এদিকে তুমি ধার শুধতে শুধতে সারা হয়ে যাচ্ছ। এটা কি ন্যায় হচ্ছে ? তুমি একবার কথাটা তোল তো, তারপর আমি দেখব।"

ব্যাপার হচ্ছে এই যে বরদক্ষিণার টাকা সবটাই গঙ্গব্বা তার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অর্থাৎ দেসাঈজীর হেফাজতে রেখে দিয়েছে। অথচ ঐ টাকার ভরসাতেই কিট্টী ঋণ নিয়েছিল। বিয়ের পর মনের আনন্দে এ সব নিয়ে মায়ের সঙ্গে অবশ্য সে আর বাদানুবাদ করেনি। তাছাড়া ভেবেছিল একদিক থেকে ভালই হয়েছে, মাইনের টাকা থেকে মাসে মাসে ধার শোধ করবে, বরদক্ষিণার টাকাটা বরং একটা সঞ্চয় থাকবে। নতুন উৎসাহ নিয়ে কিট্টী তখন আরম্ভ করেছিল বিবাহিত জীবন। কিন্তু টাকার টানাটানি তো ছিল আগে থেকেই, এখন ঋণের বোঝাটা যেন তার ওপর বড়ই বেশী ভারী মনে হতে লাগল। কিছুদিন অনেক কষ্টে ঋণ শোধ করে চলল কিন্তু এভাবে চালাতে আর ভাল লাগে না। উপরির টাকা তো চা, খাবারেই উড়ে যায়। বছর দুই কাটল, এখন ঋণের সুদ দিয়ে যেতেও কষ্ট হচ্ছে, তিন মাস পরে পরে একবার অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্তে সুদটা দিয়ে আসে গিয়ে। বিয়ের পরের সে উৎসাহের আর ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। ও আশা করে হয়ত ওর কষ্ট দেখে মা বরদক্ষিণার টাকাটা বার করে দেবে কিন্তু এ ব্যাপারে মা একেবারে মুখে তালা দিয়ে রেখেছে।

রাঘপ্পা জানে অবস্থাটা কারণ রত্না প্রায়ই বলে এ সব কথা। কিন্তু সে নিজে থেকে মুখ খুলতে চাইছে না। কিট্টী কবে কথা তুলবে সেইজন্য অপেক্ষা করে আছে। দেসাঈজীর মহানুভবতা রাঘপ্পার কাছে লোকদেখানো ভাণ বলে মনে হত। তাছাড়া দেসাঈজীর অজেয় ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে কেমন অকিঞ্চিৎকর বলেও মনে হত তার। গঙ্গব্বার ইচ্ছানুসারে বিবাহের বছরখানেক পরে দেসাঈজী রাঘপ্পাকে ডেকে পাঠিয়ে দত্তক নেবার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু বিয়ের পর রাঘপ্পার আর তত চাড় নেই। সে বলল ছোট মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেলে তবেই দত্তক নেবে। দেসাঈ বললেন, এমন কড়ার করা হয়নি। কিন্তু রাঘপ্পার মতে সেইটেই লোকাচারসম্মত নিয়ম। কথাটা অবশ্য দেসাঈজীরও সঙ্গত মনে হল তবু তিনি বললেন, দ্বিতীয়া কন্যার বিয়েতে রাঘপ্পা যত খুশি খরচ করুক না, কেউ কিছু আপত্তি তুলবেন না, শুধু দত্তকের অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক। কিন্তু রাঘপ্পা কিছুতেই রাজী হল না, "আগে এই বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর সব কিছু তো কিটুন্নারই," এই কথাই বলল সে। দেসাঈজী আর কি বলেন! গঙ্গব্বাকে ভরসা দিয়ে তিনি বললেন, "আর তো তিন চার বছরের ব্যাপার, অপেক্ষাই কর।" দেসাঈজীর ঠিক পরাজয় হয়নি বটে তবে মানে একটু ঘা লেগেছে এটা ঠিক। তাছাড় মনে একটু সন্দেহও দেখা দিয়েছে। রাঘপ্পার সামনে উনি অবশ্য গঙ্গব্বাকে বলেছেন, "ঠিকই তো বলছে, এ বিয়েতে আর কতই বা দেরী হবে ? প্রতিশ্রুতি তো পাকা হয়েই গেছে।" কিন্তু রাঘপ্পাকে উনি প্রশ্ন করেছেন "কি, প্রতিশ্রুতি আপনি ভাঙবেন না তো পরে ?"

মনে মনে রাঘপ্পা বলেছে, "ওহে দেসাঈ, আমাকে এমন কথা বলার স্পর্ধা তোমার হল কি করে দেখছি।" সেই দিন থেকে রাঘপ্পা ফন্দী আঁটছে কি করে দেসাঈকে বেকায়দায় ফেলা যায়। রাঘপ্পার বোকা জামাই রাঘপ্পাকে সেই সুযোগটা দিতে এত বছর সময় লাগাল। যাক্ শেষ পর্যন্ত কিট্টন্না সে সুযোগ দিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় সে শ্বশুরকে বরদক্ষিণা এবং ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত কথা সবিস্তারে বলেছে। সে অবশ্য বলেছে, "মায়ের ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, মা যা করছেন আমার ভালর জন্যই করছেন কিন্তু মুস্কিল এই যে আমাকে মাসে মাসে সুদ গুণতে হচ্ছে আর জর্জের কাছে আমার মান থাকছে না। তাছাড়া মা এই যে টাকা জমা রেখেছে এর কোনরকম কাগজপত্র নেই। আজকাল তো সব কাগজপত্র ঠিকঠাক থেকেও কত লোককে হয়রাণ হতে হয়। আমি কাছারিতে রোজই তেমন কত ঘটনা দেখছি। দেসাঈজী মানুষ ভাল কিন্তু দিনকাল তো খারাপ বটেই।"

কিট্টীকে কোনরকমে দেসাঈজীর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা রাঘপ্পা আগেই করেছিল কারণ দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করায় কিট্টী শ্বশুরের সম্পর্কে একটু সন্দেহ করতে শুরু করেছে এবং দেসাঈজী হিতৈষীরূপে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন। সে প্রভাব কাটিয়ে কিট্টীকে নিজের হাতের মুঠোয় আনা দরকার। এই সুযোগে সে নিজের ফন্দী পাকা করে ফেলল। বেশ গুছিয়ে শুরু করল কথা, "কিট্টন্না, সত্যি বলছি তুমি আর রত্না আমার কাছে সমান, তোমাদের আমি এতটুকুও ভিন্ন চোখে দেখি না, তুমি তো আমার ছেলে। প্রথম কথা হচ্ছে, দেসাঈজীর সঙ্গে বিবাদ করাটা ঠিক হবে না। ভাল কথায় যদি উনি টাকাটা দিয়ে দেন তাহলে কোন গোলমাল হয় না। তা যদি না হয় তাহলে অবশ্য স্পষ্ট কথা বলতেই হবে। উপদেশের মাধ্যমে রাঘপ্পা কিট্টীকে সেই স্পষ্ট কথা বলার জন্যই উস্কানি দিতে লাগল। টাকাকড়ি নিয়ে দেসাঈজী ও কিট্টীর মধ্যে ঝগড়াটা বেশ জমে উঠুক তখন রাঘপ্পা নেবে মধ্যস্থের ভূমিকা এই ছিল ওর পরিকল্পনা।

কিট্টী দুদিন ধরে সাহস সংগ্রহ করে এল দেসাঈজীর বাড়ি। মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করেনি সে। দেসাঈজী বসে পাঁজি দেখছিলেন, মৃদু হেসে অভ্যর্থনা করলেন কিট্টীকে। কিট্টীও প্রথমটা সবাইকার কুশল জিজ্ঞাসা করল খুব বিনীত ভাবে তারপর ওর নিজের ঋণের কথাটা বলে ফেলল।

"কত ধার নিয়েছিলে ?" প্রশ্ন করলেন দেসাঈজী।

"পাঁচশ' টাকা।"

"আমার কাছে চাইলে কি আমি দিতাম না ? যাকগে, চার পাঁচ বছর তো হয়ে গেল, এতদিনে কত শোধ করেছ ?"

"পয়সা তো বাঁচাতেই পারি মা। আসল থেকে মাত্র চল্লিশ টাকা শোধ হয়েছে, সুদই দিয়ে যাচ্ছি কোনরকমে।"

দুঃখিত ভাবে দেসাঈজী বললেন, "তোমার লজ্জা করছে না একথা বলতে ?"

কিট্টী ভেবে পাচ্ছে না বরদক্ষিণার কথাটা কিভাবে তুলবে। দেসাঈজী নিজেই আবার বললেন, "তুমি ভাল ছেলে, গুছিয়ে সংসার করবে এই আশাতেই আমি মধ্যস্থ হয়ে তোমার জন্য কিছু করেছিলাম। কিন্তু তুমি নিজের স্ত্রীকেই বশ করতে পার না। বাড়িতে মায়ের খাওয়া হল কি না হল সে খোঁজ কখনও রাখো না তুমি। চাকরী করছ অথচ পাঁচশ' টাকা ধার শোধ করতে পারছ না। কি আর বলব আমি!"

"আমি তো ভেবেছিলাম বরদক্ষিণা পেলেই সব টাকা শোধ করে দেব, কিন্তু এখনও সুদই গুণতে হচ্ছে। চাকরী দেখেই লোকে ধার দিয়েছিল, কিন্তু সে আর কতদিন চুপ করে থাকবে?" সব লজ্জা সঙ্কোচ ছেড়ে কথাটা এবার বলেই ফেলল কিট্টী।

"চাকরীটাই বা করছ কেন, সেটাও ছেড়ে দাও। বাড়িতে বসে থাক, মা তোমাকে আর তোমার বউকে যা হোক কিছু করে খাওয়াবে এখন ...!" দেসাঈজী কিট্টীর অভিপ্রায় শুনে চটে উঠেছিলেন।

তাঁর রাগ দেখে কিট্টীর মনে হল শ্বশুরের শেখানো কথাটা বোধ হয় ঠিক সময় মত বলা হয়নি। তবু সে বলল, "আপনি যদি চারশ' ষাট টাকা দেন তাহলে ধারটা শোধ করে ফেলি। মাইনে থেকে আপনাকেই কিছু কিছু করে শোধ দেব, বাইরের লোকের কাছে আর ঋণী থাকতে হবে না।"

"এ বুদ্ধিটা আগে হতে কি হয়েছিল? মায়ের তীর্থযাত্রার খরচা তো তুমি ঐ ভাবেই শোধ করেছিলে। যাক্, যেতে দাও সে সব কথা, এখন উপস্থিত এখান থেকে নিয়ে ওখানে গুঁজে লাভটা কি হবে? লাভ তো কিছুই নেই।"

হঠাৎ সন্দেহ হল কিট্টীর শ্বশুরের পরামর্শের আসল উদ্দেশ্যটা কি দেসাঈজী বুঝে ফেলেছেন? দেসাঈজী আসলে প্রথম থেকেই মনে মনে এটা স্থির করে রেখেছিলেন যে শ্বশুর জামাইয়ের এই টাকা পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেকে কোনমতেই জড়াবেন না। এখন এ বিষয়ে কিট্টীর সঙ্গে কোনরকম তর্ক করার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। নিরুপায় কিট্টীকেই মুখ খুলতে হল আবার।

"আমি একটা মুখ্যু তাই বিয়ে করে বসেছি। ধার তো নিতে হয়েছিল বিয়ের জন্যই। বরদক্ষিণার টাকাটা তো অন্তত আমার পাওয়া উচিত ছিল!" দেসাঈজী ক্রমেই চটে উঠছিলেন, খাড়া হয়ে বসে চিন্তা করছিলেন কি বলা যায় কিট্টীকে। ততক্ষণে কিট্টী মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে শেষ কথাটা বলে ফেলেছে, "শুনেছি বরদক্ষিণার টাকাটা এবং আগেকার হাজার টাকা মা আপনার কাছেই জমা রেখেছে।"

"খবরদার, কি বলতে চাও তুমি?"

"না না, আমি চাইছি না, কিন্তু এটা তো সত্যি কথা যে টাকাগুলো পনার কাছেই রাখা আছে?"

"না, কিচ্ছু রাখা নেই", জবাব দিতে গিয়ে ঘেমে উঠলেন দেসাঈজী। খাড়া হয়ে বসেই এবার তিনি পাঁজির পাতা উল্টোতে শুরু করলেন। আরো কিছু হয়ত বলবেন দেসাঈজী এই ভেবে আরো দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল কিট্টী কিন্তু পাঁজির

পাতা থেকে চোখ তুললেন না, নিষ্কম্প অচঞ্চল মুখে বসে রইলেন তিনি। অবশেষে সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে কিট্টী বলল, "আচ্ছা, আমি আজ চলি তাহলে।"

"হ্যাঁ।"

কিট্টীরও রাগ হয়েছে খুব, দুপদাপ করে জোর কদমে সে গেল দরজা পর্যন্ত। একবার সব সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে যাবার পর এতক্ষণ কোন কথা বলতে না পেরে কিট্টীর মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে, হাত পা কাঁপছে তার। আর একটা কথা মনে পড়েছে এতক্ষণে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়েই সে বলে উঠল, "আপনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়েছেন মায়ের সঙ্গে যেন আলাদা না হই, মামাকেও দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে শপথ করিয়েছেন। আপনি নিজে সবার সামনে শপথ করে বলতে পারেন যে টাকা আপনি জমা রাখেন নি?"

"সময় এলে শপথ তুলে নেব" বললেন দেসাঈজী।

প্রয়োজন হলে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেও মোকাবিলা করার সাহস রাখেন তিনি। কিট্টী আর কথা না বলে চলে যাচ্ছিল কিন্তু ওকে ফিরে ডাকলেন দেসাঈজী, বিষাদের হাসি হেসে বললেন, "কৃষ্ণ, এদিকে এসো, একটা অনেকদিনের পুরানো কথা বলি তোমাকে। অনেককাল আগে ধারবাড়ের হোসায়ল্লাপুরে আমাদের একটা বাড়ি ছিল, আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমার বাবা বাড়িটা বেচে দেন। সেইজন্য আজও আমি তাঁর শ্রাদ্ধ করি না। কথাটা জেনে রাখা তোমার পক্ষে ভাল তাই বললাম।"

দেসাঈজীর বক্তব্য বুঝতে কিট্টীর প্রায় মিনিট খানেক সময় লাগল। আবার সে যেতে উদ্যত এমন সময় দেসাঈজী দ্বিতীয়বার শরনিক্ষেপ করলেন, "কথাটা তোমার শ্বশুর-মশাইকেও জানিয়ে দিও, তাঁরও জেনে রাখা ভাল।"

জানবার পর রাঘপ্পা বলে উঠল, "তাহলে দেসাঈজীর সঙ্গে আমার লড়াই শুরু হল আজ থেকে।" লড়াই ঝগড়াতে কিট্টীর বড় ভয়। রাঘপ্পা ওকে বলল, "তুমি চুপচাপ থাকো, যা করবার আমি করছি। রাঘপ্পাকে যে ক্ষেপিয়ে দেয় তার আর নিস্তার নেই একথা সবাই জানে। দেসাঈজীরও কথাটা জেনে রাখা ভাল" কথা শেষ করে গোঁফে তা দিতে লাগল রাঘপ্পা।

25. রাঘপ্পার দুই রূপ

গত পাঁচ ছ' বছরে রাঘপ্পার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার একটা প্রধান কারণ মহবুব-জানের মৃত্যু। মহবুব যাবার পর থেকে রাঘপ্পা যেন জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। দেসাঈজীকে কাবু করার ইচ্ছা তো রাঘপ্পার বহুদিন থেকেই, কিন্তু সে কাজে হাতও দেওয়া হয়নি এতদিন, এদিকে এরই মধ্যে মহবুব চলে গেল।

মহবুবের মৃত্যু, সেও এক কাহিনী। একটানা একমাস নাটক কোম্পানীতে কাজ করে যাওয়ার শক্তি মহবুবের ছিল না এটা তো জানা কথাই। রাঘপ্পার কাছে কথা দিয়েছে বলেই পরমেশ্বর তাকে এবার মদ খাওয়ার জন্য একদিনও জোর করেনি কিন্তু মহবুব নিজে থেকেই এখন নেশা করতে চাইত। রাতজাগার অভ্যাস ওর ছেড়ে গেছে বহুদিন। যা আশঙ্কা ছিল, বমি, বুকে ব্যথা, রক্তচাপ বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড় করা সব উপসর্গই দেখা দিচ্ছিল একে একে। নাটক কোম্পানীরও তখন পড়তি দশা, পরমেশ্বর ভট্টেরও বিশেষ কিছু লাভ থাকছিল না। ধারবাড় যেন এক মরীচিকার মত ভোলাচ্ছিল তাকে, কবে যে আমদানী ভাল ভাবে শুরু হবে তা বলা মুস্কিল। পরমেশ্বরের দুশ্চিন্তা দেখে মহবুব বেচারী নিজের কষ্ট চেপে, কাপের পর কাপ চা খেয়ে কাজ করে যেত। ওর অবস্থা দেখে ভট্ট নিজেই ওকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বারণ করত। আগের মত পর পর দুটো শো-তে অভিনয় করার সামর্থ্য মহবুবের আর ছিল না। কোন ক্রমে একটা মাস কাটাল সে। তারপরই রক্তচাপ বৃদ্ধিতে শয্যা নিল। উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘোরে, খাওয়া সহ্য হয় না। রাঘপ্পা ওর অবস্থা দেখে নিয়ে গেল হাসপাতালে। দু মাস হাসপাতালে থেকে শরীর কিছুটা সারিয়ে বাড়ি ফিরল সে, কিন্তু মাত্র পনেরো দিন সুস্থ থেকেই আবার সেই অবস্থা। এবার ও আর হাসপাতাল যেতে রাজী হল না। আল্লার যা মরজি তাই হোক, বলে দিনরাত ঈশ্বরকেই ডাকতে লাগল সে। মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল পড়ত মহবুবের অজস্রধারে। রাঘপ্পার মনে হত ওরই জন্য মহবুবের আজ এত কষ্ট। মহবুবকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ সেবা করছিল সে। প্রায় প্রতিদিন হুব্বলি গিয়ে নিজের হাতে ওষুধ খাওয়াত, ফল দুধ খাওয়াত। দশ বারো মাস কাটল এইভাবে তারপর মহবুবের যন্ত্রণা হঠাৎ ভীষণ বাড়ল, কফ আর পিত্তজ্বর শুরু হয়ে গেল। খবর পেয়েই ছুটে এল রাঘপ্পা, মহবুবের সেবা করবার জন্য একমাস হুব্বলিতেই রয়ে গেল সে। তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্র করে সে যেন মহবুবকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। ওর ইচ্ছাশক্তির জোর দেখে মৃত্যুও যেন থমকে দাঁড়াল। পনেরো দিন ধরে মহবুবের প্রাণটুকু নিয়ে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে চলল টানাটানি। অবশেষে একদিন ভোর চারটের সময় জ্বর নেমে গেল, একেবারে শীতল হয়ে গেল এতদিনের জ্বরতপ্ত দেহ। মৃত্যু মহবুবের সুন্দর মুখখানির ওপর বড় নিষ্ঠুর ছাপ রেখে গেল। বয়স হলেও যে মুখ সৌন্দর্য আর শান্তিতে স্নিগ্ধ ছিল তাতে যেন কালি মাখিয়ে দিল কে। একটি চোখ ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে, ভ্রূগুলি জায়গায় জায়গায় ঝরে গেছে, ঠোঁটে কাটা কাটা দাগ সব মিলিয়ে সেই অপরূপ রূপ মৃত্যুর দংশনে বড় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

মহবুবের স্বভাব শেষ পর্যন্ত প্রায় একই রকম ছিল। বাইরে একটু খিটখিটে হয়ে গেলেও তার যজমানের কাছে সে ছিল চিরকালের সেই মহবুব। মানুষের সহ্যশক্তি অসীম নয়। দীর্ঘদিন ধরে সেবা শুশ্রুষা করতে করতে রাঘপ্পাও কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নিজের অবস্থা দেখে ভয় পেত মহবুব নিজেই। মৃত্যুর কিছুদিন আগে সে একদিন রাঘপ্পার পা ছুঁয়ে কেঁদে উঠল, "কেন আমায় বাঁচাতে চাইছেন? এরপর

ব্যথা শুরু হলে আর চিকিৎসার দরকার নেই। এমনি ফেলে রেখে দেবেন, শান্তিতে চোখ বুজব। এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না আমি।"

রাঘপ্পা খুব কষ্ট পেল মনে কিন্তু এটাও বুঝল বেঁচে থেকে মহবুব শুধু যন্ত্রণাই পাচ্ছে। এর প্রায় কুড়ি দিন পরে ঘনিয়ে এল অন্তিম ক্ষণ। রাঘপ্পা প্রায় যন্ত্রের মত এতদিন সেবা করছিল, কিন্তু আর পারল না সে। মহবুবের সামনে থেকে পালিয়ে গেল। অন্যমনস্ক হবার জন্য আর এক বাঈজীর বাড়িতে ঢুকে গান শুনতে বসে গেল সে। এরই প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে রাঘপ্পাকেই স্মরণ করতে করতে শেষবারের মত চোখ বুজল মহবুবজান। পরের দিন খবরটা শুনে রাঘপ্পার প্রাণ যেন মোচড় দিয়ে উঠল তীব্র ব্যথায়। এতদিন কাছে থেকে, শেষ সময়টুকু ও থাকতে পারেনি সেই অনুতাপে মাথা কুটতে ইচ্ছা হল তার। এরপর পনেরো দিন পেটের যন্ত্রণায় রাঘপ্পা নিজেই পড়ে রইল বিছানায়। সেরে উঠল যখন, সে যেন তখন অন্য এক রাঘপ্পা, ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত দুর্বল হয়ে পড়েছে তার মন।

চম্পক্কা ভাবছিল এ বাড়ির যা কিছু সম্পত্তি মহবুব এতদিন ভোগ করেছে তা বুঝি এবার ফেরত পাওয়া যাবে। তার সে আশা বৃথা হল। মহবুব তার সমস্ত সঞ্চয় ভাগ্নের দোকানে দিয়েছে। রাঘপ্পাও এ নিয়ে একটি কথাও বলবে না। দ্বিতীয়বার অসুখে পড়ার পর মহবুব নিজের গলার চন্দ্রহারটি চম্পক্কাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল ওটি শান্তার যখন বিয়ে হবে তাকে যেন দেওয়া হয়। সেই হারটিই যথালাভ।

রাঘপ্পার তেজ যেন দিন দিনই কমে আসছিল। আগের মত শক্তি, উৎসাহ, চপল স্বভাব কিছুই আর নেই। তার আগেকার শক্তি সাহস আর বুদ্ধি যেন আজ গল্পকথা। একদিন যে রাবণের মত বিক্রমে দাপিয়ে বেড়াত আজ তার চালচলন দেখলে সেকথা বিশ্বাস করা শক্ত। সে অলৌকিক ব্যক্তিত্ব একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। রাঘপ্পা নিজেও অনুভব করে এই পরিবর্তন। পথ চলতে চলতে হঠাৎ কখনও রাস্তায় ছড়ির ভর দিয়ে ঠুকে ফেলে নিজেই বলে ওঠে, আগে তো এমনটা হত না। কোন কাজ করে অনুতপ্ত হওয়া তার কুষ্ঠিতে ছিল না আর এখন প্রতিটি কাজের পরই সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। মৃত্যু এমনই শক্তিধর। লৌহকঠিন যে হৃদয়, দুঃখ কাকে বলে জানে না তাকেও মৃত্যু দুঃখী হতে শেখায়। রাঘপ্পার কল্পনাশক্তি আজকাল বেড়ে গেছে। অনেক কাল্পনিক দুঃখ ভেবেও সে কষ্ট পায়। প্রথমত তার দুঃখ এই যে, এত বুদ্ধি সত্ত্বেও সবদিক থেকে সে সমানভাবে লাভ করতে পারেনি। দ্বিতীয় দুঃখ এই, সে বুদ্ধি অনেক সময় তার সামর্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। তৃতীয়ত সেই ক্ষুরধার বুদ্ধিই আজ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন যে বেঁচে আছে সে আগেকার রাঘপ্পার ছায়ামাত্র। সেই প্রচণ্ড পরাক্রম রাঘোবা ভরারী লুপ্ত হয়ে গেছে মহবুবের মৃত্যুর পরই। স্ত্রীর সামনে আস্ফালন করে বলত রাঘপ্পা, "এই ব্যাটা দেসাঈ যদি আর কিছুদিন আগে আমার খপ্পরে পড়ত তাহলে পনেরো দিনে ওর আক্কেল গুড়ুম করে ছেড়ে দিতাম। এখন তো আমার গায়ের জোর পর্যন্ত কমে গেছে। দেসাইজী আর গঙ্গবাকে নিয়ে

ব্যঙ্গবিদ্রূপ এ বাড়িতে খুবই চলে, এ বাড়ির শত্রু বলেই গণ্য করা হয় ওঁদের। এখন তো কিট্টীর সংসারের অভাব, ঋণ এবং দেসাঈজীর কাছে টাকা জমা থাকার বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার ফলে তিক্ততা আরোই বেড়ে গেছে। শক্তি যতই কমে যাক ভরারীর কেরামতি এখনও একেবারে নিন্দের নয়। এ বছর দেসাঈজীর ক্ষেত খামারে চুরিটা বড্ড বেশী হচ্ছে। দেসাঈজীর গ্রাম থেকে ধারবাড়ের হাটে যারা আসে তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে রাঘপ্পা। তার মাথায় নানা রকম ফন্দী খেলছে। তবে একটা চমৎকার উপায় নজরে পড়েছে তাই ছোটখাট নোংরামি করে সে হাত ময়লা করতে চায় না এখন।

দেসাঈজীর ছেলে বসন্তের লুকিয়ে চুরিয়ে ফসল বিক্রির অভ্যাস যায় নি এখনও। তার সেই গ্রামে নাটকের দল গড়া. গ্রামে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি করা এবং দেসাঈজীর গ্রামে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা এব সব ঘটনাই রাঘপ্পা শুনেছিল তার এক চেলার কাছে। আজকাল বসন্তরাও সে রকম খোলাখুলিভাবে ফসল বেচতে সাহস করে না বটে, কিন্তু প্রতি তিন দিন অন্তর বাঁধা খদ্দেরের কাছে এক দেড় বস্তা করে এখনও সে বিক্রি করে চলেছে। রাঘপ্পার এই চালাক চতুর চেলা বসবন্নী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে এবং বেশ কর্মতৎপর। গোলমেলে কাজেই তার উৎসাহ বেশী। তাকে দিয়ে রাঘপ্পা বসন্তরাওকে খবর পাঠাল যে ধারবাড়ে তাদেরই জাতের এক ভদ্রলোক প্রচুর শস্য কিনতে ইচ্ছুক। চতুর বসবন্নীও কথাটা যতদূর সম্ভব রং চড়িয়ে জানাল বসন্তকে। বসবন্নী ছিল বসন্ত ও খরিদ্দারের মধ্যবর্তী সেতু। মাল হাতে পেলেই সে টাকা দিয়ে দিত। তারপর রাতারাতি বয়েলগাড়িতে মাল পাচার হয়ে যেত ধারবাড়ে, কাকপক্ষীও টের পেত না। মাসখানেক এই ব্যবসা চলল খুব চমৎকার। রাঘপ্পার হাতে এল পনেরো বস্তা জোয়ার। ধারবাড়ে আনার খরচ. বসবন্নীর দালালি ইত্যাদি চুকিয়ে রাঘপ্পার পকেটে এল বাইশ টাকা। কিন্তু এত ছোটখাট কাজে মন উঠল না রাঘপ্পার. 'ছিঃ মোটে বিশ বাইশ টাকা, ভাবতেও লজ্জা করে। মহবুব যখন ছিল এ টাকা তো একদিনেই উড়িয়ে দিতাম। অন্য উপায় ভাবতে বসল সে। দেসাঈকে কজা করতে হলে আগে ওর ছেলেটাকে হাত করতে হবে। আঙুলের নাগাল পেলে তবেই কজি চেপে ধরা যায়। বসন্তের সঙ্গেই আলাপ হওয়া দরকার। নাটক সম্বন্ধে উৎসাহ আছে বসন্তের, রাঘপ্পাও নাটক কোম্পানী সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর রাখে। বসবন্নীকে সে পরামর্শ দিল নাটকের লোভ দেখিয়ে কোনরকমে বসন্তকে ডেকে নিয়ে আসতে। পরের দিন থেকেই রাঘপ্পা প্রতীক্ষায় রইল বসন্তের আবির্ভাবের।

এই হল রাঘপ্পার এক রূপ।

কিট্টীর সম্বন্ধে কি করা যায় সেই ভাবনা চিন্তার মধ্যে দেখা যাবে রাঘপ্পার আর এক রূপ। দত্তক নেওয়া সম্বন্ধে রাঘপ্পার মন বদলাতে শুরু করেছে। কখনই ও কথাটা সে আন্তরিক ভাবে বলেনি। মেয়ের বিয়ে দেবার সময় কোনমতে গঙ্গব্বাকে রাজী করানোর জন্যই বলেছিল। এখন গঙ্গব্বার জিদ দেখে তার নিজের সিদ্ধান্ত আরোই স্থির হয়ে গেছে। দত্তক নেবার কথাটা তখনই তার হাস্যকর মনে হয় কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল

করার জন্য তখন সে চটপট শপথ নিয়ে ফেলেছিল। তাছাড়া চম্পকাও তখন কিট্টীকে জামাই করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই সব নানা কারণে বিয়ের আগে দত্তক নেবার কথায় সে স্বীকৃত হয়। বিয়ে তো হয়ে গেল। তারপর টালবাহানা করতে করতে রাঘপ্পারও মত ক্রমশ বদলাতে থাকে। রাঘপ্পা ভেবেছিল বিয়েটা হয়ে গেলে গঙ্গব্বার বিদ্বেষ হয়ত খানিকটা কমবে, কিন্তু বৃথা আশা। গঙ্গব্বা নিজে তো ওর বাড়ি একবারও এলই না, ভাইকে কখনও নিজের বাড়িতে একবার নিমন্ত্রণও করল না। রত্নাও বিশেষ সুখী নয়। রাঘপ্পার সর্বদাই মনে হত গঙ্গব্বা সব বিদ্বেষের ঝাল এখন রত্নার ওপরেই ঝাড়ছে। গঙ্গব্বা এ বাড়িতে যেন এক বিভীষিকা। এই চার পাঁচ বছরে কিট্টীর মধ্যেও রাঘপ্পা এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না যাতে তাকে রাঘপ্পার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে গ্রহণ করা যায়। কিট্টী রাঘপ্পার কথামত চলতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু সে যোগ্যতা তার মধ্যে নেই। স্ত্রীর কাছে গজরায় রাঘপ্পা, "আমি যদি কিট্টীর জায়গায় হতাম তাহলে অমন মাকে 'মা তুমি এসো' বলে গড় হয়ে পেন্নাম করে দূর করে দিতাম বাড়ি থেকে।"

এমনি সময়ে দেসাঈজী ওকে দত্তক নেবার জন্য তাগাদা দেওয়ায় রাঘপ্পা একেবারে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। বেশ তিক্ত স্বরে সে বলেছিল "দেসাঈজী, দেড় বছর হতে চলল বিয়ে হয়েছে, গঙ্গব্বা এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও আমার বাড়ি আসেনি। এত রকম পালপার্বন গেছে সেই বিদ্বেষ যেমনকার তেমনিই। আমিই বা ওর ওপর বিশ্বাস রাখি কি করে বলুন?" দেসাঈজী স্মরণ করিয়ে দিলেন, "বিয়ের সভায় সবাইকার সামনে তুমি তো একবারও বলনি যে আমাদের এতদিনকার মনোমালিন্য এবার শেষ হওয়া উচিত। তখন একেবারে চুপচাপ ছিলে কেন?" রাঘপ্পার ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল এ কথায়। তাছাড়া কিট্টীকে দত্তক নেবার বিপক্ষে আরো সব যুক্তি এখন ওর মনে জাগছে। অন্য জামাইটি যদি কিট্টীর চেয়ে সরেশ হয় তখন? দত্তক নেবার পর গঙ্গব্বা যদি ছেলেকে বশ করে আমার বিরুদ্ধে উস্‌কানি দেয় তাহলে? এ চিন্তাটা রাঘপ্পাকে খুবই উদ্বিগ্ন করে তুলল। দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না সে একমাত্র নিজের ঐ বোনটিকে ছাড়া। এখন মন দুর্বল হয়ে পড়ায় গঙ্গব্বাকে ভয় পায় রাঘপ্পা। মনে মনে ভাবে গঙ্গব্বার হাতে যদি একবার পড়ি তো আমাকে আর আস্ত রাখবে না গঙ্গী। ভয়ের সঙ্গে কিছুটা ভক্তিভাবও ছিল, এই তিন বছর ধরে বোনই তার সমস্ত ভাবনা চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ছিল বলা চলে। সে মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্রের মত জপ করত, "গঙ্গী, এখনও লড়াই শেষ হয়নি আমাদের। তোর ভাগ্য ভাল। তুই যেদিন ভূত হয়ে প্রতিশোধ নিতে আসবি সেদিন হয়ত আমি শান্তি পাব।"

এখন যদি দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দেওয়া যায় তাহলে দেসাঈ আর গঙ্গব্বাকে কেমন চটানো যাবে ভেবে আনন্দ পেত রাঘপ্পা। কিন্তু দশজনের সামনে শপথ করা হয়েছে, থাক, না হয় আরো বছর দুই এইভাবেই টালবাহানায় কাটিয়ে দেওয়া যাক, অন্তত শান্তার বিয়ে পর্যন্ত। আবার কখনও বা নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলত

'রাঘপ্পা, তুই যদি আসল রাঘপ্পা হস তাহলে দ্বিতীয়বার এ প্রস্তাব উঠবার আগেই সব ভণ্ডুল করে দে।'

দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে রাঘপ্পার চিন্তাধারা অনেকটা রাবণ রাজার মত, 'যদি আমার নিজেরই একটা ছেলে জন্মায় তাহলে?' শান্তার জন্মের পর ডাক্তারের উপদেশেই দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি ঘটাতে হয়েছিল। ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দেয় আর একবারও মা হতে গেলে চম্পক্কার জীবন সংশয় ঘটবে। এখন ওর বয়স পঞ্চাশ আর স্ত্রীর বয়সও চল্লিশ ছুঁয়েছে। শান্তার বিয়েতে আর দেরী করেও লাভ নেই, বয়স বেড়ে গেলে মেয়ে পার করা কঠিন হবে। আর বেশী সময় নেই, যা করার এখনি। দয়া মায়া সব জোর করে মন থেকে সরিয়ে ফেলে রাঘপ্পা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, স্ত্রীর জীবন......একটা ছেলের জন্ম দিয়ে তারপর যা হবার হোক, ওপারের টিকিট কাটায় তো কাটাক। আর ডাক্তাররা তো সব সময় বাড়িয়েই বলে থাকে।

স্বামী খুলে কিছু না বললেও চম্পক্কা স্বামীর উদ্দেশ্য খোলা বই-এর মত পড়ে ফেলতে পারে। সারা জীবন ধরে স্বামীর মন বুঝতে সে কখনও ভুল করে নি। আজও বিনা প্রতিবাদে শেষ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হল। রত্নার কথা ভেবে মন ব্যথিত হয়ে উঠল তার কিন্তু স্বামীই তার কাছে পরমেশ্বর। স্বামীর সঙ্গে তার প্রেম আর বিদ্বেষ যাই থাক, সে তারই একান্ত নিজের জিনিস, তাই মনস্থির করতে সময় লাগল না তার।

26. অচ্যুতের জবাব

গ্রাম থেকে পনেরো বস্তা জোয়ার ধারবাড়ে এনে বিক্রি করা হয়েছে এ খবর দেসাঈজীর কানে পৌঁছতে দেরী হল না। ফসল চুরির খবর তো আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। এবারে ওঁর সন্দেহ দৃঢ় হল যে এই সবকিছুর পেছনেই রয়েছে রাঘপ্পার কারসাজি। দেসাঈজীর বাবা তখন বেঁচে, সেই যৌবনের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেসাঈজী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর গত বিশ বছর ধরে তিনি একেবারে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের মত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে আসছেন। এই বিশ বছরে তেমন কোন পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রয়োজনও হয়নি। নিজের মর্যাদাবোধ নিয়ে তিনি একটু স্বতন্ত্রই থাকতেন তাই অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশেষ কেউ তাঁর ছিল না। তেমনি ঘোরতর শত্রুও কেউ ছিল না। সম্প্রতি রাঘপ্পা অকারণে এই সব উপদ্রব শুরু করায় দেসাঈজীর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতকাল কোন রকম ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না কিন্তু এখন উনি বলতে শুরু করেছেন, 'এই রাঘপ্পাটাকে যদি উচিত শিক্ষা না দিতে পারি তাহলে আমি বাহাদুর দেসাঈ নামের অযোগ্য।' রাঘপ্পা প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে, এখন আর চুপ করে থাকা

চলে না সুতরাং রাগের মাথায় তিনি অচ্যুতকে একখানা চিঠি লিখে ফেললেন। এদিককার সংবাদ সংক্ষেপে জানিয়ে তিনি লিখলেন, 'বেঙ্কটরায় রাঘপ্পার ভাই কিনা খবর নাও এবং তার সম্বন্ধে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে বিস্তারিত ভাবে আমাকে জানাও। এ সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ আমার কাছে অত্যন্ত জরুরী সেই বুঝে এ কাজ তোমার একান্ত কর্তব্য বলে মনে করবে এবং সবিস্তারে জবাব দেবে।'

সব খবর সংগ্রহ করতে অচ্যুতের অনেক মেহনত করতে হল কাজেই তার উত্তর এল চারদিন পরে। যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ভাবেই লিখেছে।

শ্রী

ক্ষেম

দেবীদাস ফ্লাওয়ার মিল
লালবাগ

তীর্থরূপ চরণারবিন্দে বহু ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

আপনার পত্র পেয়েছি। আমি ভাল আছি। এখানে কাজ ভালভাবেই চলছে। সম্পাদক মশায় আজকাল আমাকে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন। সম্প্রতি দু একবার আমাকে সম্পাদকীয় লেখবারও সুযোগ দিয়েছেন। আমার লেখা পড়ে তিনি কিছু কিছু অনাবশ্যক কথা কেবল বাদ দিয়েছেন। এখানে তিন চার বছর কাজ করার ফলে এখন অন্যান্য নবাগতদের মধ্যে আমাকে সিনিয়র বলা হয়। পত্রিকার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তাই প্রতি বছর কলেজের ছাত্রদের থেকেই আধাবেতনে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তাই প্রতি বছরই নবাগত ছেলেরা আসে, তবে আমি তাদের মধ্যে পুরানো। তাই সম্পাদক মশায় আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। বি. এ. ক্লাসের পড়াশোনাও ভালই চলছে। আপনি একটুও চিন্তিত হবেন না। আটাকলে এখন আর বেশী যাই না। প্রেসেও মেশিনের কাজ শিখতে আজকাল সপ্তাহে দু একবার মাত্র যাই। শারীরিক পরিশ্রম সেখানেও করতে হয় না, তাই আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। মাকেও এই সব বিষয় জানিয়ে নিশ্চিন্ত করবেন।

আপনি যে খবর জানতে চেয়েছেন সে বিষয় লিখছি এবার। বেঙ্কটরায় লোকটিকে বোঝা মুশকিল। খোঁজ খবর নেবার জন্য প্রশ্ন করলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং উলটো পালটা জবাব দিতে শুরু করে। এর আগে কয়েকবার বেঙ্কট আমায় ওর কাছে রাখা চিঠি দেখিয়েছে কিন্তু পাগলাটে স্বভাবের জন্য আমি কখনও সে চিঠির প্রতি মনোযোগ দিইনি। একবার মাত্র পড়েছিলাম। এখন আবার পড়তে চাওয়ায় ওর সন্দেহ হয় এবং চিঠি আমাকে আর দেখাতে চায় না। বহু খোসামোদ করে ওকে খুশী করতে হয়েছে। যখন মন মেজাজ ভাল থাকে চিঠি নিয়ে ও জনে জনে দেখিয়ে বেড়ায়। একটু কান্নাড়া জানা লোকের সঙ্গে

আলাপ হলেই তাকে চিঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'আমার ভাগ আমি পাব কিনা বলতে পারেন ?' যে ঐ চিঠি পড়ে সেই পালটা প্রশ্ন করে, 'এটা কি কোন দানপত্র ? তুমি এটা পেলে কি করে ?' চিঠিটা পড়ে আমারও সেই রকমই ধারণা হয়েছে। এখানে এক উকিল বন্ধুকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় সেও তাই বলেছে। চিঠিটা এই প্রকার—

স্বামীরায় ও শ্রী কৃষ্ণজী কুলকর্ণী সাকিন ধারবাড়-এর নামে বেঙ্কটরায় বামন বিন্দুগোল, সাকিন বিন্দুগোল, বর্তমানে পুণার অধিবাসী, পেশা চাকুরী। এই দানপত্র লিখিতেছি। আমি এবং আমার বড় ভাই শ্রীমান রাঘবেন্দ্র বামন বিন্দুগোল দুইজনে সম্পত্তির সমান অংশীদার। আমাদের পিতার আর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার আমরা দুইজন মাত্র। আমি অন্যত্র চাকুরীরত বলিয়া আমাদের অবিভক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান আমার বড় ভাই শ্রীমান রাঘবেন্দ্র বামন বিন্দুগোল করেন এবং সম্পত্তি তাঁহারই অধীনে আছে। আমরা সম্পত্তি ভাগ করি নাই। ইতিমধ্যে আমি এক বিশেষ বিপদে পড়ি। আপনি সাগ্রহে আমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সেই উপকারের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার অংশ আমি স্বেচ্ছায় আপনার নামে দানপত্র লিখিয়া দিতেছি। এই সম্পত্তিতে আমার বংশের কাহারও কোন দাবী রহিল না. আপনি এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। আমি অবিবাহিত, সুতরাং আমার সম্পত্তিতে অন্য কাহারও কোন অধিকার নাই। আমার অংশের সম্পত্তি আপনি পঞ্চায়েতের সামনে বুঝিয়া লউন এবং আমার বড় ভাই-এর নিকট হইতে আমার অংশ চাহিয়া নিজের অধিকারে আনুন। এই দানপত্র রাঘবেন্দ্র বামন বিন্দুগোল-এর সম্মুখে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। দানপত্র সমাপ্ত।

হস্তাক্ষর তাং 15. 5 — বেঙ্কটেশ বামন বিন্দুগোল

ও

স্বামীরায় ও কৃষ্ণজী কুলকর্ণী

সাক্ষী

শান্তপ্পা শিবপ্পা শেট্টী — রাঘবেন্দ্র বামন বিন্দুগোল,

এই চিঠিতে রেজিস্ট্রেশনের কোন ছাপ নেই, কিন্তু যে ক্লার্ক এই চিঠি পড়ে সেই বলে সব ঠিক আছে। তবে আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে। কাগজ-খানা গাঢ় রঙের কালিতে লেখা এবং খুব পুরাতন। এটা আসল কাগজের প্রতিলিপি হওয়ার কথা। স্বাক্ষরগুলি সবই যদিও একই গাঢ় কালিতে লেখা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে প্রতিটি স্বাক্ষর ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতের লেখা বলেই মনে হয় সেইজন্য আমার সন্দেহ এটি প্রতিলিপি নয়, এইটিই আসল

দানপত্র। কিন্তু তা যদি হয় তাহলে তো এ কাগজ স্বামীরায় ও কৃষ্ণ কুলকর্ণীর কাছেই থাকা উচিত, বেঙ্কটরায়ের কাছে এ কাগজ কেন রয়েছে? এখনও কাগজখানা রেজিস্ট্রি হয়নি, এটা তো স্বামীরায় কুলকর্ণীর কাছে সযত্নে রক্ষিত থাকা উচিত ছিল। এ সব সন্দেহের অর্থ আপনাকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বেঙ্কটরায় সম্বন্ধে অন্য কিছু খবর বার করা খুব কঠিন। এই চিঠি পড়বার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি ধরনের বিপদে পড়েছিল সে, কিন্তু জবাব না দিয়ে বেজায় রেগে উঠল। চিঠিটা আমি খুব মন দিয়ে পড়ছি এটাও যেন তার সহ্য হচ্ছিল না। ওর মেজাজের পরিচয় তো আপনি পাঁচ মিনিটের পরিচয়েই পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে যদি আরো কোন তথ্য আপনার জানা থাকে এবং আরো কিছু খোঁজ খবর নিতে হয় আমাকে লিখবেন, আমার উকিল বন্ধুর কাছে খোঁজ নিয়ে জানাতে পারব। আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মা এবং ভাইদের কুশল সমাচার জানাবেন।

ইতি
আপনার প্রিয় পুত্র
অচ্যুতরাও।

চিঠি পড়ে দেসাঈজীর মনে উত্তেজনার ঝড় উঠল। যতটা তাঁর জানা ছিল তার সঙ্গে এই চিঠিখানা মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার মাঝে মাঝে সন্দেহের মেঘ তার ওপর ছায়া ফেলছে। এতদিন তীরে দাঁড়িয়েছিলেন দেসাঈজী কিন্তু এই চিঠিখানা যেন ওঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ছেলের প্রখর বুদ্ধি দেখে আনন্দও হচ্ছে মনে। একটা সঙ্কল্প দেখতে দেখতে ওর মনে দৃঢ়মূল হয়ে গজিয়ে উঠল। উনি এবং অচ্যুত দুজনে মিলে এই রহস্যের জট খুলবেনই। পরের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না তিনি কিন্তু এই চিঠিটা পাবার পর সে মত একেবারে পালটে গেছে। কাজে নামবার আগের একটা প্রচণ্ড আবেগ মনে মনে অনুভব করছেন। ওঁর ওপর ভরসা করে থাকা এক অসহায় বিধবা আর একটা সরল সাদাসিধে ছেলের মঙ্গলচিন্তায় শুধু নয়, তাঁর শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে লোক সেই ধূর্তকে উচিত শিক্ষা দেবার এই সুযোগ কোন মতেই বৃথা যেতে দেবেন না দেসাঈ। পিতার মৃত্যুর পর এমন লড়াইয়ের সুযোগ আর আসেনি। নিজের অজান্তেই যেন তিনি আস্তিন গুটিয়ে আখড়ায় নেমে পড়েছেন। পিছিয়ে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না আর।

যৌবন যেন নতুন করে ফিরে এল দেসাঈজীর দেহে মনে।

27. বসন্ত ও রাঘপ্পা

রাঘপ্পার পরামর্শ অনুসারে বসবন্নী বসন্তরাওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাঘপ্পার কাছে নিয়ে আসার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে, 'আমি তো বলেছি, গৌড়জী আমাদের একেবারে নাটকঅন্ত প্রাণ। তাই শুনে উনি বললেন, 'তাই নাকি, গৌড় এত নাটক ভালবাসে তাহলে তো আমার সঙ্গে তার খুব মিল হবে।' ওঁর তো আগে নিজেরই কোম্পানী ছিল, কত অভিনেতাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। এমন কথাও বলেছেন যে গৌড় যদি রাজী থাকে তো আবার একখানা নাটক নামিয়ে ফেলা যায়। আমার তো স্থির বিশ্বাস আপনাকে একবার দেখলে রাজার পার্টখানা উনি ঠিক আপনাকেই দেবেন। এক্কেবারে রাজা রাজা চেহারা, প্রথম দিন আপনাকে দেখেই কথাটা আমার মনে হয়েছে।' বসবন্নীর এত মেহনতের ফল হল। একদিন বসন্ত নিজে থেকেই বলল, 'চল হে বসবন্নী একদিন ধারবাড় ঘুরে আসা যাক, বহুদিন শহরে যাইনি।'

বদনামের ভয়ে ধারবাড় ত্যাগের পর বসন্ত গ্রামে গিয়ে নানা রকম ধান্দায় এমনই মেতে গিয়েছিল যে ধারবাড়ের কথা ওর মনেই পড়ত না। গ্রামের আকর্ষণ কিছু কম নয়। গরু বলদ, ক্ষেত খামার এ সবের আকর্ষণে গ্রাম ছাড়তে তার ইচ্ছাও করত না। ছোটখাট কারণে গ্রাম ছেড়ে যেতে সে প্রস্তুত নয় কিন্তু নাটকে যদি রাজার পার্ট পাওয়া যায় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। এর আগের বার যখন বিশেষ উৎসাহ সহকারে নাটকের মহড়ায় মেতেছিল তখন বাবা এসে সব মাটি করে দেন। সেই অপূর্ণ আশা এবারে হয়ত পূর্ণ হবে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? সুতরাং বসন্ত ধারবাড় যাওয়া স্থির করল। পাছে বাবা টের পেয়ে যান সেই ভয়ে রাত্রের বাসে ও বসবন্নীর সঙ্গে এসে নামল ধারবাড়ে। বসবন্নী ওকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুলল রাঘপ্পার বাড়ি।

রাঘপ্পা সাদরে অভ্যর্থনা করে প্রথমে চা খাওয়াল তারপর রাত্রের খাওয়াও হল চমৎকার। কাজু কিসমিস বোম্বাইয়ের পেস্তা আর নানারকম ফলফলুরী খেয়ে বসন্ত তো একেবারে খুশীতে আত্মহারা। বসন্তও যথেষ্ট বড়লোকের ছেলে কিন্তু বেণুবাঈয়ের রান্নাঘরে ভোজ্যের স্বাদ অপেক্ষা পরিমাণের দিকে নজর দেওয়া হয় বেশী। নিজেদের বাড়ির খাওয়ার তুলনায় রাঘপ্পার বাড়ির খাওয়া দাওয়া বসন্তের কাছে অনেক বেশী তৃপ্তিকর মনে হল। ভীমসেনের মত রাঘপ্পা অনুরোধ উপরোধ করে খাওয়াচ্ছে এবং নানা রকম খোসগল্প চলেছে খাওয়ার সময়। অথচ বসন্তদের বাড়িতে খেতে বসে গল্প-গুজব করা একেবারে নিষিদ্ধ।

খাওয়া দাওয়ার পর বৈঠকখানা ঘরে রাত দুটো পর্যন্ত রাঘপ্পা নানারকম চিত্তাকর্ষক গল্প করে বসন্তকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলল। নাটক কোম্পানীর কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। সুপ্রসিদ্ধা মহবুবজান ছিল এঁরই রক্ষিতা এ খবর শুনে রাঘপ্পার প্রতি বসন্তের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। রঙ্গমঞ্চের আলোয় স্বপ্নের মত দেখা দিয়ে যাঁরা মিলিয়ে যান, হ্যাণ্ডবিলে যাঁদের ছবি ছাপা হয় সেইসব মানুষরা যেন

এখন বসন্তের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছেন। মহবুবজানের ভুল উচ্চারণ রাঘপ্পাই সংশোধন করে দিত শুনে বসন্ত ভাবল, আচ্ছা বড় অভিনেতাদেরও তাহলে উচ্চারণে ভুল হয় ? কত জায়গায় কত ফৈজত, কোথাও তাঁবুই ছিঁড়ে গেল, কোথাও বা মাতালের উপদ্রব ঠেকাতে গিয়ে কত ঝঞ্ঝাট, তাছাড়া কতরকম ভাবে ধাপ্পা দিয়ে ভয় দেখিয়ে লাইসেন্স আদায় করতে হয়, ষ্টেজের জিনিসপত্র হারিয়ে কি রকম বিপদে পড়তে হয়, সময়মত মাইনে পত্তর না পেয়ে নট নটীরা হয়ত অভিনয়ের আগের মুহূর্তে বেঁকে বসল, এমনও ঘটে, এইসব গল্প অনর্গল বলে যাচ্ছিল রাঘপ্পা। গল্পগুলো একেবারে যে মিথ্যা তা নয়, কিন্তু সত্যের ওপর অনেকখানি রং চড়িয়েই বলা হচ্ছিল আর বর্ণনার গুণে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল বসন্তর। গল্প করতে করতেই রাঘপ্পার মনে আর এক চিন্তার উদয় হয়েছে। বসন্তের চেহারাটি সুন্দর। কন্যার পিতা রাঘপ্পার তাকে দেখেই মনে হয়েছে 'শান্তার সঙ্গে বেশ মানায় ছেলেটিকে।' বসন্ত ক্রমেই যেমন রাঘপ্পার প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়ছে তেমনি রাঘপ্পাও ক্রমেই মনস্থির করে ফেলছে, একে জামাই করতেই হবে। দেসাঈজীর ওপর শোধ নিতে গিয়ে যদি এমন বড়লোক জামাই সংগ্রহ করে ফেলা যায় তাতে দোষ কি ?......

"শুনেছি গ্রামে আপনি নাটক করিয়েছিলেন ? ...অবশ্য গাঁয়ের নাটক তো মার-ওয়াড়ির পাগড়ির মত যেমন খুশি বেঁধে নিলেই হল। তাদের শেখাতে শেখাতে মাস্টার বেচারার দফা শেষ হয়ে যায়। নাটকের আসল জায়গা হল শহর। একটার জায়গায় দুটো হ্যাণ্ডবিল ছড়াও তো নাটকের চেহারাই বদলে যাবে। আসল কথা হচ্ছে ... অভিজ্ঞ অভিনেতা চাই, স্ত্রী ভূমিকা অভিনেত্রী দিয়েই করাতে হবে এবং ভাল গান জানা লোক চাই অন্তত তিনচার জন। পয়সাকড়িরও যোগাড় রাখতে হবে। এই সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে বুঝলেন কিনা বসন্তরাও,...আপনি আট আট আনা টিকিট রাখলেও লোক ভেঙে পড়বে। সাজসজ্জাও খুব ভাল হওয়া দরকার। মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে হবে। পয়সা ঢালতে পারলে তবেই নাটক জমানো যায়। না হলে শুধু মুড়ি ছোলা খাইয়ে ষ্টেজে নাচাতে গেলে পয়সাও জলে যাবে নামও হবে না।"......

বসন্তও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কৌতূহলী বসন্ত প্রশ্ন করল, "আচ্ছা রাঘপ্পাজী, রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য খুব জবরদস্ত লোক দরকার, তাই না ?"

বসন্তের মনের ভাব বুঝে রাঘপ্পা উত্তর দিল, "আরে, এমন কিছু নয়, সাজসজ্জা আর মেক আপের গুণে গাধাকেও রাজা সাজানো যায়। তবে গলার স্বরটা গম্ভীর হলেই ভাল আর হ্যাঁ, একটু লম্বাও হওয়া দরকার। উচ্চারণ পরিষ্কার হওয়া চাই। এসব জিনিস আপনা থেকে হয় না বসন্তরাও, এর জন্য শিক্ষা দরকার। যার এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকের শিষ্য হয়ে শিখতে হয় এসব। অভিনয় একটা শিল্প আর এ বেশ কঠিন শিল্পকলা। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলেও যদি শিখতে চায় তবে তাকেও অন্তত পনেরো দিন রোজ ছ'ঘণ্টা করে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। ভাল

অভিনয় সহজে হয় না। এ সবের ওপরে অভিনেতা যদি ব্যক্তিত্বশালী হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এই তোমার কথাই ধর না কেন, তুমি যদি এসে এখন আমায় বল, 'আমাকে রাজার ভূমিকা দিন, আমি বেশ করতে পারব', তাহলে আমি স্রেফ 'না' করে দেব। আগে তোমার বুদ্ধি, শক্তি, শেখার উৎসাহ এসব আমি ভাল করে পরখ করে দেখব তারপর হয়ত বলতে পারি, হ্যাঁ ছেলের চেষ্টা আছে, আজ না হোক কাল শিখে নিতে পারবে।"

"আমি তো শিখতে প্রস্তুত, কিন্তু আপনার কি মনে হয়, আমার দ্বারা হবে ?"

"সেই কথাই বলো বন্ধু যে তুমি শিখতে প্রস্তুত। তোমার মত ছেলে চেষ্টা করলে কি না শিখতে পারে ? তুমি আমি দুজনে মিলে আউটি নাম দিয়ে একটা কোম্পানী খুলে ফেলতে পারি। দু চারদিন এদিকে যাওয়া আসা করলেই বুঝতে পারবে কি তীব্র এই আকর্ষণ। অভিনয় এক কঠিন বিদ্যা। প্রথমে সহজ অভিনয় শিখে তারপর কিভাবে ক্রমশ জটিল অভিনয় কলায় পৌঁছতে হবে, অবশেষে রীতিমত উচ্চস্তরের অভিনয় চাতুর্য আয়ত্ত করতে হবে, কখন ভ্রূকুটি প্রকাশ করবে, কিভাবে প্রবেশ করবে সবই শেখা প্রয়োজন। রূপসজ্জা নষ্ট না করে কিভাবে মাথায় হাত দেবে, গোঁফে তা দেবে অথচ গোঁফ খুলে পড়বে না, সহ অভিনেতার মাথায় সত্যিকারের গদার বাড়ি না মেরে কি ভাবে গদাযুদ্ধ করবে, দরকার মত চট করে অশ্রুবন্যা বইয়ে দেবে, কত কিছু ছোট খাট বিষয় আছে শিক্ষার, বুঝলে ভায়া ? এত সব শিখতে হবে বাহাদুর দেসাঈ, ভাল করে ভেবে দেখ।"

"বিদ্যা তো কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, আপনি যেমন নাচাবেন আমি সেইভাবেই নাচতে প্রস্তুত।" রাঘপ্পার শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশে কথাটা বলল বসন্তরাও। কিন্তু ইতি-মধ্যেই সে মনে মনে নিজেকে রাজার ভূমিকায় বসিয়ে ফেলেছে।

পরদিন ভোর হতেই বসন্ত বসবন্নীর সঙ্গে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হল। বিদায়ের আগে চা পানের সময় শান্তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎও হয়ে গেল।

এরপর থেকে বসন্তরাও প্রতি সপ্তাহেই দু এক বার লুকিয়ে লুকিয়ে ধারবাড়ে চলে আসে। মাদার বেঙ্কামানী, হিরোয়িন সুন্দরমানী, হাস্য শিখামনী তুলজা রাম, খলনায়ক রাজশেখরাপ্পা, হীরা ভদ্দুরাও ডবগল্লি, সঙ্গীতমার্তণ্ড গণুবুবা ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে রাঘপ্পা বসন্তের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এদের সবাইকে রাঘপ্পা বলেছে, সামনের বছর দেসাঈজী কোম্পানী খুলছেন, আপনাদের সবাইকে এতে যোগ দিতে হবে। সুন্দর-মানীর বাড়ি ছোটখাট একটা বৈঠকও হয়ে গেছে। পান তুলে নিয়ে বসন্ত তার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়েছে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে চন্দ্রয়্যাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর হারমোনিয়ামের দরদস্তুর করা হচ্ছে। হারমোনিয়ামের দোষ গুণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে রাঘপ্পার অগাধ জ্ঞান দেখে বসন্তরাও ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। গুরুর ওপর তার অখণ্ড বিশ্বাস জন্মেছে এখন। রঙ্গমঞ্চের সামনের পর্দা এবং ঘরবাড়ি,

পথ, অরণ্য ইত্যাদির দৃশ্য আঁকা আটখানা বা ছ খানা পর্দার কত দাম পড়বে তা নিয়ে ফকীরাপ্পার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে অভিনেতাদের বেতন খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বাদে শুধু সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য অন্তত দু হাজার টাকা দরকার। হিসেব দেখে বসন্তের তো চক্ষুস্থির। গ্রামে শ'খানেক খরচা করলেই আস্ত একখানা নাটক নামানো যায়, এমন কি দু চার টাকা বেঁচেও যায়। এখানে তো একটা মুকুটের দামই একশ' টাকা।

ওকে উৎসাহ দিয়ে রাঘপ্পা বলল, "এত ভাবছ কেন দেসাঈজী? তোমার যা সম্পত্তি আছে শহরে আমার যদি অত থাকত তাহলে দেখিয়ে দিতাম নাটক কাকে বলে।"

ফসল বিক্রির ব্যাপারে রাঘপ্পার তেমন উৎসাহ নেই কারণ ওতে বিশেষ কিছু লাভ থাকে না। এখনকার মত ঐ ভাবে কিছুটা অর্থ হয়ত সংগ্রহ করা যায় কিন্তু রাঘপ্পার মত এলেমদার লোকের পক্ষে এত ছোট জিনিসে হাত ময়লা করা ঠিক শোভা পায় না।

"এ রাস্তায় কিছু আমদানী হয়ত হবে, কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন লুকিয়ে কাজ চালাবে দেসাঈ? তুমি এখন সাবালক হয়েছ, আর তাছাড়া পয়সাটা জলে তো দিচ্ছ না, এটাও তো একটা ব্যবসা? যেমন ঢালবে তেমনি পয়সা তুলতেও পারবে, এতে তো লজ্জার কিছু নেই। ওসব লজ্জা টজ্জার দিন আর নেই। প্রথমটা দু চারজন হয়ত একটু আধটু বদনাম করবে, তা করতে দাও। এ ব্যবসায় তুমি যত সৎপথে থেকে চোখকান খোলা রেখে চলতে পারবে ততই লাভ হবে। যদি অন্যের হাতের পুতুল হয়ে যাও আর বদখেয়াল আরম্ভ কর তাহলেই লোকে ঠকাবে তোমায়। ভুল পথে চলার মত বদ বুদ্ধি যার থাকে সে তো ঘরে বসে বসেও লোকসানের কড়ি গোণে দেসাঈজী। এই তো আমি সব রকম সাধ আহ্লাদই করেছি, কিন্তু কি ক্ষতিটা হয়েছে আমার? ফূর্তি ঠিকই করবে, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে ডুবে যাবে না, ডুবেছ কি মরেছ। ঐটুকু বিবেকবোধ যদি তোমার থাকে তাহলেই ভয় বা লজ্জা পাবার কোন কারণই থাকবে না, কিছু লুকোছাপারও প্রয়োজন হবে না। নাটকও একটা ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়।"

বাসে বসে রাঘপ্পার এই সারগর্ভ উপদেশগুলি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে গ্রামে ফিরে গেল বসন্তরাও।

28. চম্পকার চিন্তা

চম্পক্কার মন আজকাল হাজার রকম চিন্তা ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এককালে যে বাড়ির আবহাওয়া ছিল সর্বক্ষণ উৎসবমুখর কর্মচঞ্চল, সে বাড়ি আজ এমন নিস্তব্ধ নিরানন্দ, এটা চম্পক্কাকে বড় ব্যথা দেয়। ওর বয়স হল প্রায় সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। এ সংসারে এসে গত বিশ বছরে অনেক কিছু দেখল সে, দুঃখও যেমন পেয়েছে সুখের মুখও একেবারে দেখেনি তা নয়। কিন্তু এখন যেন সবকিছু একেবারে শূন্যতায় ভরা। স্বামীকে সে ভালবেসেছে, খুব কাছ থেকে, খুব অন্তরঙ্গভাবে চিনেছে তাকে। তার স্ফূর্তিবাজ স্বভাবের আড়ালে লুকোনো রুদ্র রূপও জানতে বাকি নেই ওর। তাই স্বামীর স্বভাবের সাম্প্রতিক পরিবর্তন অন্যের চোখে তত ধরা না পড়লেও চম্পার চোখে পড়ছে বড় স্পষ্ট ভাবে। যে হৃদয় ছিল বজ্রকঠিন নিশ্ছিদ্র অটল প্রাচীরের মত তাতে আজ দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল, অথচ এ দেখেও কিছু করবার নেই চম্পক্কার, মূক বেদনায় সহ্য করে যাওয়া ছাড়া। ও বুঝছে ওর স্বামীর এবার পরাজয়ের পালা শুরু হয়েছে।

এরই নাম কি বার্দ্ধক্য? ... খাওয়া কত কমে গেছে রাঘপ্পার। এতটুকু ময়লা কাপড় যে সহ্য করতে পারত না তারই জামার কলারে আজ পুরু ময়লার রেখা দূর থেকে চোখে পড়ে। শরীর আগের মত দৃঢ় কিন্তু মুখে সেই স্ফূর্তিবাজ স্বভাবের ছাপটা আর নেই। তার জায়গায় কলমের আঁচড়ের মত লম্বা লম্বা রেখা ফুটে উঠেছে মুখে। বাইরের লোকে কিছু না বুঝলেও চম্পক্কা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আজকাল কেমন যেন থেকে থেকে শিউরে ওঠে। এমনও সময় গেছে যখন পরদিন সকালে রান্না চড়াবার মত একটি দানাও হয়ত ঘরে নেই, কিন্তু তাতেও রাঘপ্পার রাত্রে নিশ্চিন্ত নিদ্রার এতটুকু ব্যাঘাত ঘটেনি। আর আজকাল সেই মানুষ রাত্রি দুটো পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে।

আর একটা নতুন জিনিস হয়েছে। এতকাল রাঘপ্পার মুখ দেখে বোঝবার উপায় ছিল না সে কি ভাবছে। স্বামীর মুখে মুচকি হাসি প্রায় সর্বদাই লেগে থাকত কিন্তু একটা কিছু ঘটনা ঘটে যাবার পর তবেই বোঝা যেত হাসিটার কারণ। কিন্তু আজকাল সেই মানুষ নিজের মনে বিড় বিড় করে কথা বলে। মনের ছবি যার মুখে কখনও এতটুকুও ছায়া ফেলত না তারই মুখ দেখলে এখন তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়, নিজের অজান্তেই এখন ওর ঠোঁট নড়তে থাকে। একদিন তো চা খেতে খেতে স্পষ্ট বলে উঠল, "প্রাণ যায় যাক তবু ওর হাতে পড়া চলবে না।"

শান্তা আর চম্পক্কা দুজনেই শুনল কথাটা। এত স্পষ্ট স্বরে বলা যে চম্পা ভাবল স্বামী ওকেই কিছু বলছেন বুঝি। জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কি হয়েছে?" এবার রাঘপ্পা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "কি বলছ?" চম্পক্কা বলল, "তুমি কি যেন বলছিলে?"

"আমি আবার কখন কি বললাম? ক্ষেপে গেলে নাকি?" চিনির কৌটোটা তাকে রাখতে যাচ্ছিল শান্তা। বাপের কথা শুনে সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"শান্তা, তুই কিছু শুনিস নি ?"

শান্তা সাক্ষী দিল, "হ্যাঁ, আপনি তো বললেন কার হাতে যেন পড়বেন না।"

রাঘপ্পা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "না না আমি কাউকে কিছু বলিনি। শুধু শুধু পাগলামো করে আমায় রাগিয়ে দেবে না বলে দিচ্ছি।"

"কি যে হয়েছে তোমার, এমন করছ কেন ?"

"খবরদার বলছি", বলেই ঢকঢক করে চাটুকু গিলে রাঘপ্পা উঠে চলে গেল সেখান থেকে। এরপর থেকে ঐ রকম স্বগতোক্তি শুনলেও চম্পক্কা ভাব দেখায় যেন কিছুই শোনে নি। কোন বাধা না পেয়ে রাঘপ্পার স্বগতোক্তি কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলেছে। চম্পক্কার মনে হচ্ছে স্বামী খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে বার্দ্ধক্যের পথে। একদিন শান্তাকে সে বলে ফেলল, "ঠাকুরের কাছে রোজ প্রার্থনা করি তোর বিয়েটা হয়ে গেলেই ওঁর আগে ঠাকুর যেন আমায় ডেকে নেন। আর বেশী বাঁচতে চাই না আমি। তোর জন্মের সময় যদি মরে যেতাম তাহলে এতদিনে আমার পনেরোবার শ্রাদ্ধ হয়ে যেত". বলতে বলতে চোখে জল ভরে এল চম্পার।

আরো এক দুশ্চিন্তা, এই বয়সে যদি আমার সন্তান সম্ভাবনা হয় ? মৃত্যু আর যন্ত্রণার ভয় তো আছেই, কিন্তু কষ্ট তো সারা জীবন ধরেই পাচ্ছে ও। সব দুঃখই সইতে ও প্রস্তুত। ডাক্তার স্পষ্ট বলে দিয়েছিল আবার সন্তান হলে মৃত্যু ওর অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু ছেলেই যে হবে তারই বা কি নিশ্চয়তা ? কিন্তু ধর যদি পুত্রসন্তানই হল, এত আশার জিনিস, অথচ তাকে অনাথ ফেলে রেখে মরে যেতে হবে...? এই সব চিন্তা সমস্তক্ষণ পীড়া দিচ্ছে চম্পাকে। কিন্তু স্বামী যদি সন্তানের আশায় কাছে আসেন তাঁকে ও ফেরাবে কি করে ? শেষ পর্যন্ত 'ও সব চিন্তা করা আমার কর্তব্য নয়' এই ভেবে সে নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করে কিন্তু চিন্তা তবু ছাড়ে না। তাছাড়া রত্নারও সন্তান হয়নি। তার সামনে এই বুড়ো বয়সে অন্তঃস্বত্ত্বা হলে তাকে দুঃখ দেওয়া হবে। রত্নার মুখের গ্রাস যেন কেড়ে নেওয়া হবে। হায় রে...কি করবে সে এখন ?

চম্পক্কা নিয়মিত মহাভারত ও ভাগবত পাঠ করে। তার মনে হচ্ছে এইভাবে ফন্দী করে স্বামী তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করছে এতে নিশ্চয় পাপ হবে। কিন্তু স্ত্রী হয়ে এক্ষেত্রে কি করতে পারে সে ? স্বামীর সঙ্গে মহবুবজানের সম্পর্কের কথা যখন টের পেয়েছিল সে তখন তার সহ্যশক্তি অনেক বেশী ছিল, আর তাছাড়া এবারের সমস্যার সঙ্গে যে নৈতিক প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে এটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। সবকিছুর ওপরে, দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গের মত স্বামী আজ যেভাবে ক্রমশ ভেঙে পড়ছে দেখে যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছে ওর। কালিদাসের কাব্যে অজরাজের বার্দ্ধক্যের ঠিক এইরকম বর্ণনাই আছে,—বটবৃক্ষ যেমন বিরাট প্রাসাদের দেওয়ালে ফাটল ধরিয়ে দেয় ইন্দুমতীর বিরহও সেইভাবে অজরাজের হৃদয়কে করেছে দীর্ণ বিদীর্ণ।

এতসব ভাবনার ওপরেও রয়েছে শান্তার ভবিষ্যৎ। শান্তা ক্রমেই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। ছিপছিপে ডাঁটার ওপর আধফোটা গোলাপকলিটির মত দেখতে লাগে তাকে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে সে এতটা রূপসী হয়ে উঠবে আগে বোঝা যায়নি। বাপ মা দুজনেই অবশ্য সুন্দর কিন্তু শান্তার রূপ যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। উজ্জ্বল গৌরী, দীর্ঘাঙ্গী শান্তাকে দেখলেই সবাই বলে, এ মেয়েকে যে পাবে সে বড় ভাগ্যবান। মেয়ের রূপের জন্য মায়ের মনে গর্ব তো হয়ই, কিন্তু তা সত্ত্বেও রূপ সম্বন্ধে চম্পার মনে বড় ভয় আছে। সে নিজেও ছিল রূপসী কিন্তু তাতে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। তাই ভুলেও সে কোনদিন শান্তার সামনে বা তার আড়ালেও শান্তার রূপের প্রশংসা করে না। কিন্তু মেয়েকে তো আর কাঁচের বাক্সে বন্ধ রাখা যায় না। মা হাজার চেষ্টা করলেও মেয়ের মধ্যে একটু আধটু রূপের অহঙ্কার দেখা দেবেই, এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শান্তা রত্নার চেয়ে দু'তিন ক্লাস বেশী পড়েছে। তাছাড়া দিনকাল বড় তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। রত্না যখন স্কুলে যেত তখনকার সঙ্গে শান্তার স্কুলজীবনের দিনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। দুই বোনের বয়সের তফাৎ মোটে পাঁচ বছরের, কিন্তু এর মধ্যেই সমাজের রীতি রেওয়াজ বদলে গেছে অনেকখানি। লবণ সত্যাগ্রহের সময় স্কুল কলেজে হরতাল হয়েছে শান্তাও যোগ দিয়েছে তাতে। সারা স্কুলে ওরা ছাত্রী ছিল মাত্র বারোজন, এদের মধ্যে আবার কয়েকজনের বয়স ষোল পেরিয়েছে তাই লজ্জা ও সংকোচে তারা শোভাযাত্রায় যোগ দিত না, কিছু মেয়ের পরিবার বেশী রক্ষণশীল, শোভাযাত্রায় যোগ দিলে হয়ত স্কুল ছাড়িয়ে নেবে এই ভয়ে যেত না তারা। শান্তার বাড়িতে কিছুটা স্বাধীনতা ছিল, তার বয়সও কম, সে তখন মোটে বারো বছরের বালিকা, তাই ঐ সব শোভাযাত্রায় সে স্বচ্ছন্দেই যোগ দিয়েছে। উত্তর কর্ণাটকের আর একটি মেয়ে এবং শান্তা দুজনে পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রার একেবারে সামনে 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' গাইতে গাইতে মার্চ করেছিল। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কোন বক্তা যখন বলতেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরাও অংশগ্রহণ করেছে' তখন শান্তা খুব খুশী হয়ে উঠত। ওর মনে হত ওকেই যেন প্রশংসা করা হচ্ছে। বয়স কম হলেও যুগের হাওয়ায় শান্তা বুঝতে শিখেছে স্বাধীনতা কাকে বলে। রত্নার মত নত হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বয়স কম হলেও শান্তাকে দেখলে যুবতী মনে হয়। ঘাগ্‌রা ওড়না ছেড়ে সে আজকাল শাড়ী পরছে। তাতে ওকে আরোই সুন্দর দেখায়। পাড়া প্রতিবেশী আর সখীরা সবাই ওর রূপের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। কিন্তু মায়ের আস্কারা পায়নি বলে ও তেমন অহঙ্কারী হয়ে ওঠেনি। একদিনের একটা ঘটনায় ওর মনে বেশ বড় রকম পরিবর্তন ঘটল। কৈশোরের চাপল্য ছেড়ে ও যেন গাম্ভীর্যময়ী আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্না এক তরুণী হয়ে উঠল সেদিন থেকে।

শান্তার লেখা একটি দেশভক্তিমূলক রচনা পড়ে এবং শান্তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের স্কুলের এক দেশপ্রেমিক তরুণ শিক্ষক শান্তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। অন্য কারোকে কিছু না বলে শান্তার প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে তিনি নিজেই একদিন রাঘপ্পার

কাছে এসে হাজির। শান্তার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসা করে অবশেষে তাঁর প্রার্থনা জানালেন এবং শেষ পর্যন্ত রাঘপ্পাকে এই বলে অনুনয় করলেন যে আর কোন কারণে না হোক, দেশের মঙ্গলের জন্যও তাদের দুজনের বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হোক। বেচারা শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটিও করে, কিন্তু রাঘপ্পা তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করেছিল। ভয় দেখিয়েছিল যে প্রধান শিক্ষকের কাছে রিপোর্ট করবে। বেচারা লোকলজ্জার ভয়ে চাকরী ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। ব্যাপারটায় মধ্যস্থ কেউ না থাকায় কথাটা পাঁচকান হতে পারে নি। কিন্তু শান্তার মনে একটু গর্বের ভাব জেগেছিল এই ভেবে যে তারই জন্য একটি লোক চাকরী ছেড়ে চলে গেছে। রত্নার মত সে সব ব্যাপারে মায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল অনেকটা সখীর মত। তাছাড়া চম্পক্কার অসুস্থতার জন্য সংসারের ভারও বেশীটা ছিল শান্তার ঘাড়েই। প্রকৃতপক্ষে সেই ছিল বাড়ির গৃহিণী।

রাঘপ্পা বসন্তের সঙ্গে শান্তার বিয়ে দিতে চায় এটা বুঝতে চম্পক্কার বেশী দেরী হল না। সে খুশীই হল। বসন্তের যে শান্তাকে পছন্দ হবেই তাতে তো কোন সন্দেহই নেই। শান্তা অপরূপ সুন্দরী। বসন্তর বাবা হয়ত রাজী না হতে পারেন। যাক, সে সব তার ভাববার দরকার নেই। একশ'টা মিথ্যা কথা বলে স্বামী তার কাজ ঠিক হাসিল করে নেবে এ বিশ্বাস ওর আছে। বসন্ত খুব বড়লোকের ছেলে এইটাই বেশী আনন্দের কথা। ভগবানের কৃপায় যদি তার আর সন্তান সম্ভাবনা না হয় তাহলে এই সামান্য সম্পত্তি রত্না আর কিট্টীর ভোগে লাগবে। বসন্ত, রত্নার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে না নিশ্চয়। সারা জীবন দুঃখের সঙ্গে ঘর করে চম্পক্কা অল্পেই ভয় পেয়ে যায়। কিট্টী যখন বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু করে তখন চম্পক্কার কোন দুর্ভাবনা হয়নি। কিন্তু বসন্ত ধনী সন্তান, রাঘপ্পার অনুমতি পেয়ে সেও আজকাল এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। চম্পক্কা এতে একটু শঙ্কিত বোধ করছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে এত বড়লোকের ছেলে আমাদের জামাই হবে কি সত্যিই? একে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কি উচিত?

চম্পক্কাদের বিয়েটা ধারবাড়ের প্রথম প্রেমঘটিত বিবাহ তাই সে যুগে এ বিয়ে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। চম্পক্কা সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভুল ধারণা ছিল। অন্যের সমালোচনায় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা মানুষের স্বভাব। চম্পক্কার সংযত গম্ভীর ব্যবহার দেখে অনেকে ব্যঙ্গ করে বলত 'ন' শ' ইঁদুর সাবাড় করে বিড়াল চলেছেন হজ করতে।' কিন্তু বুদ্ধিমতী চম্পক্কা সব দেখেশুনে অনেক শিক্ষা পেয়েছিল। ক্ষণিকের মোহে কৌমার্য হারিয়েছিল সে, তারপর সমাজে সে কি কুৎসা, মা কুয়োতে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন। ওদিকে রাঘপ্পা বিয়েতে আপত্তি জানাচ্ছিল। তার নিজের তখন কি নিদারুণ মনস্তাপ। এই সব আঘাতে ভেঙে পড়েই অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তার মা। আর এই সব কিছু ভুলের মূল্য শুধে চলেছে আজও চম্পক্কা। তাই নিজের মেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে সদা সশঙ্কিত, ভেবে ভেবে মাথা ঘুরতে থাকে তার।

29. সংঘর্ষ—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ

রাঘপ্পা এবং দেসাঈজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বহুকাল হয়নি তবে পরোক্ষে রাঘপ্পার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দেসাঈজীকে বার বার সচেতন হয়ে উঠতে হচ্ছিল। বসন্ত ধারবাড়ে আসে অথচ বাড়িতে দেখা না করে ফিরে যায় এ খবরটা এর ওর মুখে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত বেণুবাঈয়ের কানেও এসে পৌঁছল। তিনি দেসাঈজীকে বলতে দেসাঈ কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। বেণুবাঈ মিনতি করে বললেন চিঠি লিখে বসন্তকে ডেকে পাঠাতে কিন্তু দেসাঈজী তাতেও রাজী নন। বেণুবাঈ আর থাকতে না পেরে অবশেষে একদিন স্বামীর কাছে ফেটে পড়লেন, "এই রাঘপ্পা লোকটা কি পাজী! গঙ্গবা এর ছায়াও মাড়াতে চাইত না, তুমি কেন এর সঙ্গে লড়াই করছ, যার জিনিস তাকে দিয়ে দাও না। শেষে ছেলেটার মাথা খেয়ে দেবে। সেই দু হাজার টাকার জন্যই না এত কাণ্ড করছে? দিয়ে দাও সেটা, তোমারও ভাবনার শেষ হোক।"

"রাঘপ্পা এসে আমার পায়ে ধরলে তবে দেব। ইয়ার্কি পেয়েছে না কি? আমার সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছে। আমার সঙ্গে লড়বেন উনি! লড়ুক, দেখে নিচ্ছি এক হাত। কিট্টীকে পাঠাচ্ছে আমাকে আক্কেল শেখাতে। একবার নিজে সামনাসামনি আসুক না দেখি। থামে বেঁধে শাস্তি দেব আমি।"

"আগে তো তুমি ওদের ঝগড়ার মধ্যে থাকতে চাইতে না, এখন এসব ভাবছ কেন? এখন কি আবার লড়াই করে আনন্দ পেতে চাও তুমি?"

"সে সব কথা ভুলে যাও। আমি চুপচাপ থাকলেও যখন আমায় খোঁচাচ্ছে তখন একবার ভাল করেই ফয়সলা হয়ে যাক।"

"তার সঙ্গে যা খুশি কর গিয়ে, কিন্তু বসন্তকে অন্তত চিঠি লিখে আনিয়ে নাও এখানে। নয়ত আমাকেই ওর কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি যত বেপরোয়া হয়ে উঠছ সেও তেই রাঘপ্পার জালে ফেঁসে যাচ্ছে। ছেলেমানুষ বৈ তো নয়, বেচারী! আমিই দু চারদিন ওর কাছে থেকে আসি গিয়ে।"

আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না দেসাঈজী। ওঁর মনে হল স্ত্রীকেও এবার সমস্ত ব্যাপারটা জানানো উচিত।

"ভাবছ ছেলে তোমার এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই না? বাপকে কি রকম চিঠি লিখেছে শোন তাহলে," দেরাজ থেকে বসন্তের দুদিন আগে লেখা চিঠিখানি বার করে স্ত্রীকে শোনালেন দেসাঈজী।

শ্রী

ইনামগ্রাম, সাদা বাড়ি

পূজনীয় তীর্থরূপ শ্রীশ্রীগোপাল রাও দেসাঈজী শ্রীচরণেষু।

এ পত্র এ কারণে লিখিতেছি যে আমি আজ দুই বৎসর সাবালক হইয়াছি, অথচ আমার অংশ আমাকে না দিয়া আপনি নিজেই তাহা ভোগ করিতেছেন।

আপনার তিন পুত্র, আমি তাহাদের মধ্যে মধ্যম। পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা যত শীঘ্র সম্ভব আমার নামে লিখিয়া দিবেন। আপনার সম্মতি থাকিলে দশজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্পত্তি ভাগ করিয়া আমার অংশ আমি গ্রহণ করিতে চাই। আমার বড় ভাই অচ্যুতরাও এবং নাবালক ভ্রাতা পুরুষোত্তম তাহাদের ইচ্ছামত নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করিতে বা আপনার হেফাজতে রাখিতে পারে। তাহাদের ব্যাপারে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত ফয়সলা দশজন ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে হওয়া উচিত। আমার অংশ আমার প্রয়োজন। এই পত্রপ্রাপ্তির তিনমাসের মধ্যে যদি আমার অংশ আমি না পাই তাহা হইলে ফলাফলের জন্য আপনিই দায়ী থাকিবেন। বিলম্বের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। সেই কারণে ফয়সলা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। আপনার আপত্তি না থাকিলে আমার শুভার্থীগণকে সঙ্গে লইয়া আমি আপনার সহিত দেখা করিব। বিনীত নিবেদন এই যে আপনার মতামত জানাইতে অহেতুক বিলম্ব করিবেন না। অন্যান্য কথার জন্য ক্ষমা করিবেন। এ পত্র যদিও নোটিস্ নহে কিন্তু ইহাকে নোটিসের মত জরুরী মনে করিয়া পনেরো দিনের মধ্যে উত্তর দিবেন এই আমার প্রার্থনা। আপনাদের কুশল সমাচার জানাইবেন।

ইতি আপনার মধ্যম পুত্র চিরজীবি
বসন্তরাও (ব) দেসাঈ।

ছেলের চিঠি শুনে দুঃখের সীমা রইল না বেণুবাঈয়ের। স্বামী কত ব্যথা পেয়েছেন ভেবে দুচোখ জলে ভরে উঠল তাঁর।

"কত বুঝিয়েছি, কতবার বলেছি, এমন করতে নেই বাবা, খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিস নে। পিতা সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ। এত বলেও শেষে এই হল। পাথরকে জ্ঞান দিয়ে মানুষ করা যায়! ও আমাদের গত জন্মের শত্রু, এ জন্মে সন্তানের রূপ ধরে এসেছে, ও ছেলে অনেক দুঃখ দেবে তোমায়।"

"আরে আমার আর কি করবে? এর ফল তো ভুগবে নিজেই। এ চিঠি কে লিখিয়েছে তা কি আমি বুঝছি না? সেই গুরুটিকে আগে শায়েস্তা করতে হবে তাহলেই কিট্টীফিট্টি সব ঠিক পথে আসবে।

মনস্থির করে দেসাঈজী চিঠির জবাবে লিখলেন—

শ্রী

ক্ষেত্র ধারবাড়

চিরজীবি বসন্তরাওকে আশীর্বাদ।

তোমার পত্র পাইয়াছি। এখানে সব কুশল। তুমি আমার পুত্র একথা আমি ভুলিতে পারি না। শুভার্থীকে সঙ্গে লইয়া দেখা করিও।

ইতি আশীর্বাদ।

গোপাল রাও।

এ চিঠি পেয়ে ঘাবড়ে গেল বসন্ত, কারণ আসল কথার কোন উল্লেখই নেই এ চিঠিতে। সে নিজের চিঠিটা অপ্পন্না ভট্টকে দিয়ে লিখিয়ে তার নকল করে পাঠিয়েছিল। এত চটপট উত্তর আসবে সেটা আশা করে নি। আবার অপ্পন্না ভট্টকে ডাকতে হবে। এ পর্যন্ত যা করেছে নিজের বুদ্ধিতেই করেছে কিন্তু এবার রাঘপ্পার পরামর্শ দরকার। নিজের চিঠির একটি কপি এবং পিতার চিঠিখানি পকেটে নিয়ে সে হাজির হল রাঘপ্পার কাছে।

তার রোপণ করা বীজ এত তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে এটা রাঘপ্পাও কল্পনা করতে পারে নি। দেসাঈজীর সঙ্গে একেবারে খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করতে ও চায়নি, আড়াল থেকে শর নিক্ষেপ করাই ছিল ওর অভিপ্রায়। যা হোক মুখে কোন ভাব প্রকাশ না করে চিঠি দুটো পড়ে ফেলল রাঘপ্পা, তারপর অপ্পন্না ভট্টর মুন্সিয়ানার প্রশংসা করে বলল, 'ব্রাহ্মণ বেশ হুঁশিয়ার লোক, চিঠিটা লিখেছে খাসা'। দেসাঈজীর উত্তরটা মন দিয়ে পড়ে একটা সূক্ষ্ম বিষয় নজরে পড়ল রাঘপ্পার, যেটা বোঝা বসন্তর বুদ্ধিতে কুলোয় নি। বসন্ত চিঠিতে লিখেছিল 'শুভার্থীদের' সঙ্গে নিয়ে দেখা করবে কিন্তু দেসাঈজী সেই বহুবচন শব্দটিকে নিজের চিঠিতে একবচনে উল্লেখ করেছেন। মানে বুঝতে দেরী হল না রাঘপ্পার, কিন্তু দেসাঈজীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে সে মোটেই ইচ্ছুক নয়।

"ওহে বসন্ত, তোমার বাবার চিঠি দেখে তো মনে হচ্ছে না সহজে তিনি তোমার প্রস্তাবে রাজী হবেন।"

"কেন? যেতে লিখেছেন তো?"

"এত চট করে যেতে ডেকেছেন, তাই তো মনে হচ্ছে তোমার চিঠির কোন প্রভাবই পড়েনি তাঁর ওপর। এত সহজে মেনে নেবার পাত্র তিনি নন, আমি তাঁকে চিনি।"

"কিন্তু ডেকেছেন যখন, যেতে ক্ষতি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় যাবে, বেশ বুঝে সুঝে যেও।"

"আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে," বসন্তর একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে যে রাঘপ্পা এড়াতে চাইছে এই সাক্ষাৎকার।

"বাপ বেটার কথাবার্তার মধ্যে অন্য লোকের থাকাটা ঠিক নয়।"

এবার মুখ শুকিয়ে গেল বসন্তরাওয়ের। তাই দেখে ভরসা দিয়ে বলল রাঘপ্পা, বসন্ত, ভেবো না আমি তোমায় ত্যাগ করছি। তোমার পেছনে আমি সর্বদাই থাকব। নাটক কোম্পানী খোলার কথাটা যখন পাকা হয়ে গেছে তখন আমি তো বাক্যবদ্ধ তোমায় সাহায্য করতে। কিন্তু আমি সঙ্গে গেলে তোমার সুবিধা হবে না কিছু। আমি তো শেষ অস্ত্র। প্রথমে তোমার ছোটখাট হাতিয়ার যা আছে সেগুলো প্রয়োগ করে তো দেখ! এই চিঠির লেখক ভট্টকে সঙ্গে নিয়ে যাও। মনে হচ্ছে লোকটার বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। তোমার বাবার অভিপ্রায়টা কি সেটা বোঝো আগে। তিনি রেগে উঠলেও তুমি যেন পালটা রাগ দেখিও না। যদি তোমাকে বুঝিয়ে মত পরিবর্তন করাতে চেষ্টা

করেন তাহলে শক্ত হয়ে থাকবে। তোমার বাবা রীতিমত ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রথমে তোমাকে অনেক মিষ্টি কথায় লোভ দেখাবেন, ভয়ও দেখাতে পারেন, নানা ভাবেই চেষ্টা করবেন তিনি। নিজে দৃঢ় থেকে সে সব পরীক্ষায় আগে পাশ কর তারপর ডেকো আমাকে। দেখবে এমনভাবে ফয়সলা করে ফেলব আমি যাতে সবদিকে তোমার লাভ হবে। যত ভাল উকিলই আসুক না কেন তোমায় ঠকতে হবে না। কিন্তু প্রথমে জানা দরকার তোমার বাবার আসল উদ্দেশ্যটা কি ? একটু ছিটেফোঁটা আভাস অন্তত আমায় পেতে দাও তারপরে দেখ কি করি। কাজ শুরু হয়ে যাবার পর একটু আলাদা আলাদা থাকাই ভাল বুঝলে তো ?"

বসন্তরাও খুব যে একটা সাহস পেল তা নয় তবে কিছুটা উৎসাহ বোধ করল তাতে সন্দেহ নেই। রাঘপ্পার কথাগুলো যুক্তিযুক্ত বলেই বোধ হচ্ছে। কাজেরও বিভিন্ন পর্যায় আছে, আর সেই পর্যায় অনুসারেই উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু ভয় ওর কাটছে না কিছুতেই তাই আবার বলল, "অপ্পন্না ভট্ট চালাক চতুর বটে কিন্তু বেজায় ভীতু। ধমক খেলেই ঘাবড়ে যাবে। যদি না যেতে চায় আমার সঙ্গে ?"

"দশটা টাকা ফেলে দিও, ঠিক যাবে। নাটকের দলের লোক, পয়সা দেখলে দৌড়ে আসবে।"

বসন্ত ঠিক বুঝতে পারছিল না রাঘপ্পা এসব সত্যি সত্যি পরামর্শ হিসাবে বলছে না নিজেকে দূরে রাখার জন্য। শেষ পর্যন্ত সে কথা আদায় করে ছাড়ল যে অপ্পন্না ভট্ট যেতে রাজী না হলে তখন রাঘপ্পাই যাবে সঙ্গে। এরপর খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত না করে বেরিয়ে পড়ল অপ্পন্নার খোঁজে।

অপ্পন্না ভট্ট ছোট বয়সে বেদপাঠ শিখেছিল, এখন এইটাই তার জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কবিতাও লেখে সে। 'হে মানবমমতার ত্যাগ' গানখানি গ্রামে খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার লেখা আর একখানি ভজন হল—

'মহাযোগী যেমন ভাবে ত্যেজেন অহঙ্কার
তেমনি করেই ত্যেজেন সীতায় রাম অবতার'

এই গানটি গেয়েও গ্রামে সে প্রচুর বাহবা পেয়েছে। কিন্তু দেসাঈজীর সামনে যেতে হবে শুনেই তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বড় দেসাঈকে সে ভগবানের মতই ভয় ভক্তি করে। দশ টাকা দক্ষিণার লোভে সে 'স্বধর্মপি চাবেক্ষ্য বিকম্পিতুমর্হসি' বলে সাহস দিল নিজের মনকে। চার বছর আগে ঐ সাদা বাড়িতে নাটক শেখাতে গিয়ে ছেলের কাছে পেয়েছিল পনেরো টাকা আর শেখানো বন্ধ করে দেবার জন্য বাপের কাছে পেয়েছিল আরো পনেরো টাকা। সেই আট দিনে রোজগার হয়েছিল তিরিশ টাকা আর আধ বস্তা জোয়ার। খাওয়া দাওয়াও হত বেশ জবর রকমের সে কথাও মনে

পড়ল। এই সব লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত বসন্তের সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেল সে।

অবশেষে বসন্ত এবং তার শুভার্থী তো এসে পৌঁছলেন ধারবাড়ে। হোটেলে গিয়ে পেঁড়া, হালুয়া, সুজির লাড্ডু ইত্যাদি আহার করে ভট্ট মনে কিছুটা বল পেল। বসন্তরাওয়ের কাজে লাগবার অনুপ্রেরণা লাভ করল মনে মনে। রাঘপ্পার সঙ্গে দেখা হবার পর সাহসও বেড়েছে একটু। সেখান থেকেই একটা টাঙ্গা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মাঝরাস্তায় উডপী হোটেলের সামনে এসেই টাঙ্গা ছেড়ে দিল ভট্ট। নতুন বিয়ের বরের মত সেখানে তাকে মেওয়া দেওয়া দুধ খাওয়াতে হল। বসন্তও লেমনেড্ পান করল তার সঙ্গে তারপর ভট্টকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, "কাজটা যদি ঠিকঠাক সামলে দিতে পার ভট্ট তাহলে তোমায় ঘোড়ায় চড়িয়ে মিছিল বার করে দেব শহরের রাস্তায়।" আবার একটা টাঙ্গা নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছল ওরা যথাস্থানে।

বাইরের ফটক বন্ধ, চাকর বাকর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাবাকে ডাকবে কি করে ভেবে পেল না বসন্ত। দেসাঈজীর এটা বিশ্রামের সময়। সম্পত্তির অংশ চাইতে এসেছে বটে কিন্তু বাবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো একটা অসম সাহসিক কাজ। বসন্ত ফিসফিস করে কথা বলছে। খিড়কীর দরজা দিয়ে গিয়ে মাকে ডাকলে কেমন হয়? এ প্রস্তাবে অপ্পন্না ভট্ট সায় দিল না. বলল তাতে কাজ পণ্ড হবে। যেমন রোখ করে আসা হয়েছে সেই ভাবেই কিছু কথাবার্তা যদি হয়ে যায় তাহলে অন্তত ষোল আনার মধ্যে দু আনা মত কাজ হবার আশা আছে। কিন্তু এখন যদি মায়ের আঁচল ধর, বোনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাও বা ঠানদিদির আদর খেতে যাও তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। উপায়ান্তর না দেখে বসন্ত শেষ পর্যন্ত জোরে জোরে কড়া নাড়তে শুরু করল।

কড়ানাড়ার আওয়াজ কানে যেতেই ভরমা ছুটে এসেছে পাছে দেসাঈজীর ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। দেসাঈজী উঠে পড়েছেন এবং চোখ রগড়াতে রগড়াতে আঙিনায় নেমে এসেছেন। বসন্ত তখন ভয়ে প্রায় জবুথবু. তার পেছনে চন্দনচর্চিত, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরিহিত, বিগলিত বিনয়ের হাসি মাখানো মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপ্পন্না ভট্ট। ভিতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে না পেরে বসন্ত দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে কাঁপছে। দেসাঈজী ওদের ভেতরে না ডেকে নিজেই এলেন দরজার কাছে। বসন্তর দিকে এক নজর তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে জরীপ করতে শুরু করলেন অপ্পন্না ভট্টকে। আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে সে বলে উঠল, "রাওসাহেব আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি অপ্পন্না ভট্ট, পাহাড়ী ব্রাহ্মণ। এর আগে আপনার ছেলেকে নাটক শেখাতে সাদা বাড়িতে এসেছিলাম সেবার? আপনি আমায় ইনাম্ দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।"

দেসাঈজী নির্বিকার মুখে তার কথা শুনলেন তারপর ভরমার দিকে ফিরে বললেন, "এই, একে একমুঠো জোয়ার দিয়ে বিদায় কর।"

"না না রাওসাহেব, আমি ভিক্ষা চাইতে আসিনি।"

"বুঝেছি। আপনি বসন্তের হিতৈষী। বসন্ত, তোমার আসল হিতৈষীকে ডেকে নিয়ে এসো, এই বামুনটাকে এনেছ কেন ?"

দেসাঈজীর কথাবার্তা শুনে বসন্তর মনে হচ্ছে তার হাতে-পায়ে যেন কোন বল নেই। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোচ্ছে না। ব্যাপার দেখে ভট্ট ভাবল ঘোড়ায় চড়ে নিছিল না হয় নাই হল, অন্তত দশটা টাকা তো কামিয়ে নিই। সে আর একটু এগিয়ে বলে বসল, "রাও সাহেব, ছেলেকে সম্পত্তির অংশ দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন এখন এত ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন বলুন তো ? বাপ বেটায় মিলে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা কি আগে কখনও হয়নি। আপনাকে একটু শান্ত করার জন্যই বসন্ত এই গরীব ব্রাহ্মণকে সঙ্গে এনেছে। আপনি কিছু দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু এই গৃহবিবাদ এখনই সমাপ্ত হওয়া উচিত। আমাদের মত সামান্য আশ্রিত-জনেদের পক্ষে..."

সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভট্টর এই নাটকীয় ভাষণ শুনছিল। হঠাৎ দেসাঈজী ভরমার উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন, "কালা হয়ে গেছিস না কি ? বললাম না একমুঠো জোয়ার দিয়ে এই বামুনকে ফটকের বাইরে বার করে দিয়ে আয়।"

ঘাবড়ে গিয়ে ভরমা একছুটে অন্দর থেকে জোয়ার আনতে চলে গেল। এতক্ষণে কথা ফুটল বসন্তর মুখে, "অপ্পন্না ভট্টকে আমিই নিয়ে এসেছি।"

"এটা কি ধর্মশালা যে যাকে খুশি নিয়ে আসা যাবে ? আনতে হয় তো আসল হিতৈষী রাঘপ্পাকে নিয়ে এসো। ভাগ চাই না ? এই নাও তোমার ভাগ," রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছেলের গালে প্রচণ্ড এক চড় কষালেন দেসাঈজী। বসন্তর মনে হল যেন কোন দৈত্যদানবের হাতের চড় খেল সে, গালে হাত দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। ব্যাপার স্যাপার দেখে অপ্পন্না ভট্ট ততক্ষণে ফটকের দিকে হাঁটা দিয়েছে। গৌড়সাহেবের ভৃত্য ভরমা জীবনে এমন বকুনি খায় নি, সে ছুটে গিয়ে ভট্টর ধুতির কোঁচড়ে বেশ কিছুটা জোয়ার বেঁধে দিয়ে তাকে গেট পার করে দিয়ে এল।

হৈ হল্লা শুনে বেণুবাঈও বাইরে এসেছেন ততক্ষণে। সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা ছেলেকে ধরে তুলবার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু ছেলে উঠবে না কিছুতেই। তার বাঁ গালের ওপর চেপে রাখা হাত টেনে সরাতে দেখা গেল দেসাঈজীর হাতের প্রথম তিনটি আঙুলের ছাপ গালের ওপর স্পষ্ট ফুটে রয়েছে এমন কি অনামিকায় পরা অষ্টকোণ আংটির ছাপটাও বসে গেছে গালে। মাকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বসন্তরাও। ভরমার সাহায্যে বেণক্কা ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ভরমারই পরামর্শে তারপর তিলের তেল গরম করে মালিশ করলেন, জল গরম করলেন, কিন্তু মুখে তাঁর কথা নেই, শুধু দু চোখে জল ঝরছে অবিরল ধারায়। তাই দেখে বসন্তও এবার ফোঁপানি ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু বসন্তের মত উদ্ধত যুবক মার খেয়ে এমন কান্নাকাটি করছে কেন ? কারণ বোঝা কঠিন নয়। বড়লোকের আদরে লালিত

বিপথগামী ছেলের কোনরকম শারীরিক ক্লেশ সহ্য করার শক্তি বিন্দুমাত্রও থাকে না। শরীরের কষ্টকে তাদের বড় ভয়।

মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘণ্টা দুই তিন সেবাশুশ্রূষা ভোগ করে ভয় একটু কমল বসন্তের। কাঁপুনি বন্ধ হল। গালে অবশ্য এখনও ব্যথা আছে। থাপ্পড়ের চোটে ওর কানে তালা লেগে গেছে। মানসিক আঘাতটা অবশ্য কিছু হাল্কা হয়ে এসেছে। এ দিকে ভরমা তৎক্ষণে দোতলায় বসন্তর ঘর গোছগাছ করে দিয়েছে। নিজের ঘরে যাবার আগে বসন্ত মায়ের কথামত দেসাঈজীর ঘরে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে ক্ষমা চেয়ে ভুল স্বীকার করেছে। দেসাঈজী শুধু বলেছেন, "তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই। যদি ভুল করেছ বুঝে থাক তাহলে নিজের আচরণ সংশোধন করে তা তোমায় প্রমাণ করতে হবে।"

আর কোন আলোচনা হল না এ নিয়ে। এত কাণ্ডের পরও বাবা যে তাকে ছেলে বলে ঘরে স্থান দিয়েছেন এতেই বসন্ত খুশী। রাঘপ্পার নামও আর মুখে আনেন নি তিনি। বসন্তও গ্রামে ফিরে যাবার কথা তুলছে না। আগের মত সুখের দিন যেন ফিরে এসেছে আবার। কিন্তু সুখের জন্য মূল্য দিতে হয় এ কথাটা ভুলতে বসন্তের বিশেষ সময় লাগবে না। তার শৈশব যেন এখনও কাটেনি, আগামী পঞ্চাশ বছরেও যে কাটবে এমন ভরসা কম। যা হোক মার খেয়ে রাঘপ্পার বাড়ি যাওয়াটা বন্ধ হয়েছে তার।

30. রাঘপ্পার জয়

কোঁচড়ে একমুঠো জোয়ার নিয়ে বাইরে এসে অপ্পন্না ভট্ট নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল এই জন্য যে দেসাঈজীর বাড়ি থেকে সে জ্যান্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু এখন কি করা যায়? বসন্তই ওকে ধারবাড়ে নিয়ে এসেছিল। ওর নিজের কাছে একটা আধলাও নেই। বসন্ত ওকে মাঝপথে এমনভাবে ত্যাগ করবে কে জানত? এদিকে রাঘপ্পার বাড়ির ঠিকানাটাও ঠিক করে মনে রাখেনি। রাঘপ্পার পদবীটাও সঠিক জানে না ও, শুধু এইটুকু মনে আছে যে তার বাড়ির সামনে একটা ডুমুর গাছ ছিল। ভাগ্যক্রমে যে টাঙ্গায় করে দেসাঈজীর বাড়ি গিয়েছিল ওরা সেই টাঙ্গাটা হঠাৎ দেখা গেল রাস্তায়। অপ্পন্না নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে একেবারে মাঝরাস্তায় টাঙ্গার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে টাঙ্গা থামাল। টাঙ্গাওয়ালার কাছে রাঘপ্পার বাড়ির হদিশ বুঝে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অবশেষে পাওয়া গেল সেই ডুমুর গাছ এবং রাঘপ্পার বাড়ি। সেখানে গিয়ে যাহোক দুটো মুখে দিয়ে দেসাঈজীর বাড়ির ঘটনা আদ্যোপান্ত রাঘপ্পাকে শোনাল ভট্ট। তারপর বাসভাড়া ইত্যাদির জন্য ছ'আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে গ্রামের পথ ধরল সে।

রাঘপ্পা দিন পনেরো ধরে প্রতীক্ষা করছে কিন্তু বসন্তের কোন পাত্তাই নেই। গ্রাম থেকে যারা হাটেবাজারে আসে তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল বসন্ত সাদা বাড়িতে ফিরে যায় নি। কোথায় যেতে পারে সে ? ভাবতে লাগল রাঘপ্পা, ধারবাড়ে বাপের কাছেই হয়ত রয়েছে তাই ভয়ে বা লজ্জায় আমার সামনে আসতে পারছে না। নাটক তো গোল্লায় গেল, কিন্তু এখন এভাবে রশি ঢিলে করলেই বসন্ত আবার বাপের বাধ্যবশ হয়ে পড়বে। আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের আশাও তাহলে সুদূরপরাহত। পথে ঘাটে তো ভুলেও কখনও দেখতে পাই না ! বাপের ক্ষমতা আছে মানতেই হবে।

যত দিন যাচ্ছে রাঘপ্পা ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে উঠছে। বসন্ত যদি বাইরে না আসে তাহলে দেসাঈয়ের বাড়িতে গিয়ে চড়াও হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন করে হোক তার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। তারপর কি কর্তব্য সেটা তখনই বোঝা যাবে। দেসাঈজীর বাড়ি যাবার জন্য ও যখন অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছে তখনই চমৎকার একটা সুযোগ আপনা থেকেই হাতের কাছে এসে গেল।

চম্পক্কা একদিন খাবার পর সবকিছু বমি করে ফেলল। তাড়াতাড়ি ছুটে এল রাঘপ্পা, প্রশ্ন করল, 'কতদিন ধরে বমি হচ্ছে ?' জলভরা চোখে চম্পক্কা বলল, 'তিন মাস ধরে।' সেই দিনই দুপুরে টাঙ্গা করে রাঘপ্পা ওকে নিয়ে গেল সদর হাসপাতালে। লেডী ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন চম্পক্কা তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা।

মনে মনে বলে উঠল রাঘপ্পা, 'রাঘোবা ভরারী কি জয়'। এমন একটা খবর দেসাঈজীর কানে না পৌঁছে দিতে পারলে রাঘপ্পার শান্তি কোথায় ? পরের দিনই সে গিয়ে হাজির দেসাঈজীর বাড়ি।

দেসাঈজী প্রথমটায় ভেবেই পেলেন না রাঘপ্পা কেন এসেছে। যদি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবেন এটা মনে মনে স্থির করাই আছে। যা হোক উপস্থিত তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের নরম গদীর ওপর বসালেন। পান, তামাক দিয়ে আপ্যায়ন হল। এবার তিনি রাঘপ্পার বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত। রাঘপ্পা আলগাভাবে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে দেসাঈজীর দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় কানে কানে কথা বলার মত ভঙ্গিতে শুরু করল, "রাওসাহেব আপনাদের মত গুরুজনদের কৃপায় সবই তো কুশল কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন। মানুষের মুখের কথাতেই তো তার দাম, তাই আপনার কাছে যদি আমায় মিথ্যাবাদী হতে হয় এই চিন্তায় রাত্রে ঘুমোতে পারছি না আমি। একবার কথা দিয়ে কথার খেলাপ করা উচিত নয়, সেটা অধর্ম হয়। কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং যদি দেওয়া কথা-কে মিথ্যা করে দিতে চান তাহলে মানুষ কি করবে। একেই বলে আসল ধর্ম-সঙ্কট। আমি সর্বদা প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর আমায় মিথ্যাবাদী কোর না। কিন্তু ঈশ্বরও যেন কোমর বেঁধে লেগেছেন।"

দেসাঈজী মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে ওর কথা শুনছিলেন। তাঁর হাসি দেখে রাঘপ্পার দেহে যেন ছ্যাঁকা লাগছিল। মনে মনে সে ভাবছিল, 'ওহে দেসাঈ, এখন

তোমার হাসি পাচ্ছে আমার কথায়'। যাক, ভূমিকা শেষ করে ঢোঁক গিলে এবার আসল কথায় এল রাঘপ্পা, "ভগবানের কি লীলা দেখুন দেসাঈজী। স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি এই বয়সে আবার আমার সন্তান লাভের যোগ আছে। খুব বড় জ্যোতিষীও এ কথা বললে আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু তাই এখন সত্যি হতে বসেছে।"

দেসাঈজীর হাসি এবার থেমেছে দেখে রাঘপ্পা মনে মনে বলল 'এইবার পথে এসেছ দেসাঈ'। দেসাঈজী মুখে কিন্তু কিছুই বলছেন না। রাঘপ্পা এক টুকরো কাগজ বার করে বলল, 'এই দেখুন, লেডী ডাক্তারকে দেখিয়ে এসেছি'। কিন্তু এখনও দেসাঈজীর তরফে বিশেষ কিছু ঔৎসুক্য দেখা গেল না।

"দেসাঈজী আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কিন্তু আমি সমস্তক্ষণ এই প্রার্থনাই করছি যে ঈশ্বর যেন পুত্র না দেন আমাকে। আপনি প্রশ্ন করবেন, কেন? কিন্তু কিট্টী কি আমার পর? একদিকে সে ভাগ্নে তার ওপর জামাই। যেদিন থেকে ও ছেলেটাকে দেখেছি সেদিন থেকেই ওকে আমার নিজের ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আমার যা কিছু আছে, সে সামান্যই হোক বা রাজসম্পদই হোক তাতে কিছু যায় আসে না, সেইটুকুই ওর হাতে তুলে দিয়ে আমি চোখ বুজতে চাই। এই মনস্কামনা নিয়েই সরল সোজা পথে চলেছিলাম। ভগবানের অপার করুণা তিনি কখনও আমার এই সোজা পথে বাধা এনে ফেলবেন না আশা করি। সত্যি দেসাঈজী দেখুন ভগবান যে কাকে নিয়ে কখন কি খেলা খেলবেন কিছুই আগে থেকে বলা যায় না। এত কথা বলছি এইজন্য যে ভবিষ্যতে লোকে হয়ত আমায় মিথ্যাবাদী বলবে কিন্তু আপনার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি অন্তত আসল অবস্থাটা বুঝবেন এইটুকুই আমার আশা।"

দেসাঈজী আবার মুচকি হেসেই বললেন, "আপনার পুত্রসন্তান হলে আমি তো মিঠাই বিতরণ করব রাঘপ্পাজী। এ সব দত্তকের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিন আপনি। যদি আপনার সম্পত্তি কৃষ্ণের ভাগ্যে থাকে তাহলে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না আর যদি তার ভাগ্যে না থাকে তাহলে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তাকে ও সম্পত্তি দেওয়াতে পারবে না। আপনি বুদ্ধিমান লোক, কাজেই 'আমার ছেলে চাই না, আমি দত্তকই নেব' এই সব বললেই কি ভগবানকে অস্বীকার করা হবে না? প্রচলিত রীতি অনুসারে আপনি বরং এই প্রার্থনাই করুন যেন ঈশ্বর একটি পুত্রসন্তান দিয়ে আপনার বংশরক্ষা করেন। ভগবানের কি ইচ্ছা কেউ বলতে পারে না।" মনে মনে রাঘপ্পাকে স্বীকার করতেই হল দেসাঈ বড় হুঁশিয়ার ব্যক্তি। মুখে অবশ্য সে নিজের পাঁচালি গেয়েই চলল, "রাও সাহেব ছেলে হবে কি মেয়ে হবে তা তো কেউই বলতে পারে না। এটা তো আপনি ঠিকই বলছেন যে দুনিয়ার রীতি অনুসারে আমার পুত্রসন্তানই প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাতেও কোন সুখ নেই। আমার স্ত্রী এত দুর্বল যে সে নিজেই বাঁচবে কিনা তাই আমার চিন্তা এখন।"

"আরে কিছু হবে না, ভয়টয় ছেড়ে ভগবানে বিশ্বাস রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাঘপ্পার মনে হতে লাগল দেসাঈজী সব কথায় ওর সঙ্গে সায় দিয়েই ক্রমশ ওর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছেন। দেসাঈজীকে কিছুতেই চটাতে না পেরে রাঘপ্পা মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে গেল। ওর মনে হতে লাগল আগের মত শক্তি থাকলে ও ঠিক কোন না কোন উপায়ে দেসাঈজীকে রাগিয়ে দিতে সক্ষম হত। যা যা ভেবে রেখেছিল সে উপায়গুলির কোনটাই কাজে লাগল না দেখা যাচ্ছে। বিনা প্রতিভায় কবিতা লেখার চেষ্টা করে কবিযশপ্রার্থী যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে রাঘপ্পারও সেই রকম ক্লান্ত বোধ হতে লাগল। আর এক গ্লাস জলপান করে সে যখন বিদায় নিতে উদ্যত সেই সময় জানলা দিয়ে নজরে পড়ল বসন্তরাও গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছে। বসন্তের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেই যে সামাজিক সৌজন্য অনুসারে দেসাঈজী তাকে ডেকে পুত্র বলে পরিচয় করিয়ে দেবেন এতটা আশা করা যায় না। তাছাড়া এই ছোটলোক দেসাঈ হয়ত ওর সমস্ত বাকচাতুরীর ওপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে এমন আশঙ্কাও আছে। কাজেই সে সব ঝুঁকি না নিয়ে রাঘপ্পা সোজাসুজি 'বসন্তরাও, ও বসন্তরাও' বলে ঘরের মধ্যে থেকেই ডাক দিল। কে ডাকছে ঠিক বুঝতে না পেরে বসন্ত গাছ থেকে নামতে শুরু করল। রাঘপ্পা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে ভাবছে দেসাঈ এবার জিজ্ঞাসা করবে, 'আমার ছেলেকে চেনেন না কি? কোথায় আলাপ হলো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলেই বসন্তর রাজা সাজার বাসনা, নাটকের সাজসরঞ্জাম কেনার পরিকল্পনা, সুন্দর-মানির বাড়ির বৈঠক ইত্যাদি খবরগুলো বেশ মুখরোচক করে পরিবেশন করার সুযোগ পাওয়া যায়। দেসাঈজীর উঁচু মাথা নিচু করে দেওয়া যায় চমৎকার ভাবে। কিন্তু দেসাঈজী সে ধার দিয়েই গেলেন না, তিনি বেশ চুপচাপ নির্লিপ্ত মুখে বসে রইলেন যেন কিছুই হয়নি।

ঘরে ঢুকেই রাঘপ্পাকে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল বসন্তর। তাকে কথা বলার অবকাশ না দিয়েই রাঘপ্পা হৈ হৈ করে আরম্ভ করে দিল বক্তৃতা, "কি হে বসন্তরাও, আমাকে কি ভুলেই গেলে নাকি একেবারে? সেই যে গাঁয়ের পশুমেলায় একজোড়া বলদ দেখালে, বললে ধারবাড়ে এসে দেখা করবে তারপর আর পাত্তাই নেই? এই তো লেন বাজারে বাড়ি আমার, একদিন আসতেই হবে, কথা দিয়েছিলে মনে আছে তো? বাবা যেতে বারণ করেন বুঝি? আমি ওঁকে বলে যাচ্ছি, ছেলেকে একদিন আমার বাড়ি পায়ের ধূলো দিতে পাঠাবেন দেসাঈজী। এই তো কালকেই আসতে পার, নিশ্চয় চলে এস।" দেসাঈজীর দিকে তাকিয়ে এবার বেশ একগাল হেসে বিদায় নিল রাঘপ্পা। দেসাঈ চুপ করেই রইলেন। সে চলে যাবার পরও বসন্তকে তিনি কিছুই বললেন না।

জোর কদমে বাড়ির পথে চলতে চলতে রাঘপ্পার কিন্তু এখন লজ্জাবোধ হতে লাগল, মনে হল বড় বেশী বাচালতা প্রকাশ করা হয়ে গেছে। ছিঃ, আমি রাঘোবা ভরারী, আমার মুখে এমন ওঁচা মিথ্যে কথা বেরোল কি করে? একঝুড়ি মিথ্যা বলার তো কোন প্রয়োজন ছিল না, স্রেফ বাড়িতে একদিন আসতে বললেই হত। শুধু শুধু কতকগুলো বাজে কথা বলা হয়েছে।

প্রতি পদক্ষেপেই আজকাল রাঘপ্পা অনুভব করে সে কত বদলে গেছে। দেসাঈজীর মত পাকালোকের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে অন্য ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। এমন হাস্কাদরের মিথ্যা বলে নিজেকে খেলো করে ফেলেছে বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল রাঘপ্পা, বেশ সোচ্চারেই আক্ষেপ প্রকাশ করে ফেলল সে।

31. ঔষধী

পরের দিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক কপট নিদ্রায় কাটিয়ে নিজের ঘরে ইস্ত্রীকরা কাপড় জামা পরে তৈরী হয়ে নিল বসন্তরাও। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন আন্দাজ করে বেলা তিনটে নাগাদ সেজেগুজে চুপিচুপি নিচে নামল উঠানের দরজা খুলে টুক করে বেরিয়ে পড়বে ভেবে, কিন্তু পড়ে গেল একেবারে বাবার সামনে। বাবার হাতের চড়টা এখনও খুব ভাল করেই মনে আছে, বাবার প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে তার, তাই ভয়ে সে থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। দেসাঈজী সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, "রাঘপ্পার বাড়ি যাচ্ছ তো ?" ভয়ের চোটে ছেলের মুখ দিয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বার হল না, কিছু বানিয়ে বলতেও সাহসে কুলোল না। আর অপেক্ষা না করে দেসাঈজী বললেন, "যদি ওখানেই যাও তো এই চিঠিটা রাঘপ্পাকে দিয়ে দিও। তোমার যদি অন্য কোথাও যাবার থাকে তাহলে ভরমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বাবার কাজে লাগবার এমন চমৎকার সুযোগ পেয়ে বসন্ত ভালমানুষের মত জবাব দিল, "ঐ পথ দিয়েই যাব, ফেরার সময় দিয়ে আসব এখন।"

আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে দেসাঈজী একখানা ভাঁজকরা কাগজ ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন, কাগজখানা খামে ভরা পর্যন্ত নয়, বললেন, "বাবা পাঠিয়েছেন বলে দিও।" বসন্তর মনে হল যেন অবাধে রাঘপ্পার বাড়ি যাবার সরকারী ফরমান এসে গেছে ওর হাতে। ওর সম্বন্ধে চিঠিতে কিছু লেখা হয়েছে কিনা দেখবার জন্য পথে একটা গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে চিঠিখানা পড়ল ও। চিঠিতে বসন্তের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ মাত্রও নেই।

বেঙ্কটরায়ের যে দানপত্রখানি অচ্যুত বম্বে থেকে টুকে পাঠিয়েছে চিঠিখানি তারই প্রতিলিপি। দেসাঈ আজ সকালেই সেটি লিখে প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছিলেন কখন বসন্ত যাবে। বসন্তর হাতে দিয়েই ওটা রাঘপ্পার হাতে পাঠানো তাঁর অভিপ্রায়। তাই বসন্ত যখন মুখ ধুতে এসেছিল তখন থেকেই তিনি জেগে বসে আছেন। সে চোরের মত চুপিচুপি কেটে পড়ার উপক্রম করতেই হাতে নাতে ধরে ফেলে চিঠিখানা গছিয়ে দিয়েছেন। একটা ফাঁকা আওয়াজ করে রাঘপ্পাকে একটু চমকে দেওয়াই ওর উদ্দেশ্য।

বসন্তরাও উৎসুক চিত্তে রাঘপ্পার কাছে পৌঁছল। একমুখ হেসে রাঘপ্পা অভ্যর্থনা জানাল তাকে। তক্ষুণি ভাল করে কাজুবাদামের উপিট্টু তৈরী করার ফরমাস চলে গেল রান্নাঘরে। ভাল আসনে বসন্তকে বসিয়ে রাঘপ্পা শুরু করল হাল্কা হাসি তামাশার

কথা—"এইজন্যই তো বলে বাপ বেটার সম্পর্ক। তোমার সম্পত্তির অংশ দেওয়াতে গিয়ে মাঝ থেকে আমিই বদনামের ভাগী হলাম। তোমরা তো বাপ বেটায় মিলে গেলে আর মাখনের মধ্যের চুলের মত আমাকে বাইরে দূর করে ফেলে দেওয়া হল। নানারকম কথা হল। বসন্তর চড় খাওয়ার কথাটা ছাড়া আর সব কথাই রাঘপ্পা আলোচনা করল। শেষে উঠল নাটকের কথা। নাটকের ব্যবসায়ে কোন কোম্পানী কত লাভ করেছে, কারা কারা ফেল মেরেছে হাল্কা সুরে এই সব চর্চা করতে করতে এক সময়ে বলে উঠল, "এদিকে তোমার কোম্পানী তো জন্মাবার আগেই পটল তুলল, তাই না ?"

মর্মাহত হয়ে বসন্ত জবাব দিল, "রাঘপ্পাজী যাই হোক না কেন একদিন না একদিন কোম্পানী আমি খুলবই।"

"খুব ভাল কথা ভাই, নিশ্চয় খুলবে। তবে তোমার কোম্পানী চালু হতে হতে আমাদের মত বুড়ো হাবড়ারা হয়ত সংসারের মায়া কাটাব। যাক গে, কি আর হবে, আবার অন্য গুরু জুটে যাবে তোমার। গুরুর কি আর অভাব আছে ?"

"আপনাকে আর কি বলব রাঘপ্পাজী। সেদিন যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, সে তো আপনারই জন্য। এখন আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন কিন্তু সেদিন অপ্পন্নার বদলে যদি আপনি যেতেন আমার সঙ্গে...?"

"কি আর হত, আমার ভাগ্যেও একমুঠো জোয়ার জুটত।"

"আমার বাবা আপনাকে খুব খাতির করেন। কাল আপনাকে ওঁর নিজের নরম গদীতে বসিয়েছিলেন, ওই গদীতে উনি কাউকে বসতে দেন না, খুব সম্মানিত বা একেবারে আপনার লোক হলে তবেই ওখানে বসতে দেওয়া হয়।"

"তোমার বাবা সব কথাই হয়ত শুনবেন কিন্তু সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না তাছাড়া আর একটা কথা, সত্যিকারের অভাব না থাকলে চাওয়ার মধ্যেও জোর থাকে না বুঝলে বসন্তরাও! তোমার এখন বয়স কম কথাটা হয়ত ভাল লাগছে না কিন্তু পরে বুঝবে। যখন একটি দুটি ছেলেপিলে হবে তখন বুঝতে পারবে বাপের ছত্রছায়ায় থাকার কত আরাম। তখনই তুমি সত্যিকারের জোর দিয়ে সম্পত্তির ভাগ চাইতে পারবে, আর প্রয়োজনটা যখন খাঁটি হয় তখনই চাইলে পাবার আশাও থাকে। খামোকা একটা নাটক কোম্পানী খোলার জন্য উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে সম্পত্তির অংশ চাইতে গেলে কি আর পাওয়া যায় ?

বসন্তরাও নিজের মনের মধ্যে নজর ফেলে খুঁজে দেখতে লাগল সম্পত্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা তার কতখানি তীব্র। রাঘপ্পার কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে, তাছাড়া বাপের হাতের চড়খানাও মনে আছে খুব ভাল করেই। তাই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় আর রুচি হল না, এধার ওধার অন্য নানারকম গল্পগুজব চলল। উপিট্টু আর চা খেয়ে বিদায় নিতে প্রস্তুত হল বসন্ত। এতক্ষণে মনে পড়েছে চিঠিখানার কথা। চিঠি বের করে রাঘপ্পার হাতে দিয়ে বলল, "বাবা দিয়েছেন।"

"তোমার বাবা আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ? কি ব্যাপার বল তো ভাই ?" বলতে

বলতে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করেই চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে রাঘপ্পার। খুব মন দিয়ে সবটা পড়ে রাঘপ্পার এই প্রথম মনে হল দেসাঈকে তাহলে আর জব্দ করা গেল না। অন্যমনস্ক ভাবে বসন্তকে বিদায় দিল সে।

বসন্ত রাঘপ্পার বাড়ি বহুবার এসেছে, যখনই আসে এখানে খাওয়া দাওয়াটা ভালই হয়। কিন্তু আজকাল কি যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে, রাঘপ্পার কথাবার্তা দিন দিনই কি রকম যেন নীরস হয়ে উঠছে। নাটকের প্রসঙ্গ তো আর তোলেই না। সম্পত্তি ভাগের কথা তুললেও কেমন এড়িয়ে যেতে চায়। রাঘপ্পার এই অদ্ভুত ব্যবহারের মানে খুঁজে পায় না বসন্ত। তবে কি আজকাল বসন্তকে সে অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছে? কিন্তু খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যাপারে তো কোন অনাদরের লক্ষণ নেই, শুধু কথাবার্তায় একটা উদাসীন ভাব, আগের সে হাসি রসিকতার চিহ্নও নেই। এমনটা কেন হল? শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে বসন্ত স্থির করল রাঘপ্পা নিশ্চয় বসন্তর বাবাকে ভয় করতে শুরু করেছে।

এই ধারণার ফলে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে উঠল তার। রাঘপ্পাই যখন উদাসীন তখন সম্পত্তির বাঁটোয়ারার মত অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ নিয়ে বসন্তর আর উৎসাহ নেই, বাড়িতে মায়ের কাছেও সে এসব কথা আর তোলে না। আবার গ্রামে ফিরে যাবার কথাও বলেনি এখনও। সিনেমা দেখার জন্য মায়ের কাছে যেটুকু পাওয়া যায় তাই হাত পেতে নেয় তারপর অল্পদামের টিকিটে একটার জায়গায় দুটো ছবি দেখে। গ্রামে গিয়ে তামাকের নেশাটা ভালই হয়েছে ফলে চায়ের খরচ কমেছে কিছুটা। একা চায়ের দোকানে কমই যায়, বাড়িতে, রাঘপ্পার কাছে বা কোন বন্ধুর বাড়িতেই বেশীর ভাগ চা খাওয়া হয়।

বেণক্কার কাছে বলে রেখেছিলেন দেসাঈজী, "সম্পত্তির ভাগ বা গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা যদি তোলে তাহলে আমাকে জানাবে, কিন্তু খুব সম্ভব বসন্ত আর ওসব কথা বলবে না। যদি বলে, আমি ওকে মারপিট করব না শুধু লক্ষ্য রাখা দরকার ওর কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। ওকে রাঘপ্পার বাড়ি যেতে বারণ করাটা ঠিক হবে না। বারণ করলে ও লুকিয়ে যাবে। এত বড় ছেলেকে তো সমস্তক্ষণ চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়, তবে সেখানে গেলেও যাতে ওর ওপর তার কোন প্রভাব না পড়ে সেরকম ব্যবস্থা করেছি। বসন্তর পেটের ব্যারামে রাঘপ্পাকেই হজমীগুলির মত ব্যবহার করা হয়েছে, ফলটা কেমন হয় দেখা যাক। রাঘপ্পার বাড়ি যেতে চাইলে আটকাবার দরকার নেই তবে আগের মত উপদ্রব করে যদি তাহলে আমাকে জানাবে।"

দিন পনেরো কেটে যাবার পরও বসন্তর তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ওঁর মনে হল ওষুধের ফল ফলতে শুরু হয়েছে।

ওষুধ কার্যকরী হয়েছে সেটা ঠিকই কিন্তু আবার অন্যদিকে অন্য পীড়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

বসন্তকে হাত করে ছোটখাট লাভ করার চিন্তা রাঘপ্পা আর করে না কারণ তা আর সম্ভবও নয়। বসন্ত এখন শহরেই বাস করছে কাজেই ফসল বেচবে কে? কাজেই

এখন রাঘপ্পা বসন্তকে সম্পূর্ণভাবে বশীকরণ করে ফেলার ব্যবস্থায় মন দিয়েছে। চা জলখাবার আগের মত চলছে, দু একবার বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায়ও যাওয়া হয়েছে। চা পরিবেশনের ভার সম্পূর্ণভাবে শান্তার ওপর। রাঘপ্পা চা খেতে খেতে মেয়ের চা তৈরী করার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

একদিন তাক বুঝে রাঘপ্পা প্রথম শরক্ষেপ করল, "শান্তাটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। ওর বিয়ের যে কি করি ভেবে পাচ্ছি না। সেদিন একটি ছেলেকে দেখানো হল। ছেলের তো শান্তাকে খুবই পছন্দ, আমারও ছেলেটিকে ভালই লেগেছিল কিন্তু কাণ্ড দেখ, শান্তারই ছেলেকে পছন্দ হয়নি। আমার বড় মেয়ে রত্না কোনদিন একটি কথাও বলেনি। আমরা যেমন বর পছন্দ করেছি সে মুখটি বুজে তাকেই বিয়ে করেছে। রত্নাকে আমি একথাও জানিয়েছিলাম যে তার শাশুড়ী বেশ দজ্জাল, তাকে কষ্ট দিতে পারে, সে কষ্ট তাকে সহ্য করতে হবে। তবে ছেলেটিকে আমাদের খুব পছন্দ, এখন তার নিজের কি মত? মেয়ে কি জবাব দিল শুনবে? বলল "আমার বিয়ে দেবার কর্তা তো আপনি, আমার এ বিষয়ে কিছুই ভাববার নেই।" সেও আমারই মেয়ে। দুই মেয়ের মধ্যে বয়সের তফাত খুব জোর পাঁচ ছ' বছর। কিন্তু শান্তা এ যুগের স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। সে বলে, 'সরকারী চাকরে বিয়ে করব না, খদ্দরধারী পাত্র চাই'। সেই ছেলেটি ছিল সরকারী চাকুরে, কিন্তু মেয়ে তো একেবারে বেঁকে বসল। অবশ্য ওকেও দোষ দেওয়া যায় না। রত্নাও যেমন উচিত কথা বলেছিল শান্তাও তেমনি আর একদিক থেকে দেখলে উচিত কথাই বলছে। যুগের হাওয়ায় চিন্তাধারাই বদলে যায়। এ যুগে জন্মে দেশপ্রেমের ভাবনাকে উপেক্ষা করা তো চলে না। এ বিষয়ে তোমার কি মত বসন্ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথাই।" মনে মনে ভাবছিল বসন্ত, কালই একটা গান্ধী টুপী কিনে ফেলতে হবে।

রাঘপ্পা আবার শুরু করল, "তোমার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে তাই তোমাকে বলা। ভাল বংশ, ঘরে কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, এদিকে দেশভক্ত এমন ছেলে যদি নজরে থাকে তো আমাকে জানিও। আমিও একটি দেখেছি, পাত্র হিসাবে খুবই ভাল, বিরাট বড়লোক, চার জোড়া হাল আছে চাষের জন্য তাছাড়া একটা গহনার দোকান। তবে বরদক্ষিণা প্রচুর লাগবে, তা তাতে আমি ভয় খাই না। যত লম্বা চওড়া দাবী-ওয়ালা বর হোক না কেন শান্তাকে দেখলে দাবীর বহর আপনিই নেমে আসবে। যা করে হোক এর বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। তাই বলছি, চেনা-শোনার মধ্যে ভাল ছেলে থাকলে বলো। আমার শিষ্য হয়েছ যখন এটুকু উপকার নিশ্চয় তোমার কাছে আশা করতে পারি?" এরপর বেশ দরাজ গলায় হেসে উঠে রাঘপ্পা বলল, "ভগবান তোমারও মঙ্গল করবেন। দেখবে তোমারও বিয়ে চটপট স্থির হয়ে যাবে।"

এক সপ্তাহের মধ্যেই বসন্তরাওয়ের অঙ্গে দেখা গেল নেহরু শার্ট আর গান্ধী টুপী। তাই দেখে বেণুবাঈ ভাবলেন বসন্তও বুঝি বড় ভাই অচ্যুতের পথ ধরেছে। আর রাঘপ্পা উৎফুল্ল হয়ে ভাবতে লাগল, 'দেসাঈ, তুমি এখনও আমার নাগালের বাইরে নও, তোমাকে একেবারে পিষে ফেলব আমি।'

32. গজেন্দ্র মোক্ষ

শালগ্রাম শিলার পূজা আরম্ভ হবার পর বাড়িতে কিছুদিন শান্তি বিরাজ করেছিল, কিন্তু বেশীদিন নয়। অল্পদিনের মধ্যেই আবার নিত্য কলহ শুরু হয়ে যায়। গঙ্গব্বা বেণক্কার কাছেও বহুদিন কিছু খুলে বলে নি, চুপচাপ সব সহ্য করে গেছে এই ভেবে যে এমন তো ঘরে ঘরেই হয়। কত আর সহানুভূতি দেখাবে বেণক্কা ? তাছাড়া, রোজই দুঃখের পাঁচালি নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করলে লোকে শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। হয়ত বেণক্কাও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়বে। কাজেই চুপচাপ থাকাই ভাল। তাছাড়া আর একটা কথাও ভাবে গঙ্গব্বা, সেটা হচ্ছে, দেসাঈজীর মধ্যস্থতাতেই এ বিয়ে হয়েছিল, এখন রোজ রোজ বউয়ের নামে নালিশ করতে গেলে তিনি হয়ত ভাবতে পারেন গঙ্গব্বা তাঁর ওপরই দোষারোপ করছে। দেসাঈজীর মনে কোনভাবেই আঘাত দেওয়া চলবে না এ বিষয়ে গঙ্গব্বা সর্বদা সচেতন।

সব সংসারেই সেই একই মাটিতে উনুন গড়ে এ জ্ঞানটা ছিল বেণুবাঈয়ের তাই গঙ্গব্বার সাংসারিক ব্যাপারে তিনি বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করতেন না। মাঝে মাঝে শুধু খবর নিতেন, 'গঙ্গব্বা বাড়ির সব ভাল তো ?' গঙ্গব্বাও সেই ভাবেই উত্তর দিত, 'হ্যাঁ, ঐ একরকম। কাল আবার কিট্টীর একটু কাশি হয়েছিল। বাড়ির সব কিছু তুচ্ছ খুঁটি-নাটি লোকের কাছে বলে বেড়ানো কতটা হাস্যকর তা বেণক্কাও বোঝেন। গঙ্গব্বা যখন নিজের সুখ দুঃখের কথা বলে বেণক্কা তখন নিজের সংসারের অবস্থাও ভাবেন। জীবনে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে তাঁর। বিদেশে কোথায় উপবাস আর কারাবাসের সঙ্গে যুঝে দিন কাটাচ্ছে বড় ছেলে অচ্যুত আর এখানে মেজ ছেলে ফুলবাবু বসন্তর দিন কাটছে সিনেমা আর তাসের নেশায়। যতই ভাবেন ততই বেণক্কার মনে হয় ধনীর ঘরেও দুঃখ কিছু কম নয় আর ধনীদের কপালে যতরকম দুঃখ ঘটতে পারে সবই সইতে হচ্ছে তাঁকে। এইভাবে ওঁদের দুজনের মধ্যে যেন একটা মৌন বোঝাপড়া হয়ে গেছে, কেউ ওঁরা নিজের দুঃখ নিয়ে অন্যকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন না।

কিন্তু গঙ্গব্বার বাড়ির অবস্থা দিন দিন তার সহ্যশক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে। কিট্টী দেসাঈজীর কাছে বরদক্ষিণার টাকা চাইতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফেরার পর, শালগ্রামের কৃপায় পাওয়া ক্ষণস্থায়ী শান্তি আর টিঁকল না। দেসাঈজী কতখানি দৃঢ়ভাবে গঙ্গব্বার পক্ষ সমর্থন করেছেন সে কথা বেণক্কার কাছে শুনে গঙ্গব্বার ভাল লেগেছিল। কিন্তু

সে বোঝে নি যে দেসাঈবাড়ির অপমানের ঝাল কিট্টী এসে ঝাড়বে মায়ের ওপরেই। রাঘপ্পা এবং কিট্টীর জন্য দেসাঈজীকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার সম্বন্ধে সব কথা দেসাঈ নিজের স্ত্রীকেও বলেন নি। বসন্ত রাঘপ্পাকে ফসল বিক্রি করেছে এটা অবশ্য বেণক্কা জানতেন কিন্তু গঙ্গব্বার কাছে এ কথা তিনি প্রকাশ করেন নি, ভেবেছিলেন বয়েটা যখন আমরাই দিয়েছি, কিছুটা তো আমাদেরও ভুগতেই হবে। এ সব খবর জানা ছিল না বলেই গঙ্গব্বাও নিঃসঙ্কোচেই দেসাঈবাড়িতে যাওয়া আসা করত। শালগ্রাম বৃত্তান্তের পর পনেরো বিশ দিন কিট্টী মা'র খোঁজখবর নিয়েছিল। রত্না অবশ্য মনে মনে জ্বলছিল তাতে। কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই বরদক্ষিণা সংক্রান্ত অপমানের পর কিট্টী আবার বদলে গেল। মায়ের প্রতি অবহেলা অনাদর স্পষ্ট হয়ে উঠল তার ব্যবহারে। মাঝে মাঝে তো চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে রীতিমত চিৎকার চেঁচামেচিও করতে আরম্ভ করল।

দেসাঈজীর ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় রাঘপ্পার সহায়তা করে কিট্টী যে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিল তা নয়। 'দুনিয়ার রীতিই এই' ভেবে মনকে শক্ত করে এ কাজে যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু কোনমতেই শান্তি পাচ্ছিল না সে। সুদ গোণার হাত থেকেও নিস্তার পায়নি। একদিন গঙ্গব্বা যখন ঠাকুরের সামনে পুঁথি খুলে বসেছে হঠাৎ ঝড়ের মত সামনে এসে কুড়ি টাকার নোট মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে কিট্টী বলে উঠল, 'তোমার নামে এই সুদ শোধ করতে যাচ্ছি।' অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গঙ্গব্বা বলল, "এই সব মেয়েলিপনা ছাড় দিকি। এই তিন চার বছরে সুদের সঙ্গে সঙ্গে আসলও দু একশ' টাকা কি শোধ করা যেত না? কিছুটা শোধ করে তারপর যদি এসে বলতে, 'মা এতটা শোধ হয়েছে এবার কিছুটা যদি তুমি দাও তাহলে কি আমি দিতাম না? এই রোজগারে কুলোয় না বলে নাকে কান্না কাঁদ অথচ আমার তো এটুকু সংস্থানও ছিল না। আমি কি করে সংসার চালিয়েছি জিজ্ঞাসা করে দেখো সবাইকে। যুদ্ধের সময় যখন জোয়ারের দাম চড়েছিল একটাকা সের তখনও নিজে আধপেটা খেয়ে তোমায় খাইয়েছি। তোমাকে স্কুলে পড়িয়েছি। এখন তুমি মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছ তাতেও কুলোচ্ছে না। কি এমন বোঝা বেড়েছে যে খরচ কুলোয় না? বউ তো একটাই মাত্র বাড়তি লোক এখনও।"

কিট্টী আর রত্নার খুব খারাপ লাগল কথাগুলো। সব কথারই তারা অন্য অর্থ খুঁজে বার করে। শেষের কথাটা তো বেশ মর্মভেদী। তাদের সন্তান নেই, মা সেই ইঙ্গিত করেই দুঃখ দিতে চেয়েছে এই বুঝল কিট্টী। তাই সেও পালটা আঘাত দিতে বলে উঠল, "তোমাদের পেট ভরাতেই তো উড়ে যায় সব।" গর্জে উঠল গঙ্গব্বা, "আমার পেটের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমায়, দরকার নেই আমার অমন খাওয়ায়। চাকরী ছেড়ে দাও তুমি। এখনও তোমাকে আর তোমার বউকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবার মত শক্তি আমার আছে।"

গঙ্গব্বার আরো বলতে ইচ্ছা করছিল, ফেলে দে আমার জিনিসপত্র টান মেরে, তোর

কাছে থাকব না আমি, গানাপুর চলে যাচ্ছি, কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। কোন অবস্থাতেই এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া চলবে না, সেই প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে গেল তার।

সেদিন খেল না গঙ্গব্বা। কিট্টীও রাগ করে আপিস গেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গব্বা খায়নি এবং রত্নাও না খেয়ে বসে আছে। সারা পাড়ার লোক জানে এ বাড়ির ঝগড়ার কথা। বিকেলে বাড়ি ফিরে কিট্টী দেখল ঠাকুরের বেদীর সামনে চাটাই বিছিয়ে মা শুয়ে রয়েছে। স্ত্রী জানাল, 'উনি খাননি, তাই আমিও খাইনি। উপোস আমিও করতে জানি।'

কিট্টী ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে গিয়ে সঙ্কুচিত ভাবে বলল, "মা, আমার ভুল হয়ে গেছে। অতগুলো টাকা দিয়ে দিতে হবে ভেবে আমার মাথার ঠিক ছিল না।" বহু সাধ্য-সাধনার পর গঙ্গব্বা উঠে খেতে বসল।

কিট্টী ভুলে গেলেও রত্না কিন্তু শাশুড়ীর কথাগুলো ভুলতে পারেনি। এই খিটি-মিটি এখন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই রত্না গঙ্গব্বাকে আর অতটা ভয় পায় না। তিরস্কারের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সে এখন ভাবে, 'আমার স্বামীকে উনি মানুষ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সারাজীবন আমি ভয়ে ভয়ে থাকব নাকি? অত দুঃখ কষ্ট করে শাশুড়ী যে ছেলেকে মানুষ করেছেন আজ তাকেই অমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেন কেন? আমার ছেলে-মেয়ে হয়নি সে কি আমার দোষ? তার জন্যও আমায় কথা শুনতে হবে? এই সব চিন্তা মাথায় ঘুরছে বলে সেদিনের পর থেকে রত্না বেশ জোর গলায়ই শাশুড়ীর সঙ্গে কলহ করে আজকাল।

কিট্টীর পকেট থেকে টাকাকড়ি বাড়ির মধ্যেই চুরি হতে শুরু হয়েছে। কাকে কি বলবে ভেবে পায় না কিট্টী। আজকাল প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে রত্নার খুব ভাব। এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে রত্না বেশ খোলাখুলি ভাবে রটাচ্ছে যে শাশুড়ী কিছু টোট্‌কা তুক্-তাক্ করিয়েছেন তার সন্তান সম্ভাবনা রোধ করার জন্য। এমন মুখরোচক খবরে প্রতি-বেশিনীদের ভারি উৎসাহ। তারা দুপুরবেলা রত্নাকে বাড়িতে ডেকে খুব দরদ দেখিয়ে এ সব খবর রসিয়ে রসিয়ে শোনে। কথাটা গঙ্গব্বার কানে পৌঁছতেই সে কিট্টীর সামনে রত্নাকে ডেকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, "কবে কোন্ ওঝা বদ্যি ডেকে তোমাকে আমি টোট্‌কা ওষুধ বা ঝাড়ফুঁক করিয়েছি বলো।" কিট্টী এদের দুজনের মধ্যে কাকে সামলাবে ভেবে পেল না। রত্না দিব্যি গেলে বলল, এমন কথা সে কখনও বলেনি। কাজেই দরকার হল সাক্ষ্য প্রমাণের। গঙ্গব্বা সাক্ষী দিতে ডেকে নিয়ে এল কাশীর মাকে। কাশীর মা এসে এই পারিবারিক নাটক যথেষ্ট উপভোগ করল কিন্তু কোন তরফেই সাক্ষী না দিয়ে কেটে পড়ল পাড়ায় খবরটা প্রচার করতে। এতদিন পর্যন্ত কলহের সমাপ্তি ঘটাতে, স্বামীর আদেশে রত্না অনেক সময়েই তার দোষ থাক বা না থাক, 'আমার ভুল হয়ে গেছে বলে শাশুড়ীর কাছে মাফ চেয়েছে। আজ কিন্তু সে ও কথা উচ্চারণ করে ক্ষমা চাইতে স্পষ্ট অস্বীকার করল।

কিট্টী একদিন সংসারের জন্য আড়াই সের গুড় কিনে এনেছিল। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল বেশ বড় এক ডেলা গুড় কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। বউয়ের সন্দেহ শাশুড়ী সংসারের জিনিস বাইরে বেচে দেন। শাশুড়ী মনে করে বউ ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র থলিতে ভরে বাপের বাড়িতে পাচার করে। বেশ কিছুক্ষণ বাদ বিবাদ চলবার পর রত্না চুপি-চুপি স্বামীকে জানাল শাশুড়ীর পাট করে রাখা পূজার কাপড়খানা কেমন উঁচু হয়ে রয়েছে। কাপড় সরিয়ে দেখা গেল তার নিচে রয়েছে গুড়ের টুকরো। আবার শুরু হল কলহ। গঙ্গব্বা বলল, 'আমাকে বদনাম করার জন্য বউ ওটা লুকিয়ে রেখেছে।' রত্নার জবাব, 'আমি ওঁর পূজোর কাপড় ছুঁতে যাব কেন, বাঁজা বলে আমায় তো উনি অস্পৃশ্য করে রেখেছেন।' গঙ্গব্বা এ কথায় বলে উঠল, "আচার বিচার সম্বন্ধে অত জ্ঞান থাকলে আজ আর এ দশা হত না।" এবার রত্না গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "খুব তো আচার বিচার মেনে চলেন, এদিকে রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী 'বুক্করী' খান কেন শুনি ?"

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে মিথ্যা অনেকেই বলে কিন্তু রত্নার শেষ কথাটা এতই অসহনীয় যে এই মিথ্যা দোষারোপে গঙ্গব্বা একেবারে অবাক হয়ে গেল, খাওয়া বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল সে। কিট্টী চেষ্টা করল রত্নাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে কিন্তু রত্না একেবারে অনমনীয়। কথাটা যখন সত্যি তখন সে কিসের জন্য বলতে যাবে 'ভুল হয়ে গেছে।' স্ত্রীকে কিছুতেই রাজী করতে না পেরে কিট্টী মাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে মাকে খাওয়া শেষ করতে বলল অনেকটা আদেশ করার ভঙ্গিতে। স্ত্রীর মান ভাঙাবার সময় গলায় মধু ঝরছিল আর মায়ের বেলা 'আদেশ', এ কখনও সহ্য করা যায় ? "আমাকে হুকুম করবার তুই কে ? অনেকদিন চুপ করে সহ্য করেছি, আর চুপ করে থাকব না। এবার কি করা উচিত স্থির করা দরকার, আমি যাচ্ছি গোপন্নার কাছে।" গঙ্গব্বা বেরিয়ে গেল দেসাঈজীর বাড়ির উদ্দেশ্যে। বেলা তখন তিনটে বাজে।

"তুমি তো জান গোপন্না, আজ যদি আমি কিট্টীকে ত্যাগ করি, কালই রাঘপ্পা ওকে দিয়ে ভালুক নাচ করাবে। শুধু এই জন্যই আমি ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। ওর লাথি খেয়েও তাই চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে আছি। তুমিই বল আর বেঁচে থেকে কি করব আমি ? ছেলেকে বড় করলাম, বিয়ে দিলাম। নাতি নাতনীর মুখ দেখার সাধ ছিল কিন্তু ভগবান সে সাধে বাদ সেধেছেন। যাক সেকথা। এমনটা যে হবে তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। সেবার যেমন কাশী নিয়ে গিয়েছিলে তেমনি আর একবার বদ্রীনাথ নিয়ে চল না ভাই, ভগবানকে দর্শন করে আসি। মা গঙ্গা বয়ে চলেছেন সেখানে, পাহাড়ের ওপর থেকে মা গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই পোড়া নারীজন্ম শেষ করে দেব. এ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার," বলতে বলতে কেঁদে ফেলল গঙ্গব্বা।

কিট্টী হয়ত আজকাল দেসাঈজীকেও পরোয়া করে না এরকম একটা সন্দেহ গঙ্গব্বার

মনে আছে। দেসাঈজী ডেকে পাঠালেও যদি কিট্টী না আসে তবে দেসাঈজী অপমানিত বোধ করবেন এই ভেবে গঙ্গব্বা দেসাঈকে সে অনুরোধ করল না। গত দু বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং আজকের ঘটনা সবিস্তারে বলে, জানাল "এতদিন সব চেপে রেখেছিলাম। আজ সব কথা তোমাকে বলতে ইচ্ছা করল। তুমি কিছু মনে করো না ভাই, আমার আর কেই বা আছে...আমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি, উপোস থাকি বা বনবাসে দিক, যা খুশি করুক আমি বাড়িতেই মরব।"

দেসাঈজী কিন্তু ওকে যেতে দিলেন না। বললেন, "গঙ্গব্বা ভয় পেয়ো না, এখানেই স্নান করে ভাত আর ঝুণকী (ডালের মিহি গুঁড়ো ভেজে ভাতের ব্যঞ্জনরূপে খাওয়া হয়) তৈরী করে খেয়ে নাও। আমি এমন ব্যবস্থা করছি যাতে কালই তোমার ছেলে বউ এসে পায়ে ধরে তোমায় বাড়ি নিয়ে যাবে।"

এটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না গঙ্গব্বার। 'আজ যদি থেকে যাই আর তারপর কাল ছেলে নিতে না আসে তখন? কাল নিজে থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া মানে আরোই মান খোয়ানো।' মুখে সে বলল, "থাক ভাই, মেয়েমানুষের জন্ম, সহ্য তো করতেই হবে।" কিন্তু দেসাঈজী কিছুতেই ছাড়লেন না ওকে। সন্ধ্যায় বসন্তকে দিয়ে রাঘপ্পার কাছে খবর পাঠালেন—'গঙ্গব্বা আমার বাড়িতে আছে। কাল সকালে ছেলে এবং বউ দুজনে এসে যেন তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়।' হিসাবে ভুল হয়নি দেসাঈজীর। পরদিন ছেলে বউ দুজনেই এল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল মায়ের কাছে। রহস্যটা ঠিক পরিষ্কার হল না গঙ্গব্বার কাছে। বউকেও পায়ে পড়তে দেখে খুবই অবাক হল সে। এতক্ষণে দেসাঈজী হেসে বললেন, "রাগারাগি শেষ হয়েছে তো? চা টা খাওয়া হয়েছে, না হয়নি এখনও? এবার সবাই হাসিমুখ কর দেখি, একটা সুখবর শোনাই সকলকে।" তারপর হাসিমুখেই কিট্টীকে প্রশ্ন করলেন, "কৃষ্ণ, মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা মামা তোমায় খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলেছে, তাই না?"

ভ্যাবাচ্যাকা কিট্টী 'হ্যাঁ' আর 'না' এর মাঝামাঝি একটা কিছু জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেসাঈ সশব্দে হেসে উঠে বললেন, "মামাকে আর অত খাতির করে চলতে হবে না তোমার। এখন থেকে তুমি কেবলমাত্র জামাই, আর কিছু নও। দত্তক নেবার কথা আর ভাবছে না রাঘপ্পা, সুতরাং আর তাকে খোসামোদের কি প্রয়োজন?"

"কি বললেন?" একসঙ্গে বলে উঠল গঙ্গব্বা আর রত্না। দেসাঈজী হেসেই চলেছেন। গঙ্গব্বা বলে উঠল, "ঠাট্টা করছ নাকি ভাই?" "ঠাট্টা কেন করতে যাব। পনেরো কুড়ি দিন আগে রাঘপ্পা নিজেই এসে বলে গেছে।" "তাহলে কাকে দত্তক নেবে?" প্রশ্ন করল গঙ্গব্বা। "দত্তক টত্তকে আর বিশ্বাস নেই রাঘপ্পার," ওদের আরো খানিকটা ধাঁধাঁয় ফেলে অবশেষে দেসাঈ বললেন, " নিজেরই যখন ছেলে হতে যাচ্ছে তখন দত্তকের কি দরকার? রাঘপ্পাই বলেছে একথা।" এবার দরজার ওপাশ থেকে বেণুবাঈ টীকা করে দিলেন, "চম্পাবাঈয়ের তিন মাস পূর্ণ হয়ে চতুর্থ মাস চলছে।"

রত্নার আশ্চর্যের সীমা রইল না। সে ভাবছিল, গত তিন চার মাস প্রতি সপ্তাহে

দু তিনবার করে বাপের বাড়ি গেছি, কই কেউ তো একথা বলে নি ? শান্তাও জানে না নাকি ? চম্পক্কা তো এমনিতেই অসুস্থ থাকে তাই এ অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন নজরে পড়ে নি। শান্তা কথাটা জানত, কিন্তু রত্না শুনলে দুঃখ পাবে এই ভেবেই চম্পক্কা তাকে বলতে বারণ করেছিল। তাই শান্তাও দিদিকে কিছু বলতে পারেনি।

ভাগ্য ওর সঙ্গে এমন পরিহাস করবে এটা রত্না কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। এই বয়সে রাঘপ্পার আবার সন্তান হবে, এটা যেন একটা অসম্ভব কল্পনা। 'অসম্ভব' কেন, বরং বলা উচিত 'হাস্যকর'। কিন্তু এর ফলে রত্নার সামাজিক এবং আর্থিক দুদিক থেকেই অসম্ভব দাম কমে গেল। বাবার ব্যবহারে মর্মাহত হল সে। দুঃখটা সব থেকে তারই বেশী। হায় ভগবান, এই সন্তান যদি তারই কোলে আসত, একথা মনে হতে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করল সে। নিজের এমন পাগলের মত ঈর্ষা দেখে নিজের ওপরই রেগে উঠল রত্না।

কিট্টীর রাগও হচ্ছিল আবার হাসিও পাচ্ছিল। দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটাকে সে কখনই বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। ওটা তো নিজের মেয়ের কথা ভেবেই করা হচ্ছিল। আর সেই সম্পত্তির আশায় নিজে নত হয়ে থেকে এতদিন স্ত্রীকে সে ফুল জল দিয়ে পূজো করে এসেছে। রাঘপ্পা সত্যিই রসিক লোক, ভাবতে ভাবতে হাসি পাচ্ছিল কিট্টীর।

গঙ্গব্বার দুঃখ হচ্ছিল ঠিকই, তবে এমন হাসিখুশী পরিবেশে কি আর কটু কথা বলা যায় ? বাইরে দেখতে শুনতে বেশ 'সুখবর' অথচ আসলে চিন্তাজনক এরকম একটা হাস্যকর বিষয় অবগত হয়ে মোটামুটি প্রসন্ন ভাবেই ছোট পরিবারটি বাড়ি ফিরে এল।

পরের দিনই রত্না গেল বাপের বাড়ি। কিন্তু কিভাবে ঝগড়াটা শুরু করা যায় ? কেউ ওকে খবরটা বলেনি এটাই ওর দুঃখের প্রধান কারণ। কেউ যখন সামান্য কথায় ঝগড়া বাধায় তখনই বোঝা যায় অশান্তির আসল কারণটা অন্য, সেটা মুখ ফুটে ঠিক বলা যাচ্ছে না।

রত্না দুমদাম করে এসে একেবারে ফেটে পড়ল, "আমাকে কি জানানো উচিত ছিল না ? জানলে কি আমি কেড়ে নিতাম ? নিজের ঘরের কথা আমায় পরের মুখে শুনতে হল, আমি কি এবাড়ির কেউ নই ? বাপ মা কি আমাকে ত্যাগ করেছে ? পর করে দেবার জন্যই কি আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ? নিজের বোন পর্যন্ত ধোঁকা দিল আমাকে ? শ্বশুরবাড়ির কষ্ট ভুলতে মানুষ বাপের বাড়ির ভালবাসা চায়। আমি কি বাপের বাড়ির সম্পত্তির লোভেই বেঁচে আছি নাকি ? ভাই হলে আমারও কি আনন্দ হবে না ? আমিও কি তখন সবাইকে মিষ্টি খাওয়াতে আসব না ?" প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর উঁচু পর্দায় চড়ছিল তার। উত্তেজিত রত্নাকে রাঘপ্পাও সান্ত্বনা দিতে পারছিল না। রেগে, কেঁদে-কেটে চায়ের পেয়ালা ঠেলে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রত্না, "এ বাড়িতে আর আমি পা ফেলতে আসব না। যদি মেয়েও হয় তাহলেও যেন আমার স্বামীকে দত্তক না নেওয়া হয়। তা যদি নাও তো আমাকে টুকরো টুকরো করে

কেটে খাওয়ার সমান হবে এই বলে গেলাম।" ঝড়ের মত ফিরে গেল রত্না নিজের সংসারে।

সেদিন থেকে কিট্টীর বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ একেবারে থেমে গেল এমন নয়, তবে রত্নার বাপের বাড়ির গর্ব দূর হয়ে গেল চিরকালের মত। নিজের শ্বশুরবাড়ির সম্মান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে। স্বামী ছাড়া তার আর কেউ নেই, স্বামীর ওপর অখণ্ড বিশ্বাস রাখতে হবে এটা সে বুঝেছে এখন। বাপ মা চিরকাল আপন থাকে না এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে বসে গেছে ওর মনে। গঙ্গবার সঙ্গে ঘর করতেই হবে, এটাকেও ভগবানের দেওয়া এক অনিবার্য ব্যবস্থা রূপে স্বীকার করে নিয়েছে রত্না।

33. অচ্যুতের দ্বিতীয় পত্র

অচ্যুতের দ্বিতীয় পত্রটি এল প্রায় মাসখানেক পরে কারণ বেঙ্কটরাওয়ের মুখ থেকে অতীত কাহিনী উদ্ধার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অচ্যুতের প্রায় একমাস লেগে গেল সেই অসাধ্যসাধন করতে। দেখতে খ্যাপাটে হলেও বেঙ্কটরাও বেশ জেদী এবং সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক। একদিক থেকে দেখতে সে বেশ নীচও বটে। মাঝে মাঝে অচ্যুত একটু দীর্ঘ প্রশ্ন করলেই সে চেঁচিয়ে উঠত, "আমাকে এ ভাবে জ্বালাতন করবে না, করবে না, করবে না বলে দিচ্ছি।" কখনও বা চড়া মেজাজে কথা বলত। হাত মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠত, 'সব মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা'। মাঝে মাঝে আবার, 'কি হে দেসাঈ, দেসাঈওয়ালা কারবার শুরু করে দিয়েছ না কি ?' বলে অচ্যুতকে ক্ষ্যাপাতেও ছাড়ত না। কিন্তু অচ্যুত হাল ছাড়বার পাত্র নয়। 'আমার বাবা তোমাকে তোমার অংশ পাইয়ে দেবেন,' এই কথা বলে বেঙ্কটকে খুশী করে, ভুলিয়ে ভালিয়ে একটু একটু করে সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করে নোট করতে থাকে সে। প্রায় একমাসের পরিশ্রমে যে বিবরণ সংগৃহীত হল তা গুছিয়ে চিঠিতে লিখে বাবাকে জানাল অচ্যুত।

শ্রী বোম্বাই

ক্ষেম

পূজ্য পিতাজীর চরণারবিন্দে চিরঞ্জীবী অচ্যুতরাওয়ের যাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আপনার পত্র পেয়েছি। বেঙ্কটরাও ধীবুঘড়ীর মামলায় কিভাবে ফেঁসেছিল তা আপনার পত্রে জানলাম। ঐ সংবাদের সুযোগ গ্রহণ করে আমি তাকে ভয় দেখিয়ে বলি, "তুমি সই জাল করেছিলে, ঠিক কি না বল।" লোকটা কিন্তু খাঁটি। ঈশ্বর এবং পিতামাতার নামে শপথ নিয়ে বলল সে এ কাজ করেনি। বিভিন্ন সময়ে ওর কাছে যে বিবরণ সংগ্রহ করেছি তা নিচে লিখছি। এ বিবরণ অবশ্য অসম্পূর্ণ কিন্তু আমার মনে হয় এর অধিকাংশ কথাই সত্য।

পনেরো বিশ বছর পূর্বে বেঙ্কটরাও পুণায় শেঠ তখ্‌তমল নামে এক ব্যবসায়ীর

কাছে চাকরী করত। সে বাড়ির ভৃত্যবর্গের মধ্যে বেঙ্কটরাওই একমাত্র দক্ষিণী ব্রাহ্মণ হওয়ায় শেঠজী তাকে বিশ্বাস করতেন খুব। নিজের বাড়িরই পেছন দিকের একটি ঘরে থাকতেও দিয়েছিলেন। আপনি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন বেঙ্কট লোকটি পাগলাটে হলেও সাচ্চা মানুষ। বিশ্বস্ত এবং মাঝে মাঝে বেশ চতুরও বটে। শেঠের বাড়ির পূজাপাঠের কাজ বেঙ্কটই করত। শ্রাদ্ধাদির ক্রিয়াকর্মও তাকে দিয়েই করানো হত। শেঠানী তো তাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলে ভক্তি করতেন। আদর করে খাওয়াতেন প্রায়ই। বেশ কিছুকাল ধরে বিশ্বাসভাজন থাকায় শেঠ বেঙ্কটকে অবশেষে ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙানো, টাকা তোলা ইত্যাদি কাজেও পাঠাতে লাগলেন। সুতরাং এই দেহাতী মারাঠী এবং অদ্ভুত হিন্দীভাষী গোল গোল চোখওয়ালা লোকটিকে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা সবাই ভাল করে চিনে ফেলল। ব্যাঙ্কের কেরানীরা ওকে দেখলেই তামাশা করে জিজ্ঞাসা করত, 'কি হে আজ শেঠানী কি খাওয়ালেন, কচুরী না লাড্ডু?' সেও জবাব দিত, 'খেলাম তো আমি, তোমাদের পেট কামড়াচ্ছে কেন?'

একদিন চেক ভাঙাতে গিয়ে ব্যাঙ্কে সে যখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, শেঠজীর ড্রাইভার তাজিমুদ্দিন হঠাৎ জোরে মোটর হাঁকিয়ে এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্কের সামনে। বেঙ্কটরাওকে ডেকে দু'হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে বলল 'শেঠজী মোটর মেরামতির জন্য এটা দিয়েছেন, টাকাটা আমার আজই চাই, কিন্তু আমার আজ একেবারে সময় নেই, এখন চেক ভাঙাতে গেলে লাইনের একেবারে শেষে দাঁড়াতে হবে। তুমি তো সামনের দিকে নম্বর পেয়েই গেছ, তুমিই চেকটা ভাঙিয়ে আমাকে টাকাটা দিয়ে দিও। বেঙ্কটরাও সেই চেক নিয়ে আবার এসে দাঁড়ায় লাইনে। সেই সময় ওর সামনের লোকটির সঙ্গে ব্যাঙ্কের কেরানীর কিছু বাদানুবাদ চলছিল কাজেই বেঙ্কটের পালা এসে গেলেও তাকে চুপচাপ অপেক্ষা করতে হয় কিছুক্ষণ, ফলে তাজিমুদ্দিনেরও দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সে এসে বেঙ্কটের কানে কানে বলে গেল 'চেকটা ভাঙিয়ে এখানেই অপেক্ষা কর, শেঠজীকে দোকানে পৌঁছে দিয়ে পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'

চেকটা ভাঙাতে বেঙ্কটের কোন অসুবিধাই হল না। আগের লোকটির সঙ্গে বাদানুবাদের পর ক্লার্ক কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিল তাই বেঙ্কটের মত চেনা লোকের চেক ভাল করে খুঁটিয়ে না দেখেই পাশ করে দেয়। তিন চার মিনিটের মধ্যেই অন্য কাউন্টার থেকে দু'হাজার টাকা পেয়ে গেল বেঙ্কটরাও। অন্য যে চেকটা সে এনেছিল সেটা শেঠের নামে জমা করে দিল তারপর ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে বসে তাজিমুদ্দিনের জন্য 'অপেক্ষা করতে লাগল। একঘণ্টা কেটে গেল তখনও তাজিমুদ্দিনের দেখা নেই। ওর ভয় হতে লাগল কেউ যদি ওকে মেরে ধরে টাকাটা ছিনিয়ে নেয়,—শেষে আর অপেক্ষা না করে বাড়িতেই ফিরে এল।

টাকাটা যত্ন করে ট্রাঙ্কে রেখে রাঘপ্পাকেই সেদিকে একটু নজর রাখতে বলে বেঙ্কট। রাঘপ্পা ঐ সময় চাকরী খুঁজতে পুণায় গিয়েছিল। ট্রাঙ্ক ছেড়ে কোথাও যেতে ভাইকে নিষেধ করে বেঙ্কট চলে যায় নিজের কাজে। শেঠের বড় ছেলে বাবুভাই বেঙ্কটকে দেখেই ইশারায় তাকে নিজের কামরায় ডাকে। এই ছেলেটির উড়নচণ্ডে বলে বেশ বদনাম ছিল। ঘরে আসতেই বাবুভাই প্রশ্ন করে, 'তাজি-মুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' বেঙ্কটরায়ের মনে খটকা লাগে, তবু সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'। এরপর বাবুভাই জিজ্ঞাসা করে, 'চেক দিয়েছে?' উত্তরে আবার 'হ্যাঁ' বলতে হয় বেঙ্কটকে। 'চেক ভাঙিয়ে টাকা তাজিমুদ্দিনকে দিয়ে দিয়েছ?' এ প্রশ্ন শুনে নিরুপায় বেঙ্কট বাধ্য হয়ে মিথ্যা কথা বলল, 'জী হাঁ'। মিথ্যা-ভাষণ বেঙ্কটের কাছে বৃশ্চিকদংশনের মত যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু তবু বলতে বাধ্য হল সে কারণ সত্য কথা বললে বাবুভাই ওকে কিছুতেই ছেড়ে দিত না, ওর ঘাড় ধরে টাকাটা আদায় করে নিত। তাজিমুদ্দিনের কাছে খাঁটি থাকবার জন্যই ওকে এখানে মিথ্যা বলতে হল। এরকম বুদ্ধির পরিচয় বেঙ্কটের মধ্যে পাওয়া যায়। নিজের সিদ্ধান্তে সে অটল থাকে। বাবুভাই এরপর ওকে ছেড়ে দেয়।
কিন্তু সারাদিনেও তাজিমুদ্দিনের পাত্তা পাওয়া গেল না। শেঠজীও সন্ধ্যার ট্রেনে বোম্বাই চলে গেলেন। পরের দিন সকালে বেঙ্কট যখন শেঠজীর বাড়িতে পূজায় বসেছে সেই সময় রাঘপ্পা এসে বলে, তাজিমুদ্দিন এসেছে এবং তখনি টাকাটা চাইছে।
স্নান সেরে পূজায় বসেছে, সে সময় উঠে ট্রাঙ্ক স্পর্শ করা সম্ভব নয় কাজেই বেঙ্কট নিজের পৈতা থেকে চাবীটি খুলে রাঘপ্পার হাতে দেয়। রাঘপ্পার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাজিমুদ্দিন সেই যে গেল আর কোনদিন ফিরল না।
এর দশ বারো দিন পরে হিসাবের খাতায় গরমিল লক্ষ্য করে সন্দেহবশত শেঠ পুলিশে খবর দেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ এসে বেঙ্কটের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল। সুতরাং আসল পাপী তাজিমুদ্দিন না আর কেউ সেটা সঠিক বলা কঠিন। চেকটা বেঙ্কটরাওই ভাঙিয়েছিল কাজেই ফল ভুগতে হল তাকেই।
ইতিমধ্যে চাকরী না পেয়ে রাঘপ্পাও ফিরে গেছে। বেঙ্কট দিশাহারা হয়ে চিঠি লিখল ভাইকে। রাঘপ্পা তাদের ভগ্নীপতি স্বামীরায়কে দিয়ে জামিন দিইয়ে ভাইকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে আনে।
তিনজনে যখন ধারবাড়ে ফিরে আসছে সেই সময় ট্রেনে স্বামীরায় বেঙ্কটকে বলেন 'তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, তুমি তোমার ভাগের জমিজমা আমার নামে লিখে দাও। তোমার ওপর ভরসা করা যায় না'। তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় ধারবাড়ে এসে দানপত্র লিখে দেওয়া হয়। লিখে দেবার পর বেঙ্কটের খুবই দুশ্চিন্তা হয়। দানপত্রের কোন প্রতিলিপি তার বা রাঘপ্পার কাছে ছিল না।

এদিকে রাঘপ্পা বলতে শুরু করে, 'তোমার ভাগে ছিলই বা কতটুকু? আমাদের ভাল ভাল দু'খানা ক্ষেত স্বামীরায় লিখিয়ে নিলেন এখন আমার কি দশা হবে? স্বামীরায়ের কাছ থেকে ঐ দানপত্রের একখানা প্রতিলিপি চেয়ে আনার জন্য রাঘপ্পা বেঙ্কটকে অনবরত উত্যক্ত করতে থাকে। এমনিতেই বেঙ্কটের মাথার ঠিক নেই তার ওপর এই দুইজনের তর্কবিতর্কের মধ্যে প'ড়ে তিতিবিরক্ত বেঙ্কট একদিন স্বামীরায়কে গিয়ে বলে, 'আমি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। দানপত্রের একটা প্রতিলিপি আমার চাই'।

স্বামীরায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, চট করে এ প্রস্তাবে রাজী হননি। কাজেই বেঙ্কট বেশ মর্মাহত হয়েছিল। অবশেষে খুব বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীরায় বলেন, 'পাঁচ হাজার জামিন দিয়েছি তোমার জন্য, যদি কেউ বলে তোমাকে দিয়ে আমি অন্যায় ভাবে লিখিয়ে নিয়েছি তাহলে যে কোন শাস্তি নিতে প্রস্তুত আছি আমি'—এরপর রাগের বশেই দানপত্রের একখানা প্রতিলিপি ছুঁড়ে ফেলে দেন বেঙ্কটের সামনে। কাগজখানা নিয়ে বেঙ্কট রাঘপ্পার কাছে আসে। পরদিন সকালে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার কথা ছিল তাই বেঙ্কট সেদিন রাঘপ্পার বাড়িতেই আহারাদি করে শুয়ে পড়ে। সেই রাত্রেই এগারোটার সময় তাকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ এসে দরজা ধাক্কাতে থাকে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে খিড়কী দরজা দিয়ে বেঙ্কট পালায় ষ্টেশনে, সেখান থেকে সোজা বোম্বাই।

বেঙ্কট যেমন যেমন বলেছে সেইভাবেই এই বিবরণ লিখেছি, কিন্তু এর মধ্যে অনেক জায়গায় আমার খটকা লেগেছে। বোম্বাই এসে সে এই আটাকলের মালিকের বাড়িতে চাকরী নেয় তারপর এই আটাকলটা চালু হলে এখানেই কাজ করতে থাকে। সেই থেকে এর অজ্ঞাতবাস চলেছে। বেঙ্কটরাও বলে এই দানপত্র যারা যারা দেখেছে তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই ওকে বলেছি যে ওর সম্পত্তির অংশ ও ফিরে পাবে।

বেঙ্কট যা যা বলেছে তাই আমি লিখেছি তবে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে পাগলাটে স্বভাবের জন্য অনেক ব্যাপারই বেঙ্কট বুঝতে গোলমাল করেছে। এই বিবরণের অনেক বিষয়ই সন্দেহজনক। বেঙ্কটের মুখ থেকে শুনলে আপনারও ঠিক এই সন্দেহ হত। আমার নোট থেকে সব কথা যদি স্পষ্ট না হয় সে কারণে এ সম্পর্কে আমার ধারণা এবং মতামতও জানাচ্ছি।

প্রথম কথা, বেঙ্কটের কাছে যে কাগজখানা আছে সেটিকে সে মূল দানপত্রের প্রতিলিপি বলে মনে করে। কিন্তু আপনার হয়ত মনে আছে প্রথম চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে আমার সন্দেহ এই কাগজখানিই মূল দানপত্র। এর ওপর রেজিষ্ট্রেশনের ছাপ নেই এবং কালির দাগও পুরানো হয়ে যাওয়ায় প্রতিলিপি মনে হতে পারে বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার স্বামীরায় রাগের বশে কাগজখানা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই এটা আসল দানপত্রও হওয়া সম্ভব। এমন যে হতে,

পারে তা বেঙ্কট কোনদিন অবশ্য কল্পনাও করেনি কিন্তু আমার বিশ্বাস এটাই আসল কাগজ। মূলের সঙ্গে দু তিন খানা প্রতিলিপি করিয়ে রাখলে রাগের বশে এরকম ভুল হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।
দ্বিতীয় কথা, জামিনে ছাড়া পাবার পর আবার পুলিশ এল কেন? সমন আসা উচিত ছিল। পুলিশ কি সত্যিই এসেছিল না বেঙ্কটকে ভয় দেখানো হয়েছিল?
তৃতীয় কথা, বেঙ্কটরাও বোম্বাই পালাবার পর স্বামীরায়ের কি অবস্থা হল? তিনি সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছিলেন কেবল সাবধানতার বশে এটা ঠিক, অর্থাৎ যদি কিছু হয় তো জামিনের টাকার বদলে অন্তত সম্পত্তি থাকবে। প্রথমটা নিশ্চয় তিনি ঐ ভেবেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কিন্তু ভাল করে দেখে যখন বুঝতে পারলেন যে মূল দানপত্রই হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন নিশ্চয় তিনি খুবই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এসব সম্ভাবনা বেঙ্কটের মাথাতেই আসেনি কখনও। এখনও সে জানে স্বামীরায় তার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মনের আনন্দে ভোগ করছেন। আসল অবস্থা জানতে পারলে সে খুবই কষ্ট পাবে এবং একেবারে পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এ কথাটা আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখা দরকার।
এতসব কথার পরও কিন্তু আসল রহস্য অনাবিষ্কৃতই থেকে যাচ্ছে। জাল চেকটা দিয়েছিল কে? বেঙ্কটরায় ফেরার হবার পর পুলিশ কি তার খোঁজ করেনি? তার অনুপস্থিতিতে কেস চলেছিল? এসব প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সূত্র থেকে এসব বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর করা প্রয়োজন। আমার ইচ্ছা, এ বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত করি। এখানে আমি আরো খবর সংগ্রহ করব এবং আদালতের পুরানো রেকর্ড বার করিয়ে দেখার চেষ্টা করব।
যদি সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায় তাহলে আমাদের পত্রিকায় ছদ্মনামে এ কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। আমাদের সম্পাদক মশায়কে কিছু কিছু বলেছি, তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। তিনি বলছিলেন আমাদের দেশে এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা কত ঘটে, অথচ লিখবে কে? কমিক পর্যন্ত আমরা বাইরে থেকে আমদানী করি। কাহিনীও বিদেশ থেকে কেনা হয়। কিন্তু সে সব তো বিদেশী পরিবেশে বিদেশী ধাঁচের গল্প। সেইজন্যই তিনি এ কাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করতে চান। পুণা যাওয়ার জন্য কিছু টাকা পাঠাবেন কি?
আমার লেখাপড়া ভালভাবেই চলছে। শরীর সুস্থ আছে। মাকে প্রণাম জানাবেন। ভাইদের আশীর্বাদ।

ইতি

অচ্যুতরাও

34. আগুন নিয়ে খেলা

দেসাঈজীর কাছ থেকে মেয়ে জামাইকে পাঠিয়ে দেবার খবর পেয়ে রাঘপ্পা গজ গজ করল যথেষ্ট কিন্তু অনুরোধ রক্ষাও করল। 'করে নাও দেসাঈ যা করতে পার। দিন আসুক, তখন আমিও তোমার টুঁটি টিপে ধরব।' মেয়ে জামাইকে বাড়িতে ডেকে সে বোঝাল, 'মিলে মিশে থাকা উচিত। আমার বোন অনেক দুঃখ সয়েছে, তোমরা আবার দুঃখ দিও না তাকে।' রত্নার বিয়ের পরও রাঘপ্পা কোনদিন গঙ্গব্বার বাড়িতে পা দেয়নি, গঙ্গব্বাও আসেনি রাঘপ্পার বাড়ি। দুপক্ষেই বিদ্বেষ ছিল যথেষ্ট, গঙ্গব্বার কাছে রাঘপ্পা তো সাক্ষাৎ পাপের প্রতিমূর্তি। রাঘপ্পার চোখে গঙ্গব্বা ছিল এমন এক শক্তিমতী প্রতিপক্ষ যে তাকেও হয়ত ঘাড় ধরে মাথা নুইয়ে দেবার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু তবু কখনও কখনও গঙ্গব্বার কথা ভাবলে ওর মন করুণায় ভরে যায়। বিয়ের কথা যখন স্থির হয়ে যায় তখনও এ ভাবটা এসেছিল। আজ আবার গঙ্গব্বা না খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, দেসাঈজীর বাড়ি বসে আছে এ সব শুনে দুঃখে ওর মন গলে গেল। তাই দেখে মেয়ে জামাইও মেনে নিল ওর অনুরোধ।

কিন্তু নিজের মনের দয়ার্দ্র ভাবটা ও প্রকাশ করতে চাইছিল না। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন দেসাঈজী বলে পাঠিয়েছেন বলেই ওকে এ অনুরোধটা করতে হচ্ছে। যা হোক পরের দিন দেসাঈবাড়ি যাবার জন্য মেয়ে জামাইকে রাজী করাল সে। দুর্বুদ্ধির বিশেষত্বই হচ্ছে এই, সুবুদ্ধির পথে চলতে গেলেও চট করে সেটা স্বীকার করে না, নিজের পছন্দমত একটা কিছু কারণ খুঁজে বার করে।

কিন্তু পরিণামটা হল একটু অন্যরকম। যে বিষয়টাকে রাঘপ্পা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি সেইটির সুযোগ নিয়ে দেসাঈজী তার মেয়ের মন বিষিয়ে দেবেন এটা সে ভেবে দেখেনি আগে। যে রত্না দু তিন দিন পরে পরেই বাপের বাড়ি বেড়াতে আসত সে আজ পনেরো দিন হতে চলল, সেই রাগারাগির পর আর এদিকে মুখ দেখায় নি। কিট্টীর সঙ্গে অবশ্য পথে দু একদিন দেখা হয়েছে, কিন্তু তাকে আর মেয়ের কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? এদিকে এতদিন রত্নাকে না দেখে মনটা ছটফট করছে। থাকুক, স্বামীর ঘরে সুখে থাকলেই হল, এইসব বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে নিজেকে। নিজের মনে বিড় বিড় করে রাঘপ্পা, 'রাবণ হয়েছি আমি, বিনাশকাল উপস্থিত, তাই একে একে সবাইকে হারাচ্ছি। ঠিক আছে দেসাঈ, একটা জায়গায় তোমার হার হবেই হবে।'

মনে মনে ক্রমেই আশান্বিত হয়ে উঠছে সে। প্রথমত ছেলে হতেই হবে। তার জন্য মানত করেছে, সত্যনারায়ণের পূজাও হল। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর কাছে মনি অর্ডারে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছে, সেখান থেকেও উত্তর এসেছে ছেলে হবে। দেবতার ভর হয় যে যোগিনীর ওপর তার সামনে পাঁচ আনা পয়সা ও পাঁচটি সুপারি রেখে জিজ্ঞাসা করেছে, সেখানেও ঐ একই উত্তর পেয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে রাঘপ্পার মনটা খুশীই ছিল।

তাছাড়া আরো একটা আশা। কি করে বসন্তর সঙ্গে শান্তার বিয়েটা ঘটানো যায়। দেসাঈজীর ওপর টেক্কা দেবার এই একটাই উপায় ওর হাতে আছে। তাই বসন্তকে এ বাড়িতে আসতে ও প্রাণপণে উৎসাহিত করে। সর্বদা শান্তাই তার জন্য চা নিয়ে আসে কিন্তু বসন্ত কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে না। তার মনে অনেক সঙ্কোচ। সে ভাবে, গহনার দোকানওয়ালা পাত্র যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আর আমার দিকে কেউ নজর দেবে কেন। শুধু শুধু খদ্দর পরে কি লাভ? যদি আমার হাতেই মেয়েকে দিতে চায় তো সোজাসুজি সেটা বলছে না কেন? কোন জিনিসের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা বসন্তের স্বভাবে নেই, কাজেই ভবিষ্যতের লাভের চিন্তায় মাথা না ঘামিয়ে বসন্তরাও এ বাড়ির মুখরোচক জলখাবার, গল্পগুজব আর মাঝে মাঝে তাস খেলা এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত।

তবে মনে মনে বসন্তর সন্দেহ হচ্ছিল যে মেয়েটি বোধ হয় ওকে পছন্দ করে ফেলেছে। তা যদি না হবে তো ও যখন রাঘপ্পার বাড়ি থেকে বিদায় নেয় সেই সময় ফুল তোলার অছিলায় সে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? নাটক নিয়ে যখন মেতেছিল সেই সময় বসন্ত নিজের জন্য কালচার পার্লের একটা মালা করায়। সেই হারটি নতুন করে মেয়েলি ডিজাইনে গাঁথিয়ে সে অনেকদিন ধরে পকেটে নিয়ে ঘুরছে, শান্তাকে দেবার উপযুক্ত অবসর পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে একদিন সুযোগ এল কিন্তু জায়গাটা একেবারেই সুবিধের নয়, একেবারে পথের মাঝখানে। বাড়িতে তো শান্তাকে কখনই একা পাওয়া যায় না। চম্পক্কা সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখে। সেদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে শান্তা বসন্তর সামনে পড়ে গেল। বসন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবে এটা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। বসন্ত একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "রাঘপ্পাজী শহরে নেই নাকি?"

"আছেন তো।"

"বাড়িতে তো নেই?"

"তাহলে কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।"

"এটা একটু দেখ তো," পকেট থেকে হারটা বার করে বসন্ত ওর হাতে গুঁজে দিল। হারটা দেখতে দেখতে শান্তা বড় বড় মুক্তোগুলির ওপর আঙুল বোলাতে লাগল। আঙুল-গুলিও যেন মুক্তোর মত মনে হল বসন্তর। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মুক্তোগুলো আসল নয়, কালচার পার্ল।"

কি বলবে ভেবে পেল না শান্তা, একটু অস্বস্তি ভরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার মায়ের হার বুঝি?"

বসন্ত বলল, "না আমারই, গ্রামের নাটকে রাজার পার্ট করার সময় করিয়েছিলাম। তোমার এটা পছন্দ হয়েছে? তাহলে নিয়ে নাও না?"

শান্তার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। এদিক ওদিক দেখে ওর মনে হল গলির মধ্যে এ বাড়ি ও বাড়ির জানলা থেকে অনেক মহিলাই ব্যাপারটা উঁকি মেরে দেখছেন। এত

দূর থেকে কথাবার্তা যদিও শোনা যাচ্ছে না তবু শান্তার মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এক সময় সে যখন শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল তখন কেউ কেউ বলেছিলেন, 'ঐ চম্পার মেয়ে ছাড়া আর কে ও সব করতে যাবে.' সেই অপমানজনক ইঙ্গিত ওর মনে পড়ল। সে ভাবল, এখন যদি আপত্তি জানাই এ ভদ্রলোক তো রাস্তার মাঝেই পীড়াপীড়ি শুরু করে দেবেন। মুক্তোগুলিও ভারি সুন্দর। সে বলল, "বন্ধুদের দেখিয়ে ফিরিয়ে দেব।" হাতের মুঠোয় মালাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এগিয়ে গেল বাড়ির পথে। বোকার মত চেয়ে রইল বসন্ত। নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল ওর।

কিছুদিন কেটে গেল। একদিন আর থাকতে না পেরে রাঘপ্পা বসন্তের সামনে স্পষ্ট কথাটা বলেই ফেলল।

"দেখ বসন্ত, শান্তার সম্বন্ধে অনেক ভেবে দেখলাম। সেই গহনার দোকানওয়ালা গোবিন্দরায়ের ছেলেকে আজ ডাকলে আজই নাচতে নাচতে শান্তাকে বিয়ে করতে চলে আসবে এটা ঠিক, কিন্তু তাদের বাড়ির ভেতরের খবর আমার কিছুই জানা নেই। বাইরে থেকে তো দেখলে আমীর মনে হয় কিন্তু এই স্যাকরাদের ওপর ঠিক ভরসা করা যায় না। যারা সোনা নিয়ে কাটাছেঁড়া করে তাদের হাত কসাইয়ের মত হয়ে যায়। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও হয় লম্বাচওড়া, সংসারে ঝগড়াঝাঁটি একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকে। এদের বংশও হয় অভিশপ্ত। এদের সন্তানদের মধ্যেও অনেক পাগল আর হাবাগোবা দেখা যায়। মোটের ওপর, এখানে বিয়ে দিতে আমার মোটেই সাহস হচ্ছে না। তাই আর একটা কথা ভাবছি।"

"কি কথা ?"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আজ দু বছর হয়ে গেল, তোমার স্বভাবটি আমার বড় ভাল লাগে। তোমার বাবার সম্বন্ধে তো আমার শ্রদ্ধা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তোমার উচ্চতা, তোমার রূপ, স্বভাব চরিত্র সব কিছুই শান্তার উপযুক্ত। যদি তোমার হাতে শান্তাকে দিই তাহলে শুধু আমি নয়, তুমি, তোমার পিতা এবং পিতৃকুলও ধন্য হয়ে যাবে এতে আমার একতিলও সন্দেহ নেই। দুদিন ধরে শুধু এই কথাটাই ভাবছি, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না পর্যন্ত। আজ আর থাকতে না পেরে তোমায় বলেই ফেললাম।"

বসন্ত তো আনন্দে আত্মহারা। সে জবাব দিল, "আপনার কথা অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি বাবার মত যদি করাতে পারেন আমি কালই বিয়ে করতে প্রস্তুত।"

রাঘপ্পা এই কথাটিরই অপেক্ষা করছিল। তার উত্তরও ছিল তৈরী। তার সম্বন্ধে দেসাঈজীর ধারণা ভাল নয় এটা তো জানা কথা। তিনি এ বিবাহে কিছুতেই রাজী হবেন না। তাছাড়া একবার যদি তাঁর মুখ থেকে 'না' বেরিয়ে যায় তাহলে তাঁকে বাগে আনা খুব কঠিন কাজ। আগে অচ্যুতের বিবাহ হলে তবে বসন্তের কথা ভাবা যাবে, এ অজুহাতও দেসাঈ দেখাতে পারেন। তাই এ পথটা রাঘপ্পার পছন্দ নয়। তার পরিকল্পনা অন্য-

রকম। সে চায় বসন্ত নিজেই বাপকে বিয়ের কথা বলবে, ঝগড়া করবে, বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসবে, এ বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করে, পিতার সঙ্গে সম্পত্তির অংশ নিয়ে বিবাদ করে আলাদা হয়ে যাবে এবং রাঘপ্পারই কথামত চলবে। তাহলেই দেসাঈকে ঠিকমত জব্দ করা যায়। এতসব ভেবে রাঘপ্পা মুখে বলল, "তুমি নিজে রাজী আছ কিনা বল। রক্তের সম্পর্ক বড় মজবুত বন্ধন। তোমার নিজের সিদ্ধান্ত যদি স্থির থাকে তাহলেই বলতে পারি এরপর কি কর্তব্য।"

"হ্যাঁ আমার সিদ্ধান্ত স্থির। আপনি বলুন কি করতে হবে?"

"শান্তার পনেরো পূর্ণ হয়ে ষোল চলছে। এখন আরো তিন বছর অপেক্ষা করা কি সম্ভব? সেটা আগে বল।"

"আমি এ কথা কখন বললাম?"

"তুমি নয়, কিন্তু তোমার বাবা বলতে পারেন। বাবাকে রাজী করানোর কথা বলছিলে না তুমি? তোমার বাবা আমার কথা একেবারে ফেলতে পারবেন না এটা হয়ত ঠিক ...কিন্তু বড় ছেলে এখনও পড়ছে, তার পড়াটা শেষ হোক, তারপর বসন্তর বিয়ের কথা ভাবা যাবে একথা যদি বলেন তোমার বাবা তাহলে দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। বড়রা সব সময়েই চান সব কাজ ঠিক ভাবে সামাজিক রীতি অনুসারেই হোক। যদি উনি ঐ কথা বলেন তাহলে তিন চার বছর তো আমি অপেক্ষা করতে পারব না। শান্তার ষোল বছর পূর্ণ হতে হতেই বিয়েটা দিয়ে ফেলা আমার ইচ্ছা।"

"তাহলে কি হবে?" গালে হাত দিয়ে হতবুদ্ধি বসন্ত জিজ্ঞাসা করল। বাবার হাতের থাপ্পড়টা বোধ হয় ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে।

"এটা তোমারই কাজ। যদি সত্যিই আমার মেয়েকে বিবাহ করতে চাও তাহলে তোমায় নিজেই স্পষ্ট করে সেকথা বাপের কাছে বলতে হবে। যদি তোমার মধ্যে যথার্থ আগ্রহ থাকে তাহলে আপনা থেকেই বলবে তুমি। আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমারও যথেষ্ট বয়স হয়েছে, লোকে আমায় যজমান বলে খাতিরও করে। একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। এখন যদি আমি তোমার বাবাকে গিয়ে বলি বড় ছেলের আগে ছোটর বিয়ে দিন তাহলে পাঁচজনে আমারই নিন্দে করবে, বলবে বুড়ো হয়ে গেল এখনও আক্কেল হয়নি। আসলে অবশ্য এ সব কথার কোন মানেই হয় না। তবে শান্তা আমার, ঠিক তোমারই যোগ্য মেয়ে। ওকে পেলে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে এটুকু বলতে পারি। এখন তোমার মনের জোর কতটা তারই ওপর সব নির্ভর করছে।"

বসন্ত পড়ে গেল সমস্যায়, অনেক ভেবে চিন্তে বলল "আপনি যেমন বলবেন আমি সেইভাবেই চলতে প্রস্তুত।"

"আমি তো একটি কথাই বলতে পারি—তোমার বাবাকে রাজী করানোর কাজ তোমার। আমি এ ব্যাপারে মাথা গলাব না। তুমি বোকাও নও মূর্খও নও, অবস্থাটা আশা করি বুঝতে পারছ। আমার শান্তাকে তুমি দেখেছ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে পুরুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার বিবাহের ওপর। বিয়ে-

শাদীর ব্যাপারে এটা বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ছোটরাই শেষ পর্যন্ত গুরুজনদের আক্কেল শিখিয়েছে।" এই বিষয় নিয়ে সাহস করে একটি জায়গায় শুধু বসন্তর পক্ষে কথা বলা সম্ভব—মায়ের কাছে সে জিদ করতে পারে। কি করা উচিত সে ঠিক বুঝতে পারছে না। চিন্তাকুল ভাবে সে রাঘপ্পার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

দিন পনেরো ধরে রান্নাঘরে মায়ের কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করা সত্ত্বেও মা এ প্রস্তাব দেসাঈজীর সামনে তুলতে কোনমতেই রাজী হলেন না। তিনি বড়ঘরের মেয়ে, এ ধরনের কথা জন্মে শোনেন নি। তাঁকে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল দেসাঈজীকে দেখাবার জন্য তখন সঙ্গে এসেছিল বত্রিশটা পেট্রোম্যাক্স বাতিধারী, কুড়িজন খোলা তলোয়ার হাতে পাহারাদার, ব্যাণ্ডবাদকের দল এবং আরো বহু আত্মীয়স্বজন। আর আজ কিনা বর স্বয়ং এসে বলছে, 'আমি অমুক মেয়েকে বিয়ে করব,' তাও আবার এমন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে বলছে যার পক্ষে বরদক্ষিণার হাজারটা টাকা দেওয়াও কষ্টকর। তার চেয়ে বড় কথা, অচ্যুতের পালা আসবার আগেই বিয়ে করতে চায়। এ রকম কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না, এ অসম্ভব। বসন্তর ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "এই যদি তোমার ইচ্ছা তো নিজে বল গিয়ে যাও। ঐ রাঘপ্পার সম্বন্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাই না।" মা যদি একবার কথাটা তুলতেন তাহলে না হয় কোনমতে কথা চালিয়ে যেতে পারত কিন্তু একেবারে একা নিজে থেকে কথা পাড়বার সাহস তার আর নেই। এখন দুদিকেই ফেঁসে গেছে বসন্ত। বাড়িতে কথাটা কিছুই এগোচ্ছে না ওদিকে রাঘপ্পাকেও মুখ দেখানো যাচ্ছে না। কিছুই স্থির করতে না পেরে রাঘপ্পার বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে সে।

দেসাঈ এদিকে স্ত্রীর কাছে সব খবরই পাচ্ছেন। অচ্যুতের দ্বিতীয় পত্রখানি চাকরের হাতে দিয়ে রাঘপ্পাকে পাঠিয়ে বলে দিয়েছিলেন পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ পাঠাতে।

বন্ধুর বাড়ি যাবার জন্য শান্তা সেজেগুজে তৈরী হচ্ছিল একদিন, চম্পক্কা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দু এক নজর দেখে ডাকল, 'শান্তা এদিকে আয় তো!' কাছে বসিয়ে তার ব্লাউজের মধ্যে লুকানো মুক্তোর মালা টেনে বার করে প্রশ্ন করল, "কে দিয়েছে এটা ?"

"আমার বন্ধুর মালা।"

"সত্যি কথা বল্।"

"সত্যি বলছি, বন্ধুর মালা।"

"কোন বন্ধুর ?"

"পদ্মা।"

"তোকে কেন দিয়েছে ?"

"মা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ? আমায় দুদিনের জন্য পরতে দিয়েছে।"

"সত্যি কথা বল্ শান্তা। তোর বিয়ের চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না। মিথ্যে কথা বলে জীবনে কোনদিন সুখ পাওয়া যায় না তা জানিস ?"

"মিথ্যে কেন বলব মা ? পদ্মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না। তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে আমি চুরি করতে শুরু করেছি ?"

কি বলবে ভেবে পেল না চম্পক্কা। রাগ করার মত শক্তিও নেই তার। স্বামীকে কথাটা জানিয়ে দিলে তিনি কিভাবে কথা বলবেন কে জানে। শান্তা তো এমন জবাব দিল যাতে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। আগের মত শক্তি থাকলে হয়ত মেয়ের গালে দুটো চড় কষিয়ে দিত কিন্তু তেমন শক্তি নেই আর, অসহ্য রাগে সে শান্তার কাছে এসে ওর হাতটা খামচে ধরল।

"মা, মনে হচ্ছে তোমরা দুজনেই একটু একটু করে পাগল হয়ে যাচ্ছ। বাবা তো নিজের মনে বিড় বিড় করে বকে, আর তুমি ছোট বাচ্চার মত আমায় চিমটি কাটছ।"

"ঠিক আছে, আমার ভুল হয়ে গেছে। যাও তুমি বন্ধুর বাড়ি যাও।"

উদ্বেগ কমল না চম্পক্কার। শান্তা চলে যাবার পর ওর মনে হল, বন্ধুর মালাই যদি তবে ব্লাউজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার কি দরকার ছিল ? এরপর থেকে মেয়ের ওপর আরো ভালভাবে নজর রাখতে হবে, স্থির করল সে।

একটা সৌভাগ্য এই যে বসন্তর যাওয়া আসা আজকাল একেবারে কমে গেছে।

35. ফলাফল

আট মাসেই চম্পক্কার প্রসববেদনা শুরু হল। বাড়িতে এসে ডাক্তার তার দুর্বলতা দেখে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। রাঘপ্পা এম্বুলেন্স আনিয়ে স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে এল। মাকে বাড়ি ছেড়ে যেতে দেখে কেঁদে ফেলল শান্তা। ওর কান্না দেখে চম্পক্কা ব্যথার মধ্যেই বলল, "আমি না ফেরা পর্যন্ত কৃষ্ণর মার কাছে গিয়ে থেক।" কিন্তু শান্তা তাতে একেবারেই রাজী নয়। সে বলল, "আমার একটুও ভয় করবে না, আমি বাড়িতেই থাকব।" প্রায় পাঁচ ছ' বছর পরে এই প্রথম বাড়ির বাইরে গেল চম্পক্কা।

প্রতিবেশীর ছেলে ভীমসেনকে ডেকে নিয়ে রাঘপ্পা হাসপাতালে নিয়ে গেল স্ত্রীকে। চম্পক্কার আর্তনাদ শুনে ভয়ে আর করুণায় রাঘপ্পা ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। হাসপাতালের বাইরে বসে শূন্য হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল সে।

ব্যথা বেড়েই চলেছে চম্পক্কার, এ যন্ত্রণা সহ্য করবার মত শক্তি তার শরীরে নেই। ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিলেন এনেস্থেশিয়া দেওয়া হবে কিনা, কিন্তু চম্পক্কা এতই দুর্বল যে তার পরিণাম হয়ত খারাপ হতে পারে এই ভেবে সে প্রস্তাব বাতিল করা হল। কিন্তু চম্পার অবস্থা দেখে লেবার রুমে ডিউটিরত ডাক্তাররা বেশ ঘাবড়ে গেলেন।

যন্ত্রণার মধ্যেই হঠাৎ চম্পক্কা উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগল। নার্স ছুটে এল, ওকে

ধরে শুইয়ে দিতে গেল কিন্তু চম্পক্কা জোর করে উঠে জিজ্ঞাসা করল, "উনি কোথায় গেলেন ?"

নার্স বলল, "বাইরেই বসে আছেন, আপনি চিন্তা করবেন না।"

"শুধু একবার দেখা করতে চাই, একটু ভেতরে ডেকে দাও, শুধু একটা কথা বলতে চাই," চেঁচিয়ে উঠল সে।

যদিও এটা নিয়মবিরুদ্ধ তবু ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে নার্স বাইরে এসে চিন্তাকুল রাঘপ্পাকে ডেকে বলল, "এখনও দেরী আছে। আপনাকে একবার ডাকছেন, আপনি ভেতরে যান।" রাঘপ্পার কান্না পেয়ে গেল। সে ভাবল বুঝি শেষ দেখার জন্য ডাকা হচ্ছে। ভেতরে এসে ফুঁপিয়ে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেন ? কেমন আছো ?"

রাঘপ্পার কান্না-কাটির দিকে নজর না দিয়ে ব্যথার যন্ত্রণা সামলাতে সামলাতে চম্পক্কা বলে উঠল, "তুমি এখানেই বসে আছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কি মাথার ঠিক নেই। বাড়িতে শান্তাকে একলা ফেলে এসেছ ? ভীমকে এখানে রেখে বাড়ি ফিরে যাও। আমার কিচ্ছু হবে না। যদি নেহাতই থাকতে চাও তো শান্তাকে সঙ্গে নিয়ে এস। যাও। না যদি যাও তো আমার মাথা খাবে।" রাগের ঝোঁকে এতগুলো কথা বলে সে বিছানায় হেলান দিয়ে আবার কাতরে উঠল ব্যথায়। রাঘপ্পা ধুতির খুঁটটা মুখে চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল। নার্স ওর জামা ধরে টানতে কোনমতে নিজেকে সামলে বাইরে চলে এল।

"ভীময়্যা তুমি এখানেই থাক, খাবার পাঠিয়ে দেব। কিছু দরকার হলে সাইকেলে এসে আমায় ডেকো, আমি দু এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি"—কথা কটা বলেই বাড়ির পথ ধরল সে।

শান্তা একলা বসে কাঁদছিল বাড়িতে। কিছুক্ষণ পরে ভয়ও করতে লাগল একটু একটু। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। অন্য কারও বাড়ি যেতে ইচ্ছা করল না, পাড়া পড়শীদের কাউকেই ওর বিশেষ ভাল লাগে না। নিজের বাড়িতে একলা বসে ভয়ে কাঁপলেও চিন্তার কিছু নেই। প্রতিবেশিনী কৃষ্ণর মার বাড়ি কিছুতেই যাব না, মনে মনে স্থির করে একখানা উপন্যাস নিয়ে বসল কিন্তু পড়তে পারল না।

এর আগের বার কৃষ্ণর মায়ের বাড়িতে গিয়ে খুব অপমানিত হয়েছে সে। বসন্তর সঙ্গে তার পথে দেখা হওয়ার ঘটনাটা এ কান থেকে ও কান হ'য়ে দু এক মাসের মধ্যেই বেশ মুখরোচক কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সখীরা ন্যাকা সেজে ওকে প্রশ্ন করেছে, মুক্তোর মালাটা কে দিল। সাহসে ভর করে বেশ নির্বিকার ভাব দেখিয়ে সে জবাব দিয়েছে, "বাবা দিয়েছেন, আমার জন্মদিনে।" শান্তাকে ওর সখীরা মনে মনে হিংসা করত, সামনে অবশ্য সে ভাব প্রকাশ করত না তারা। কোন না কোন ছুতায় সবাই একবার করে তাকে মালাটা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। সবাইকে একই উত্তর দিয়েছে সে। অমন সুন্দর মুক্তোগুলি দেখে পর্যন্ত অনেকেই ঈর্ষায় জ্বলে মরছে। কথাটা

ছড়িয়েছে যথেষ্ট কিন্তু শান্তা এতটা জানে না। সে বেশ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এই সাহস কয়েকটি বৃদ্ধার কাছে অসহ্য ঠেকছে। সবাই নিজের নিজের মেয়েকে সাবধান করে দিয়েছেন। সারাবাঈ তো মুখ ফুটে বলেই দিয়েছেন, "আরে ও হল চম্পার মেয়ে, যে সে মেয়ে নয়।"

কৃষ্ণর মায়ের মেয়ে মন্দাকিনীর সঙ্গে শান্তার খুবই সখ্যতা ছিল। এ বন্ধুত্ব কিছুতে ভাঙতে না পেরে কৃষ্ণর মা এক অন্য রাস্তা ধরেছেন।

সেদিন কৃষ্ণর মায়ের বাড়ি ফুল আর পানসুপারি দেবার উৎসব ছিল। অনেক আগে থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শান্তাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছে কৃষ্ণর মা। তিন ঘণ্টা পরিশ্রম করে গৌরীমণ্ডপ সাজিয়েছে শান্তা। যখন অনেক মহিলা এসে পৌঁছেছেন, বাড়ি লোকজনে ভরে উঠেছে দেখে ব্লাউজের ভেতরে লুকানো মালাটি বার করে গলায় পরেছিল শান্তা, সবাইকারই নজর পড়েছিল তার ওপর। কৃষ্ণর মা তাই দেখে অন্য মহিলাদের চোখের ইশারায় চুপ করতে ব'লে, মণ্ডপের পাশে বসা শান্তার কাছে এসে বললেন, 'বাঃ এই তো এবার খাসা মানিয়েছে। 'গৌরী মা' মণ্ডপের মধ্যে না বাইরে বোঝবার উপায় নেই। মুক্তোগুলি যেন শান্তার গায়ের রঙের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, কি বল গো তোমরা ?" সব মহিলারা একবাক্যে বললেন, 'তা সত্যি, চম্পক্কার মেয়েদের রঙের খুব জেল্লা আছে।' শান্তা লজ্জা পেয়ে কপট বিনয়ে বলে উঠল, "আহা কি যে বলেন। এগুলো কালচার মুক্তো, আসল নয়।"

মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ আর হাসি চাপতে পারলেন না। কেউ বললেন 'এবার চলি ভাই।' কেউ মুখ বেঁকালেন। তামাশাটা সবাই বুঝেছেন তবে গোলমালের ভয়ে অনেকেই মুখ বুজে রইলেন।

শান্তা ঝড়ের মত ফিরে এল বাড়িতে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কিছুতেই পাড়ার কারও বাড়ি যাবে না। বাজার থেকে উল আর রেশম কিনে এনে অনাগত ভাই-এর জন্য পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করে আর উপন্যাস পড়ে সময় কাটাতে লাগল সে।

সব কিছু অনর্থের মূল বসন্ত। এখন অবশ্য সেও আর আসে না। মনে মনে শান্তা তার ওপর খুব চটেছে, এবার এলেই মালাটা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতে হবে। গত পনেরো দিন ধরে তারই জন্য পথ দেখছে সে। গলায় মালাটা যেন কাঁটার মত ফুটছে। মাসখানেক হয়ে গেল এ পথ মাড়ায় নি বসন্ত।

হঠাৎ আজকের দিনেই বসন্ত এসে হাজির। অনেকদিন শান্তাকে না দেখে মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল। বাপের সামনে বিয়ের কথা বলতে না পারায় বসন্ত আজকাল এদিকে আসা ছেড়ে দিয়েছে। চম্পক্কার শরীর খারাপের খবর শুনে ভেবেছিল এই ছুতোয় একবার শান্তার মুখখানি দেখে আসা যাক।

দরজা ভেজানো রয়েছে, ভেতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বসন্ত ভাবল সবাই চম্পক্কার ঘরেই আছে তাই সেও সোজা মাঝখানের ঘরে এসে প্রবেশ করল।

বসন্তকে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকতে দেখে শান্তা প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। চম্পক্কার হাসপাতাল যাবার খবরটা দিয়ে সে এতদিন না আসার জন্য জমে থাকা রাগ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। যা ঠিক করে রেখেছিল সেইভাবে হারটা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। এই হারের জন্য কত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাও বলতে চেষ্টা করল ছাড়া ছাড়া ভাবে দু চার কথায়।

বসন্ত ক্ষমা চেয়ে একেবারে ওর পায়ে পড়তে যায় আর কি। এমনভাবে সে স্তব স্তুতি শুরু করল যেন বিয়েটা হয়েই গেছে। ভগবানের পায়ে দেবার ফুল ওরই পায়ের নির্মাল্য হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকে ফিরছিল রাঘপ্পা। বাড়ি থেকে সে যখন প্রায় এক ফার্লং দূরে তখন দেখতে পেল বসন্ত বেরিয়ে আসছে তার বাড়ি থেকে। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল তার। দুপুর বেলার চাঁদিফাটা রোদ্দুরে জোর কদমে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল সে। প্রায় ছুটতে ছুটতেই ঢুকল এসে বাড়িতে। মাঝের ঘরে ভীত ক্লান্ত শান্তা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। তাকে দেখেই রাঘপ্পা 'হতভাগী' বলে চিৎকার করে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল তারপর অন্ধের মত মেয়ের গালে আর পিঠে চড় চাপড় বর্ষণ করতে শুরু করল। শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে, মুখে বলল "হতচ্ছাড়ি, তুই আমায় শেষ করে দিলি।"

ইতিমধ্যে দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ। দেখা গেল ভীমসেন, রাঘপ্পাকে দেখেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "মামী নেই।" টাঙ্গা নিয়ে তৎক্ষণাৎ রাঘপ্পা ছুটল হাসপাতাল। প্রসবের সময়ই তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তার নাড়ী ছেড়ে যাবার পর সন্তান প্রসব হয়েছে। ছেলে হয়েছিল, কিন্তু মৃত।

নির্বিকার মুখে রাঘপ্পা স্ত্রী এবং পুত্রের অন্তিম সৎকারের সব ব্যবস্থা করল। সান্ত্বনা দিয়ে যাঁরা ওকে বলতে এসেছিলেন, 'আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি' তাদের কথা যেন ও শুনতেও পেল না। শিশুর শবদেহ কোলে নিয়ে স্ত্রীর শবযাত্রার পেছন পেছন গেল হাসপাতাল থেকে শ্মশান পর্যন্ত।

সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য দেসাঈজী স্বয়ং এসেছিলেন কিন্তু তাঁর আসার আগেই রাঘপ্পা শবদেহ বহনের খাট ইত্যাদি যোগাড় করেছে এবং যাকে যাকে খবর দেবার কথা তাদের সবাইকেই খবর পাঠিয়েছে। চম্পার শবযাত্রায় কাঁধ দেওয়া ছাড়া দেসাঈজীর আর কিছুই করার ছিল না।

কি কর্তব্য বুঝতে না পেরে বসন্তরাওও অন্তিম দর্শনের জন্য হাসপাতালে গিয়েছিল। রত্না আর শান্তা আকুল হয়ে কাঁদছে, ওদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেণুবাঈও কেঁদে ভাসালেন। গঙ্গব্বা মনের জোরে এগিয়ে এসে ওদের দু বোনকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি তো আছি, আমিই তোমাদের মা হব।' গভীর শোকের অনুভূতি ছাড়া আর কোন বোধ এখন গঙ্গব্বার নেই। ভাইকেও সে অনেক সান্ত্বনা দিল। রাঘপ্পা চুপচাপ সব শুনে গেল। আর কোন সান্ত্বনারই প্রয়োজন নেই তার।

36. দেসাঈয়ের নামে একটি চিঠি

দ্বিতীয় দিন রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ কিট্টী শোকসন্তপ্ত গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়িতে শুতে যাবার উদ্যোগ করছিল এমন সময় রাঘপ্পা ডাকল ওকে। বহুক্ষণ ধরে নিজের ঘরে বসে কি যেন লিখছিল রাঘপ্পা। কিট্টীর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে সে বলল, "কাল সকালে এই চিঠিটি দেসাঈজীকে অতি অবশ্য দিয়ে দেবে। এখন নিশ্চয় তিনি শুয়ে পড়েছেন, ঘুম ভাঙাবার দরকার নেই, কাল সকালে দিও।"

সে রাতে বহুক্ষণ কিট্টীর ঘুম এল না। সবাই রাঘপ্পাকে ছি ছি করছে। কিট্টীরও তার সম্বন্ধে ধারণা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। তাছাড়া একটা ভয়ও ঢুকেছে মনে। ওর মনে হচ্ছে পাপ করলে তার শাস্তি এই দুনিয়ায় এই জন্মেই ভোগ করতে হয়। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তা দেখার পর ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হল। উঠে মুখ হাত ধুয়ে চিঠিখানা দেসাঈজীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই সে দ্রুতপদে চলল রাঘপ্পার বাড়ি। কিন্তু মাঝপথেই দেসাঈজী টাঙ্গায় করে এসে ওকে থামালেন, বললেন, "ওখানেই যাচ্ছি, এই টাঙ্গায় উঠে এসো।" কিট্টী একটু অবাক হয়ে টাঙ্গায় উঠল। ওরা যখন এসে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় ন'টা। বাড়ির সামনে অনেক লোক জমা হয়েছে, ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে স্ত্রীকণ্ঠের রোদন-ধ্বনি। দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে এক পুলিশ।

রাত্রে রত্না একবার কাতরানির আওয়াজ শুনেছিল কিন্তু ওর শাশুড়ী ঘুমের মধ্যে কথা বলেন, সে রকম শোনা ওর অভ্যাস আছে। তাছাড়া শোকের বাড়িতে একটু ভয় ভয়ও করছিল তাই সে আর ওঠেনি। অন্যেরা তো ক্লান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে। গঙ্গব্বা প্রতিদিনের মত উঠেছে ভোর ছ'টায়, উঠে দেখেছে ভাইয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে ডাকাডাকি করেনি। বেলা আটটা পর্যন্ত রাঘপ্পা ওঠে নি দেখে গঙ্গব্বা রত্নাকে বলে তাকে জাগিয়ে দিতে। ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। অনেকবার ধাক্কা দিয়েও দরজা খুলল না তখন ভীমসেনকে ডেকে পেছনের জানলায় চড়ে দেখতে বলা হল। জানলার কাঁচের রং লাল, তাই ঘরের ভেতর কিছুই দেখা যায় না। রত্না তাকে কাঁচ ভেঙে ফেলতে বলে। কাঁচ ভেঙে ভীমসেন দেখে রাঘপ্পার দেহ কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। সে চিৎকার করে জানলার ওপর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। দেখতে দেখতে সারা পাড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল আর লোক জমা হতে শুরু হল বাড়ির চারদিকে।

পুলিশ এসে তখনি তদন্ত শুরু করে। মৃতের পকেট থেকে একটি চিঠি পাওয়া গেছে—

> "আমি, রাঘবেন্দ্র বামন বিন্দুগোল এই চিঠিতে সকলকে জানাচ্ছি যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুতে এবং অন্যান্য চিন্তায় জীবনে বিতৃষ্ণা বোধ করে, পাপ পুণ্য বিচার না করে স্বেচ্ছায় নিজের ঘরের কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করছি। আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এ কাজ করছি, এর জন্য অপর কেউ দায়ী নয়।

অপর কাউকে যেন দায়ী না করা হয়। কেউ যেন দুঃখ না করে। আমার সংকারের খরচের জন্য এই গলির মোড়ে কাঠের দোকানের মালিকের কাছে আমি পনেরো টাকা দিয়ে রেখেছি, তার রসিদ এই চিঠির সঙ্গে রইল। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল আমি পাগল হয়ে যাব। এইজন্য তিন মাস পূর্বে আমি একটি উইল করেছি। আমি শপথ করে জানাচ্ছি এইটিই আমার যথার্থ আইনসঙ্গত উইল। উইল সিন্দুকের মধ্যে আছে এবং তার চাবীও এখানে রইল। সিন্দুকে একশত পঁচাত্তর টাকা আট আনা ছয় পয়সা জমা আছে। সিন্দুক, উইল এবং ঐ টাকা আমার জামাই শ্রীকৃষ্ণজী স্বামী-রায় কুলকর্ণীর জিম্মায় থাকবে। ঐ টাকায় আমার স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা হবে। সেই আমার সব কিছুর উত্তরাধিকারী। কোন রকম মাদকদ্রব্য সেবন না করে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি এ চিঠি লিখছি।"

চিঠির নিচে রাঘপ্পার স্বাক্ষর এবং আগের দিনের তারিখ দেওয়া। কাঠের দোকানের রসিদেও সেই একই তারিখ। দোকানদার বলল, "রাঘপ্পাজী টাকা দিয়ে বলেছিলেন আগামীকাল দু গাড়ি কাঠ চাই। আমি ভাবলাম সারা বছরের কাঠ কিনে রাখছেন বুঝি। যখন বলবেন তখনই পাঠিয়ে দেব।" রাঘপ্পার চিঠির জন্য পুলিশ অল্পেই রেহাই দিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ভেঙে ঢুকতে হয়েছে কাজেই কারও ওপরই সন্দেহ করার কিছু নেই।

কিট্টী দেসাঈজীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তিনি বললেন, "তুমি যে চিঠি এনেছিলে সেটা দেখাব তোমাকে। এখন এখানে সে সব কথা তুলো না, আরো বিপদ বাড়বে তাতে।"

স্ত্রীর মৃত্যু এবং অন্যান্য চিন্তাই আত্মহত্যার কারণ বলে লিখে নিয়ে পুলিশ কিট্টীর হাতে মৃতদেহ ছেড়ে দিল। শব দেখে দেসাঈজী বললেন, "মেয়েদের আর এ দৃশ্য দেখিয়ে কাজ নেই।"

কিট্টীও একবার মাত্র ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখেছিল। সেই সুন্দর মুখে ঠোঁট দুটি এমনভাবে চাপা যেন এখনি লড়াই করতে প্রস্তুত। একটি চোখ অন্যটির চেয়ে বেশী ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। শবের কাছে কাউকে যেন আসতে না দেওয়া হয় কিট্টীকে এই নির্দেশ দিয়ে দেসাঈজী অন্য ব্যবস্থায় লেগে গেলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই শব শ্মশানে পৌঁছে গেল।

বারোদিন কেটে যাবার পর কিট্টীকে নিজের বাড়িতে ডেকে দেসাঈজী রাঘপ্পার চিঠিখানি পড়তে দিলেন।

শ্রী ধারবাড়

ক্ষেম

শ্রীমান বাহাদুর দেসাঈজীর চরণে রাঘপ্পার ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আপনাকে ভালবাসি বলেই দু একটি কথা জানাচ্ছি। আমি পরাজিত হতে ভয় পাই। আমি এইটুকুই জানাতে চাই যে আমি আপনার কাছে হেরে যাইনি। আপনার পুত্র অচ্যুতের লেখা পত্র আমার কাছে

পাঠিয়ে আপনি আমায় ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যদি ভেবে থাকেন আমি তাতে ভয় পেয়েছিলাম তবে ভুল ভেবেছেন। একথা আমি প্রমাণ করে দেখাব। আপনি যদি আমায় খারাপ লোক ভাবেন তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। আমি আমার পথেই চলব। কিছুমাত্র অনুতাপ না করে, পাপপুণ্যের সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এখন আমি নিজ কৃতকর্মের দিকে চেয়ে দেখছি। আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আজ হারিয়ে ফেলেছি এইটাই আমাকে আজ দুঃখ দিচ্ছে। যেদিন থেকে বিবেকদংশন অনুভব করেছি সেদিন থেকেই বুঝেছি আমার শক্তি অর্ধেক হয়ে গেছে। আগের মত নিঃশঙ্ক চিত্তে যদি কাজ করে যেতে পারতাম তাহলে হয়ত অনেক কিছু ঘটনাই অন্যরকম হত। যখন আমার মধ্যে বিবেক বোধ জেগেছে সেই সময়ই অচ্যুতের পত্রের মধ্য দিয়ে আপনি অতীত স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন আমার মনে, এই ভাবেই আমাকে কাবু করতে চেষ্টা করলেন আপনি। আমি যদি সেই আগের রাঘপ্পা থাকতাম তাহলে ও চিঠির আমি পরোয়াও করতাম না। পরোয়া এখনও করি না, তবে ঐ চিঠিতে নিজের ছবি দেখে কিছুটা অনুতাপ হয়েছে, এইটুকু মাত্র বলতে পারি। এ ছাড়া ও চিঠির আর কিছুই গুরুত্ব নেই।

ইচ্ছা করলে আপনি পুণায় গিয়ে দশ বছর ধরে তদন্ত করতে পারেন কিন্তু আমার ক্ষতি করার মত কোন প্রমাণই আপনি খুঁজে পাবেন না। সত্যি কথাটা আমিই আপনাকে লিখে দিচ্ছি, তাহলেই বুঝবেন আপনাকে ভয় করে চলবার আমার কোন কারণই নেই। আমার দোষের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গুণের পরিচয়ও এ থেকে আপনি পাবেন।

আমাদের পৈতৃক জমি সবটাই বাঁধা পড়েছিল। আমরা ধারবাড়ে কোনমতে দু চার ক্লাস লেখাপড়া করেছিলাম। এখানে চাকরী না পেয়ে পুণায় বেঙ্কটের কাছে গিয়েছিলাম সে খবর তো অচ্যুতের চিঠিতেই জেনেছেন। তার দু বছর পূর্বে আমার বিবাহ হয়েছে। কোন কারণে (কারণটা সম্ভবত আপনার জানা আছে) চাকরী পাবার আগেই আমাকে বিবাহ করতে হয়। বিয়ের বছরেই রত্নার জন্ম হয়। আমার রোজগার তখন প্রায় কিছুই নেই। এই দৈন্যদশার মধ্যেই পুণায় যাই চাকরীর সন্ধানে। ব্যাঙ্ক অফিস সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করলাম, কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে এক সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু কোথাও কোন আশা পাওয়া গেল না। বেঙ্কটের মত চৌকিদারী চাকরী করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেঙ্কট চেক ভাঙিয়ে আনার পরের দিন সকালে সংবাদপত্রের এক কোণে তাজিমুদ্দিন ড্রাইভার সম্বন্ধে ছোট্ট একটা খবর আমার চোখে পড়ে। খবরে ছিল, গতকাল লক্ষ্মীরোডে এক বৃদ্ধকে গাড়িচাপা দেওয়ার অপরাধে পুলিশ তাজিমুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে। বেঙ্কটরায় খবরের কাগজ পড়ে না। ভুলেও যদি কোন দিন কাগজে চোখ বোলায় তবু এক কোণে অতটুকু ছোট্ট খবর তার নজরে পড়বে না নিশ্চয়। সুতরাং বেঙ্কট দুর্ঘটনার খবর জানতেই পারবে না খুব সম্ভব। সুযোগ বুঝে কাজ হাসিল করতে হলে সাহস করে ঝুঁকি নিতে হয়। আমিও এমন সুযোগ বৃথা

যেতে দিলাম না। বেঙ্কট যখন পূজায় বসেছে সেই সময় গিয়ে 'তাজিমুদ্দিন এসেছে' বলে চাবী চেয়ে এনে দু হাজার টাকা বের করে নিলাম। আপনাকে কোনদিন নিজের চোখে স্ত্রী আর সন্তানের উপবাসের যন্ত্রণা দেখতে হয়নি, কিন্তু যাকে সে যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে সে যদি ঐ ভাবে চুরি করে তাকে হীন ভাবা উচিত নয়।

কিন্তু চেকটা যে জাল হতে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি আর বেঙ্কট তো ও কথা ভুলেই গিয়েছিল। আমি ধারবাড়ে ফিরে এলাম। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই বেঙ্কটের চিঠিতে খবর এল চেকটা জাল ছিল তাই বেঙ্কটকে জেলে যেতে হয়েছে। বেঙ্কটকে বাঁচাবার জন্য পুণা যেতে হবে, কোনমতে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে জামিনের কাগজপত্র তৈরী করালাম। আমার ভগ্নীপতি সাহস করে জামিন দাঁড়ালেন। আমার তো জামিন হওয়ার সাধ্য ছিল না। কারণ আমার জমিজমা সব বাঁধা রয়েছে। আমার কাছে সেই দু হাজার টাকা তেমনিই রাখা ছিল। স্বামীরায়কে সঙ্গে নিয়ে পুণা গিয়ে বেঙ্কটকে ছাড়ালাম। স্বামীরায় তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিলেন। তিনজনে ফিরে এলাম ধারবাড়ে। স্বামীরায়ের নজরবন্দীতে থাকার জন্য বেঙ্কট ওঁর বাড়িতেই বাস করতে লাগল।

মুখে সাহস দেখালেও বেঙ্কটের পাগলাটে স্বভাবের জন্য স্বামীরায় মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন, তাই আমাকে না জানিয়ে বেঙ্কটকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার দায়িত্ব নিয়েছি, তোমার ভাগের সম্পত্তি আমার নামে লিখে দাও।' আপনি যে দানপত্র দেখেছেন সেটি প্রস্তুত করিয়ে তিনি বেঙ্কটকে সই করতে বলেন, কিন্তু বেঙ্কট জিদ ধরে বসল আমার ভাই যদি সই করে তবেই আমি সই করব। তখন আমাকে ডেকে স্বামীরায় বলেন, 'তোমাদের সম্পত্তির লোভে নয় কিন্তু বেঙ্কটের স্বভাবের জন্যই আমি একটা দানপত্র করিয়ে রাখতে চাই। পাঁচ হাজার টাকা কিছু কম নয়। কথাটা আমারও যুক্তিসঙ্গতই লাগল। আমি সই করে দিলাম। তাই দেখে বেঙ্কটও সই করল।

এরপরও বেঙ্কটের কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না। সে এক অদ্ভুত মানুষ। হঠাৎ তার সম্পত্তির ওপর দারুণ লোভ দেখা দিল। 'আমার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে', এই বলে দিনরাত ঝগড়া শুরু করল। আপনার ছেলে যেমন লিখেছে, আমিই হয়ত বেঙ্কটকে দানপত্রটা চেয়ে আনতে বলেছিলাম, সেকথা ঠিক নয়। কিন্তু একদিন সত্যিই রাগের বশে স্বামীরায় প্রতিলিপি মনে করে মূল দানপত্রখানাই বেঙ্কটের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেন। সে ওটা নিয়ে আমার কাছে এল এবং উকিল ডেকে ব্যবস্থা করে ওর সম্পত্তি ওকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আমায় উত্যক্ত করতে লাগল। 'আচ্ছা, কাল উকিলের বাড়ি যাব', বলে কোনমতে শান্ত করলাম তাকে। কাগজখানা দেখেই আমি বুঝেছিলাম ওটা প্রতিলিপি নয়, আসল দানপত্র। বিস্ময়ের বশে অথবা বেঙ্কটের পাল্লায় পড়ে জ্বালাতন হয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাকে তো আসল দানপত্রখানাই দিয়ে দিয়েছে। এটা আর

ফিরিয়ে দিও না। তোমার সম্পত্তি তোমারই থাকবে'। মনে হল কথাটা শুনে সে একটু স্বস্তি পেল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আমারই দুর্ভাগ্য যে তাকে সেদিন আমার বাড়িতে খাইয়ে এখানেই শুতে দিলাম। রাত্রে গ্রাম থেকে লোক এসেছিল, তারা দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। বেঙ্কট তাই শুনেই, 'এই রে আমায় ধরতে পুলিশ এসেছে' বলেই খিড়কী দরজা দিয়ে চম্পট দিল। আমি ভাবলাম, কোথায় আর যাবে, কাছাকাছিই আছে। কিন্তু সে দিনের পর, আপনার ছেলের চিঠিতেই প্রথম তার খবর পাওয়া গেল।

বেঙ্কটের বিষয় কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা বলা কঠিন। সত্যি সে পুলিশের ভয়েই পালিয়েছিল না, আসল দানপত্রটা পেয়ে গেছে বলে, এটা আজও আমি বুঝতে পারি না। দুটোই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার ফলে আমার বোনের সংসার ভেঙে গেল, সে বিধবা হল, আর সমস্ত বদনাম এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। যদি ভগ্নীপতির সর্বনাশ আমি নিজেই করতাম তাহলে আমার দুঃখ হত না। সেই যে গল্প আছে, সন্তানের মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে মা ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠে দেখে দমবন্ধ হয়ে শিশু মারা গেছে ?...আমার অবস্থাও দাঁড়াল কতকটা সেই রকম। যখন এত কাণ্ড ঘটল তখন আমার কিছুই করার উপায় নেই। সেই দু' হাজার টাকার কুকর্ম আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে। স্বামীরায়ের সঙ্গে সদ্ভাবও নষ্ট হয়ে গেল মাসখানেকের মধ্যেই। তারপর মনের কষ্টে গুম্‌রে গুম্‌রে তিনি মারা গেলেন। সংসার তো আগেই উজাড় হয়ে গেছে। আমি ঐ দু হাজার টাকায় কিছু করতে চেয়েছিলাম কিন্তু গঙ্গব্বা আমাকে দেখলেই কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। বেঙ্কট আমার বাড়ি থেকেই ফেরার হয়েছে এইটাই গঙ্গব্বার বিদ্বেষের প্রধান কারণ।

বোনের কাছে মুখ দেখাতে হবে না ভেবে আমি গ্রামে বাস করতে চলে গেলাম। ক্ষেত খামার ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যবসায় শুরু করলাম। সংসারের অবস্থা ফিরে গেল। জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কোন কিছুতে হার স্বীকার করব না জীবনে। যে কাজই হাতে নিই না কেন, তা যেমনই হোক, নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে। কার্যসিদ্ধির জন্য হারজিত, ভয়ডর, শর্ত শপথ কোন কিছুই মনে রাখবার দরকার নেই। সেই জন্যই কোন কাজ করতে গেলে আমি সুনীতি দুর্নীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। নির্বিকার ভাবে কাজ হাসিল করাই আমার জীবনের নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই 'ভরারী' উপাধি পেয়েছিলাম আমি।

ধারবাড়ে ফিরে এসে বহু চেষ্টা করে কৃষ্ণর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলাম। অনেক উদ্দেশ্য ছিল, তার মধ্যে একটা, গঙ্গব্বার সঙ্গে আবার আগের মত সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু ওর জিদ আর অহঙ্কার যেন আমার কুবুদ্ধিকে লড়াইয়ে নেমে পড়তে আহ্বান জানাতে লাগল। ওর তিরস্কার শুনে আমারও জিদ চেপে গেল। ওর আপত্তি লংঘন করে বিয়েটা দিলাম। সে বিবাহে আপনাকেও জড়িয়ে ফেলেছিলাম। কখনও কি আপনার মনে হয়নি ঐ ব্যাপারটায় আপনি ঠকেছেন আমার কাছে ?

এবার আমার দ্বিতীয় পরাজয়ের কথা। বরদক্ষিণার টাকা কম পড়বে তা আমি

জানতাম। কৃষ্ণর টাকা আপনার কাছে জমা আছে একথা জানবার পর স্থির করেছিলাম পাঁচশ' টাকা আপনার কাছ থেকেই বার করব। আপনাকে সে ফন্দীতে যদিও ফাঁসানো গেল না কিন্তু ফন্দীটার জন্য আপনি আমাকে প্রশংসা করতে বাধ্য। তবে করতে গেলাম এক, আর হয়ে গেল আর এক। আমার অজান্তেই আমার এক প্রিয়জন ঐ পাঁচশ' টাকার ঘাটতি পূর্ণ করতে গিয়ে নিজেকে কালগ্রাসে সঁপে দিল। সে বেদনা এখনও ভুলতে পারিনি। আমার পতনের পূর্বে এই দ্বিতীয় পরাজয় আমাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেছে। না হলে আমি হয়ত অনেক কিছুই করতে পারতাম। আপনার মত সম্মানিত ব্যক্তি মহবুবের মৃত্যুর দুঃখ ঠিক বুঝতে পারবেন না, কিন্তু সেই শোক তিন মাসের মধ্যে আমার বার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। আমি যেন অন্য এক রাঘপ্পা হয়ে গেলাম, আমার দৃঢ়মুষ্টি ঢিলে হয়ে পড়ল।

জলে পাথর ছুঁড়ে যদি ঢেউগুলোকে আমার দিকে আসতে আদেশ করি তারা কি কথা শুনবে আমার? কবির ভাষায় কথা বলছি নাকি? কিন্তু আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা ও কৃতকর্মের ফল দেখে গত চার বছর ধরে এই প্রশ্নটাই আমার মনে জাগছে কেবল। কিছু করতে যাই, কিন্তু হয়ে যায় অন্যরকম। এর জন্য দায়ী কে, ফল ভুগতে হচ্ছে কাকে। আমি শাস্ত্র আওড়াচ্ছি না, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা এখন বেদান্ত দর্শনের দিকেই চলেছে বলতে পারেন। মনটা আমার এত দুর্বল হয়ে পড়েছে বলেই সমস্ত পুরাতন কথা মনে প'ড়ে দুঃখ বোধ করছি। আর শক্তি নেই আমার। শরীর এখনও অশক্ত নয় কিন্তু লক্ষ্যস্থির করে শরসন্ধান করবার সেই একাগ্রতা দিন দিনই হ্রাস পাচ্ছে। আর একটা নতুন অনুভূতি শুনুন, কাজে আমার আলস্য নেই, কিন্তু আজকাল ভয় পেতে শুরু করেছি। এক করতে, আর হয়ে গেলে তার জন্য দায়ী কে হবে? এই প্রশ্নই দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে মনে তাই কাজ করতে গিয়ে আগেই অপ্রত্যাশিত পরিণামের আশঙ্কায় কেঁপে উঠি। কিন্তু কাজ কি তাই বলে ছেড়ে দেব? কাজ তো করে যেতেই হবে। কাজেই বেশী ভেবে চিন্তে কাজে হাত দেওয়া ছেড়েই দিলাম, বরং যা চলছে সেই প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলাম বলতে পারেন। কিন্তু এখনও মনের মধ্যে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিচ্ছে। বোন পাছে সম্পত্তি পেয়ে যায় এই ভয়ে স্ত্রীর জীবন বাজি রেখে পুত্রলাভ করার চেষ্টা করলাম। জিতেই তো গিয়েছিলাম, কিন্তু দৈব আমার বিরুদ্ধে লেগেছে তাই সব আশা সমূলে বিনষ্ট হল।

বড় অসময়ে আপনি চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাতেও আমি ভয় পাইনি। শুধু পুরানো স্মৃতি আমাকে ভীতু করে তুলেছে। আমার কৃতকর্মের পরিণাম আমার আশা অনুযায়ী হচ্ছে না এতেই আমি ভয় পেয়েছি। আমার বোন যেদিন না খেয়ে আপনার বাড়ি চলে যায় সেদিন আমি মেয়েকে যে আপনার বাড়ি পাঠিয়েছিলাম সেটা আপনার আদেশের ভয়ে নয়। গঙ্গম্বার জন্য আমার মত মানুষও বেদনা অনুভব করে বলেই। তার কষ্ট অনেক দেখেছি কিন্তু সে উপোস করে রয়েছে এটা আমি সহ্য করতে পারলাম না।

আমার শেষ পরাজয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু। মনে হচ্ছে ঈশ্বর যেন কখনও কখনও দুর্বুদ্ধির মধ্য দিয়েই সুবুদ্ধির জাগরণ ঘটান। আমার স্ত্রীকে আমি নানা ভাবে ভালবেসেছিলাম কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন আরো হাজার গুণ বেশী ভালবাসা যেতে পারত। কত অন্যায় করেছি তার ওপর, সে মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সয়ে অবশেষে বিদায় নিয়েছে। এখন আমার মত মানুষের মনেও বেদনা, মায়া, মমতার জোয়ার ফুলে ফুলে উঠছে। এই বেদনা, এই করুণার সীমা পরিসীমা নেই, সমুদ্র লহরীর মতই এ উচ্ছ্বসিত, অনন্ত। সাধুসন্ত্রা বুঝি এমনি করেই ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যান। অজস্র অশ্রু বিসর্জনেও এ প্রেমনির্ঝর যেন কখনও শুষ্ক হবে না। সমস্ত দেহবাসনার ঊর্ধ্বে এ প্রেম। আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি আমার সেই চিরপরিচিত পত্নীর প্রতি এমন অপার অনন্ত প্রেমের অনুভূতি আমার মনে জন্ম নেবে। এককালে ক্ষণিক সুখের মাশুল দিতেই আমাকে বিবাহ করতে হয়েছিল ।

এবার শেষ কথা। আপনার পুত্র বসন্ত দৃঢ়চেতা নয়। মার খেয়ে সে ভয় পেয়েছে। আপনার ছোটখাট ক্ষতি করে আমার তৃপ্তি হয়নি। বসন্তর যদি সাহস থাকত তাহলে আসল কেরামতি দেখতেন। আপনার চোখের সামনেই আমি তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতাম ও ছেলের সঙ্গে আপনার সম্পত্তির অংশ নিয়ে লড়াই বাধিয়ে আপনাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতাম। কিন্তু আপনার বসন্তর মত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে লড়াইয়ে নামা আমার উচিত হয়নি।

বসন্তর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যেদিন আমার স্ত্রী হাসপাতালে যায় সেদিন বসন্ত সেই সুযোগে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল। এ খবর অল্পদিনেই সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই। তবু এ সম্বন্ধে আমি আপনাকে কোন অনুরোধ করছি না। এতদিন আমি আপনার শত্রুতা করেছি, এবার আপনি সুযোগ পাবেন। শান্তার নিজেরও দোষ আছে। আমিও আমার স্ত্রীর সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করেছি, কিন্তু সেও আমাকে ভালবাসত। আমার স্ত্রী এবং আমার কন্যাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একে নিজের অবিবেচনার ফল ভুগতেই হবে। ইচ্ছা করলে আমার কাছে চলে আসতে পারে, আমার উদাহরণ রেখে যাচ্ছি।

আজ রাত্রি আড়াইটার সময় আমার কাজ শেষ হবে। তার আগে কোথাও যদি আমার পরাজয় হয়েই থাকে, সে আপনার কাছে নয়, এ কথা স্পষ্ট করে বলে যাচ্ছি। এই আমার শেষ কাজ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন।

আপনার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী—রাঘপ্পা।

37. উপসংহার এবং অচ্যুতের তৃতীয় পত্র

রাঘপ্পার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে কিট্টীর বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। রাঘপ্পার উইলে স্পষ্ট লেখা ছিল, 'যদি পুত্র হয় তাহলে তো কোন প্রশ্নই উঠবে না, যদি কন্যাসন্তান হয় তবে দত্তক নিই বা না নিই, সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণই পাবে। তাকেই দত্তক নেবার বাসনা, কিন্তু তার পূর্বেই যদি পাগল হয়ে যাই এবং ফলে দত্তক নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলেও সম্পত্তি কৃষ্ণরই হবে। এ ছাড়া, বেঙ্কটরায়কে তার অংশ দিয়ে দিতে হবে, শান্তার বিবাহ দিতে হবে এবং যে সন্তান জন্মাবে তাকে পালন করতে হবে, এসব কথাও উইলে উল্লিখিত ছিল। স্ত্রী যদি বেঁচে থাকে তারও ভার নিতে হবে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপদেশ মত কিট্টী এক মাস রাঘপ্পার বাড়ি খালি করে, শান্তাকেও নিজেদের কাছে এনে রাখল তারপর রাঘপ্পার বাড়িতে গ্রহশান্তির পূজা করিয়ে সেখানে এসে বসবাস আরম্ভ করল। এইসব ভয়াবহ ঘটনাবলী কিট্টীর মনের ওপর যেন হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিয়েছে। তার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। সে হঠাৎ ভীষণ কাজের লোক হতে চেষ্টা করছে। পুরোহিতরা সশব্দে বহুক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণ করে গ্রহশান্তি করলেন, গৃহে শান্তি স্থাপিত হল। কাজটা সুসম্পন্ন করে কিট্টীও খুব প্রসন্ন হল। বেশী গভীরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা তার নেই। আজকাল সিনেমার পরিবর্তে কীর্তন আর পুরাণ কথার আসরে যেতে শুরু করেছে। মাসে দু মাসে বাড়িতে সত্যনারায়ণ দেয়। চায়ের দোকানের আড্ডা একদম বন্ধ। জর্জের সঙ্গে বন্ধুত্বেও বেশ ভাটা পড়েছে। তার বাড়িতেও চা খেতে যায় না। চুল ছোট করে ছেঁটে টিকি বাড়াচ্ছে এখন কিট্টী। দেড় আনা পয়সায় মারাঠিতে লেখা 'শালিগ্রাম মহিমা' বই কিনে এনেছে, রোজ সেটি পাঠ করে শালগ্রাম শিলার পুজো করে। প্রতিদিন আধঘণ্টা সময় বাঁধা সন্ধ্যাবন্দনার জন্য। এই সবের জন্য বেশ উৎসাহ বোধ করছে মনে। বাড়িতে তার পূজোপাঠের ঘটা দেখে সবাই বেশ খাতির করে চলছে। আপিসে আড্ডার মাত্রা কমে যাওয়ায় কাজকর্মও চলছে ভালভাবে। যা আগে বেজায় শক্ত লাগত সে সব কাজ ও আজকাল নিজেই বুঝে নিতে পারে। হাতে পয়সাকড়ি জমছে। বেদপাঠের প্রভাবেই বোধ হয় মুখে চোখে বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য এসেছে। শরীরটাও সেরেছে। এতদিনে যেন কিট্টীর জীবনে একটা সবদিক থেকে ভারসাম্য এসেছে।

নিজের স্বভাব এখন নিজেই বুঝেছে কিট্টী। সবদিকেই সে নিতান্ত সাধারণ, এবং এই সাধারণত্বকে ছাড়িয়ে আরো ঊর্ধ্বে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আরো কুড়ি বছর পরেও তার মধ্যে নতুন কোন পরিবর্তন দেখা যাবে না।

রত্নার মূল্য যেন আরো কমে গেছে। মা বাবা দুজনকে হারাবার পরও 'আমি কি তোর মা নই ?' এমন কথা বলে তাকে বুকে টেনে নেবার মানুষও আছে এইটা বুঝেই সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। 'রাত্রে শোবার আগে এখন সে দুধের বাটি নিয়ে শাশুড়ীকে সাধাসাধি করে। স্বামীকে সবাই খাতির করছে দেখে সে আজকাল তাকে খুব শ্রদ্ধা

করে। কিট্টী এখন শুধু পতি নয়, প্রায় গুরু হয়ে দাঁড়িয়েছে রত্নার কাছে। আজকাল রত্নাও মুখে হলুদ মাখে, তুলসীগাছে জল দেয়। পুত্রলাভের জন্য গঙ্গব্বা যা যা করতে বলেছে সবই করে মন দিয়ে।

অনাথা শান্তা আর রত্নার কান্না দেখে গঙ্গব্বার মনে হয়েছিল ওরা যেন তারই নিজের মেয়ে। সে ওদের সব দায়িত্ব নিজের ওপর টেনে নিল। রাঘপ্পার প্রচণ্ড প্রতাপ অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় গঙ্গব্বার মনে হচ্ছিল যেন চারপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। মৃত্যুর পরও রাঘপ্পার আত্মা ওকে হয়ত রেহাই দেবে না এ ভয়টা কিছুদিন পর্যন্ত ওর মনে ছিল। পাঁচ সাত দিন বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নও দেখেছিল। কিন্তু রাঘপ্পার মেয়েদের ভালবেসে সে ঐ আতঙ্ক দূর করল মন থেকে। দেসাঈজীও বলেছিলেন, এখন মনটা উদার করা দরকার। গঙ্গব্বা উত্তরে বলেছিল, 'গোপন্না, এরা কেউ তো আমার পর নয়। সেই সময়টাই খারাপ ছিল'। মাসখানেকের মধ্যেই সবাইকার শ্রদ্ধা অর্জন করে সে বড় শান্তি পেল। যে গঙ্গব্বা বদ্রীনাথ চলে যেতে চেয়েছিল সেই এখন আবার মুখ ফিরিয়ে পরম সুখে দেখছে নিজের সংসারটিকে। মা গঙ্গা যেন সৌভাগ্যের ধারা নিয়ে নিজেই বয়ে চলে এসেছেন ওদের ছোট সংসারে।

কাশীতে যেখানে ওরা ছিলেন সেখান থেকে দুজন রামেশ্বরম্ তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে, পথে বিভিন্ন যজমানের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করতে করতে ধারবাড়ে এসে পৌঁছল। দেসাঈজী তাদের বড় যজমান, ওঁর বাড়ি খুঁজে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। দেসাঈজী গঙ্গব্বাকে খবর পাঠালেন। কিট্টীকে সঙ্গে করে গঙ্গব্বা এল এবং ওঁদের রাত্রের আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে গেল। ভোজনের শেষে কিট্টীর হাত দিয়ে ওঁদের এক টাকা দক্ষিণা দেওয়া হল। তাছাড়া ওঁদের কাছ থেকে আট আনা দিয়ে রাখল এক বোতল গঙ্গাজল বাড়িতে পূজা অর্চনার জন্য। এইভাবে সত্যিই মা গঙ্গা নিজে থেকেই এলেন ওর বাড়িতে।

দেসাঈজীর চিঠি পেয়ে অচ্যুত পুণা না গিয়ে ধারবাড় চলে এল। বসন্তর আগে বিয়ে হলে তার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। দেসাঈজী বলামাত্র বসন্ত খুব খুশী হয়েই শান্তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। রাঘপ্পার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই দেসাঈজী তার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন। সবাই এতে তাঁকে 'সাচ্চা মানুষ' বলে ধন্য ধন্য করল। বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাবার পর অচ্যুত গেল পুণায়। কিন্তু বেণুবাঈয়ের বড় মন খারাপ। রীতিমত অপমানিত বোধ করছেন তিনি। মাত্র দশ একর ক্ষেতের মালিক, তার ওপর আবার আত্মহত্যা করেছে এমন বাপের মেয়ে, এক পয়সা বরদক্ষিণাও পাওয়া যাবে না, সেই মেয়েকে কিনা বাড়ির বউ করতে হবে ? তাছাড়া, অচ্যুতের আগে বসন্তর ·বিয়ে এতেও মনের মধ্যে যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে খেয়ে উঠে মুখে পান সুপারি দিতে দিতেই কেঁদে ফেলছেন তিনি। দেসাঈজী ওঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন না কারণ এ দুঃখ কিছুতেই যাবে না তিনি জানেন।

বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর শান্তা একদিন বসন্তর দেওয়া মুক্তোর মালা আর মহবুবের দেওয়া চন্দ্রহার পরে তার পুরানো পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

দেসাঈজী কিট্টী আর গঙ্গুবাকে ডেকে এতদিনের সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ টাকার ভার আর আমি নিতে পারব না'। যা কিছু হয়ে গেছে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে কিট্টী বলল, "এ টাকা দিয়ে কি করব বলে দিন। ঋণ আমি নিজেই শোধ করব।" দেসাঈজী পরামর্শ দিলেন ঋণটাই আগে শোধ করা উচিত তারপর বাকি টাকা গঙ্গুবার নামে পোস্ট অফিসে জমা দেওয়া হোক। তাই হল। কিট্টী ঋণমুক্ত হল এবং ডাকঘরে গঙ্গুবার নামে জমা হল বারোশ' টাকা।

জর্জ ওয়াশিংটন কম্বার গণিবের কঠোর সত্যনিষ্ঠার ফলে জোশী রামরায়কে কি ভাবে পদচ্যুত হতে হল সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এরপর জর্জই হেডক্লার্কের পদ পায় এবং ওপরওয়ালার স্বীকৃতি পেয়ে ঐ পদে স্থায়ী হয়ে যায়। স্টিফেনের পর তার আর একটি ছেলে হয়েছে। রত্নার সঙ্গে সারাম্মার দেখা হলে রত্না তার বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করে।

পুণা থেকে অচ্যুতের চিঠি এল।

শ্রী পুণা

ক্ষেম

তীর্থরূপ চরণারবিন্দে বহু প্রণাম। আমি কুশলে আছি। নিজের বোকামিতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে। একটু বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারলে বোম্বাইতে বসেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান করা যেত। বোম্বাইতে আমার অনেক গুজরাতি ও মারওয়াড়ী বন্ধু আছে। তাদের ব্যবহার এবং প্রথা, রেওয়াজ ইত্যাদি আমি জানি। এরা পয়সাওয়ালা এবং ব্যবসাদার মানুষ তাই আইন কানুনকে বড় ভয় পায়। কথাটা জেনেও আমি এটা কাজে লাগাতে পারিনি।

শেঠ তখ্তমল পুণায় এখনও আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর কাছে বেঙ্কটরাও নামে একটি লোক কাজ করত একথা তাঁর বেশ মনে আছে। চেক্ জাল করার কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভাসা ভাসা জবাব দিলেন, বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল। চেকটা ঠিকই ছিল। তাই কেস্ তুলে নেওয়া হয়'। পরবর্তী ঘটনা আমি তাঁকে কিছুই বলিনি। যদি দরকার হয়, আবার গিয়ে সব কথা বলে তাঁকে চেপে ধরতে পারি।

আমার স্থির বিশ্বাস হিসাবের গরমিল দেখে শেঠ প্রথমটা চট করে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন তারপর পুলিশ যখন তদন্ত শুরু করে তখন নিজের ছেলেরও জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে দেখে তাড়াতাড়ি কেস তুলে নেন। শেঠেদের ছেলেরা অল্পবয়সে এরকম করেই থাকে। কিন্তু বড় হয়ে এরাই আবার বাপের ব্যবসায় আরো ভালো করে চালাতে শিখে যায়। এটা এদের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে। এখন তো শেঠের দোকানে তাঁর নামের পাশে ছেলে বাবুভাইয়ের নামের বোর্ডও লাগানো আছে। শেঠজী ব্যবসায়ী মানুষ, ছেলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে এটা তাঁর ভাল লাগেনি। এটা ব্যবসায়ের রীতি-

বিরুদ্ধ। তাতে তাঁর সুনাম খারাপ হয়ে যেত। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত 'চেকটা জাল নয়, ওঁর নিজেরই ভুল হয়েছিল' এই বলে কোর্ট কাছারির ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেন। তাজিমুদ্দিনকে ভয় দেখিয়ে বা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল নিশ্চয়। ক্রমাগত তারিখ ফেলে ফেলে, মূল কারণটা নিশ্চিহ্ন করে তারপর কেস্‌টা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে শেঠজী বেশী কথাবার্তা বলেন নি। আমার অপমানিত মনে হচ্ছিল তাই পরের ঘটনা আর তাঁর কাছে বলিনি। এর জন্য আপনার বোম্বাই আসা দরকার। শেঠ মানুষ ভাল। চেকটা থেকে কত অনর্থ হয়েছে তা জানলে তিনি নিশ্চয় সাহায্য করবেন এ আশা আছে আমার। কেসের নম্বরটা জানতে পারলেই অনেক কাজ হবে। তারপর নিজেরা কিছু উপায় করা যাবে।

আমার মনে হয় স্বামীরায়ের যা ক্ষতি হয়েছে সেজন্য সরকার ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য। কারণ জামিনের জন্য সরকার তাঁর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা উশুল করে নিয়েছে। পরে সেই মামলাই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কেস বন্ধ হয়ে গেছে, কেসের ফলাফল জানা ছিল না বলে কেউ রিফাণ্ডের জন্য দরখাস্তও করেনি কাজেই সে টাকা এখনও সরকারের কাছে জমা আছে। সুতরাং এখন স্বামীরায়ের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণজী সেই টাকা ফেরৎ পাবার জন্য দরখাস্ত দিতে পারে। বেঙ্কটরায়েরও আর অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন নেই। পুলিশে আর ধরবে না তাকে।

এ সব কাজের জন্য আমাদের শেঠ তখ্‌তমলের সাহায্য নিতে হবে। সেইজন্য আপনি অনুগ্রহ করে একবার আসুন। আমার বিশ্বাস আপনি এলেই এ কাজ ঠিকভাবে হবে। এখানে আমার এক তরুণ উকিল বন্ধু আছে, তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি পুণা যেতে পারেন। মাকে প্রণাম জানাবেন। তিনি, বসন্তর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বিবাহ করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন। আমি বড় নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মা নিশ্চয় বড় দুঃখ পেয়েছেন। আপনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন ও আমাকে দু ছত্র চিঠি লিখতে বলবেন। এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

ভাইদের আশীর্বাদ জানাই। আসবার সময় পুরুষোত্তমকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

ইতি

আপনার

অচ্যুতরাও।

'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ' একটি পারিবারিক উপন্যাস। বিগত কয়েক দশকের হিসেবে এটি কন্নড় ভাষার অদ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের সরল এবং সরাসরি উপস্থাপনা। তিনটি পরিবারের নানা ঘটা নূতন কাহিনী অগ্রসর হ'য়েছে পরিণতির দিকে।

লেখক ডঃ শংকর মোকাশী 'পুণেকর' একাধারে কবি ও এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

অনুবাদিকা নন্দিতা মুখোপাধ্যায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন

Rs. 11.50

ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া